হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সহ উপমহাদেশের
শীর্ষস্থানীয় আউলিয়ায়ে কিরামের উপর অপবাদ আরোপকারী

মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন

সাইফুল্লাহ আল হানাফী

শাহ ওয়ালিউল্লাহ ফাউন্ডেশন

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সহ উপমহাদেশের
শীর্ষস্থানীয় আউলিয়ায়ে কিরামের উপর অপবাদ আরোপকারী

মিথ্যাবাদীদের মুখোশ উন্মোচন

লেখক
সাইফুল্লাহ আল হানাফী

প্রকাশক
শাহ ওয়ালিউল্লাহ ফাউন্ডেশন
সিলেট, বাংলাদেশ
shwfoundation@gmail.com

প্রকাশকাল
নভেম্বর ২০১৩
মহররম ১৪৩৫ হিজরী
অগ্রহায়ণ ১৪২০ বাংলা

মূল্য : ১২০/- [একশত বিশ টাকা মাত্র]

সূচিপত্র

ভূমিকা ৯

প্রথম অধ্যায়

আউলিয়ায়ে কিরামের বিরোধিতায় মিথ্যাবাদীদের হাতিয়ার ১৩
সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সম্পর্কিত বক্তব্যের অর্থবিকৃতি ও অপব্যাখ্যা ১৪
রেজাখানীদের ভাষাজ্ঞানের পরিধি বাড়ানো উচিত ১৬
একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ১৭
ওলী-আল্লাহগণ কর্তৃক সরাসরি রাসূলে পাক (সা.) এর ছাত্র দাবি করার হাকীকত ১৮
হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) রাসূলে পাক (সা.) এর সরাসরি ছাত্র ১৮
রেজাখানীদের দাবি খাজা খাদরীও রাসূল (সা.) থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন ১৯
রেজাখানী মাযহাব অনুযায়ী ওয়াইযের আসন রাসূল (সা.) এর আসনের সমান ২০
বুযুর্গানে কিরাম থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয় এমন কথার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা ২০
বুযুর্গানে কিরামের তাত্ত্বিক কথার বিষয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর অবস্থান ২২
ইমাম জা'ফর সাদিক (রা.) এর একটি উক্তির ব্যাখ্যা ২২
কোনো উম্মত হতে রাসূল (সা.) এর আংশিক পরিপূর্ণতা লাভের ব্যাখ্যা ২৩
ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর ফারসী কিরাতের ব্যাখ্যা ২৪
কয়েকজন বুযুর্গের উক্তি যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে ২৫
একই হুকুমের আওতাভূক্ত একাধিক বিষয়কে একসাথে বর্ণনা করা বেয়াদবি নয় যদিও উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান ২৬
হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর উক্তি ২৭
হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর আরেকটি উক্তি ২৮
শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র.) এর উক্তি ২৯
শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর উক্তি ২৯
বুখারী শরীফে আল্লাহর জ্ঞানের সাথে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানের তুলনা ৩০
একটি বিস্ময়কর ব্যাপার ৩১
আল্লাহর জালালিয়াতের শানকে উপেক্ষা করা যায় না ৩১
সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর একটি স্বপ্ন নিয়ে অপপ্রচার ৩২
আহমদ রেজা খান সাহেবের একটি স্বপ্ন ৩৫
ইসলামী তা'বীর ও রেজাখানী তা'বীরের পার্থক্য ৩৭

স্বপ্নে আল্লাহকে দেখার তা'বীর ৩৯
কামালাতে নবুওয়াত (নবুওয়াতের উচ্চ গুণাবলী) অর্জিত হওয়া ৪০
মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) এর দৃষ্টিতে কামালাতে নবুওয়াত অর্জিত হওয়া ৪২
আহমদ রেজা খান সাহেবের দৃষ্টিতে কামালাতে নবুওয়াত ৪৩
আব্দুল করিম সিরাজনগরীর কাঠগড়ায় ইমাম জা'ফর সাদিক (র.) ও বড়পীর দস্তগীর (র.) ৪৩
সীরাতে মুস্তাকীমের আরেকটি উদ্ধৃতির অপব্যাখ্যা ৪৫
সীরাতে মুস্তাকীমের মূল ভাষ্য ৪৫
রেজাখানীদের দেয়া উদ্ধৃতি ৪৬
মাকতুবাত ও মালফুযাতের পার্থক্য ৪৭
খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভীর শিক্ষাগত যোগ্যতা ৪৮
সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) সম্পর্কে আহমদ রেজা খানের ফতওয়া ৫০
মিথ্যা কুফরী ফতওয়া প্রদানের পরিণতি ৫২
আহমদ রেজাখান সাহেবের ফতওয়া তার নিজের উপর পতিত হয়েছে ৫২
মুস্তফা হামিদী সাহেবের বক্তব্যের জবাবে আবিদ শাহ'র হুশিয়ারী ৫৪
রেজাখানীদের মতো পথভ্রষ্টদের প্রতি রাসূলে পাক (সা.) এর সতর্ক বাণী ৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর ভুল ধরার অপচেষ্টা ৫৭
হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ৫৭
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর অনুবাদকে ভুল প্রমাণ করতে রেজাখানীদের অপচেষ্টা ৬০
কানযুল ঈমানের অনুবাদকের বক্তব্যের সাথে নাসির উদ্দীন আলবানীর বক্তব্যের সাদৃশ্য ৬১
একটি হাস্যকর ব্যপার ৬৩
রেজাখানীদের দৃষ্টিতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর অনুবাদে ভুল ৬৫
রেজাখানীদের দৃষ্টিতে শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)ও ভুল করেছেন ৬৬
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর অনুবাদের উপর রেজাখানীদের আরো অভিযোগ ৬৭
রেজাখানীদের স্ববিরোধী কাজের দৃষ্টান্ত ৬৯
ধৃষ্টতার নমুনা ৭১
স্ববিরোধিতার আরেকটি দৃষ্টান্ত ৭২
বানরের গাছ চিরা ৭৩
রেজাখানীদের কুরআন অনুবাদের মূলনীতি সম্পর্কে কিছু কথা ৭৪
কানযুল ঈমানের অনুবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন ৭৪
আয়াত ও হাদীসের মর্ম বুঝার জন্য অনুবাদই কি যথেষ্ট? ৭৬

কানযুল ঈমানের তাফসীরসম্মত অনুবাদের নমুনা! ৭৭
তাফসীরসম্মত অনুবাদের নামে আয়াতের খেতাব পরিবর্তন ও অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন ৭৮
রেজাখানীদের কুরআন বিকৃত করার চক্রান্ত ৭৯
নিজেদের ভুল অনুসন্ধান করুন ৮১
আহমদ রেজা খান সাহেবের অনুবাদও যথার্থ নয় ৮২
রেজাখানীদের ভ্রান্ত মূলনীতির শিকার রেজাখানীরাই ৮৪
রেজাখানীরা কি বাতিল ফিরকার অনুরূপ আকীদা পোষণ করেন? ৮৫
কয়েকটি হাদীসের অনুবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন ৮৭
শব্দ ব্যবহারে রেজাখানীদের সতর্কতার নমুনা ৯০
রেজাখানীদের নিজস্ব মূলনীতি অনুযায়ী পরস্পরবিরোধী কিছু অনুবাদ ৯২
আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারের ভিন্নতা : একটি প্রশ্ন ৯৪
শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) সম্পর্কে রেজাখানীদের পরস্পরবিরোধী কয়েকটি বক্তব্য ৯৫
নিজেদের বক্তব্যে রেজাখানীরা ওহাবী ৯৬

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর কিতাব পরিবর্তন ৯৮
হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর বক্তব্য বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা ৯৯
নামাযে রাসূল (সা.) এর ধ্যান নিয়ে অপব্যাখ্যা ৯৯
যখীরায়ে কারামতের মূল বক্তব্য ৯৯
আব্দুল করিম সিরাজনগরীর পরিবর্তন করা বক্তব্য ১০০
নামায হবে খালিসভাবে আল্লাহর জন্য ১০২
স্থান-কাল ও অবস্থা ভেদে হুকুমের পার্থক্য ১০২
শয়তানী অপব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকুন ১০৪
ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের রীতি ১০৭
তাওহীদের আলোচনায় কেবল তাওহীদের কথাই থাকে ১০৭
আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর দৃষ্টিতে গায়রুল্লাহর খেয়াল করা শিরক ১০৯
রেজাখানীদের দৃষ্টিতেও নামাযে গায়রুল্লাহর তাযীম শিরক ১১০
আহমদ রেজা খানের দাবি তিনি রাসূলের বান্দা ১১২
রেজাখানীগণ কর্তৃক রাসূল (সা.)-কে জড় পদার্থের সাথে তুলনা ১১৪
ওয়াসওয়াসা থেকে অন্তরকে মুক্ত করার উপায় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ১১৫
নফলের দ্বারা ফরযের ক্ষতিপূরণ হয় ১১৭
ফতওয়া ও তাকওয়া ১১৮

তাকওয়ার বিচারে নিজ ফতওয়ার বিপরীতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর আমল ১১৯
হাদীসের অনুবাদ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ১২০
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনা সাহাবীর ভাই, চাচা ইত্যাদি বলা ১২২
নবীজিকে ভাই বলল রেজাখানীরা ১২৪
রেজাখানীদের দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কিরাম কি রাসূল (সা.) এর ভ্রাতৃতুল্য? ১২৬
রেজাখানীদের অনুবাদে অমুসলিমদের সাথে নবীগণের ভ্রাতৃসম্পর্ক ১২৭
হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও ইমাম বুখারী এর উপর রেজাখানীদের অভিযোগ ১৩০
আহমদ রেজা খান সাহেবের বিরুদ্ধে আহমদ ইয়ার খান নঈমীর ফতওয়া ১৩১
কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর উপর আরেকটি জঘন্য মিথ্যাচার ১৩২

চতুর্থ অধ্যায়

মাজাযে আকলী এর ব্যবহার সম্পর্কে শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং এর অজ্ঞতা ১৩৪
নিসবতের ভিন্নতার কারণে অর্থের ভিন্নতা ১৩৫
علمه شديد القوى আয়াতের অনুবাদ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি ১৩৭
নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে ক্ষমা শব্দ ব্যবহার ১৪০
আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর বক্তব্য ও তার একটি ব্যাখ্যা ১৪১
কানযুল ঈমানে নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে ত্রুটি, ক্ষমা ইত্যাদি শব্দ রয়েছে ১৪৩
কুরআন শরীফ অনুবাদে রেজাখানীদের মূলনীতি অনুযায়ী সকল নবী নিষ্পাপ নন ১৪৪
বড়পীর (র.) এর উপর রেজাখানীরা কী ফতওয়া দিবে? ১৪৭
আহমদ ইয়ার খান নঈমী কর্তৃক একটি হাদীসের ব্যাখ্যা ১৪৭
ওলীআল্লাহগণের বিরোধিতায় ইবনুল জাওযীর আশ্রয় গ্রহণ ১৪৮
সূফীগণের প্রতি হাফিয ইবনুল জাওযীর বিদ্বেষ ১৪৮
আবূ তালিব মক্কী ও আবূল কাশিম কুশাইরী (র.) এর সমালোচনা ১৪৯
ইমাম গাজ্জালী (র.) এর ‘ইহ্‌ইয়াউ উলুমিদ্দীন’ এর সমালোচনা ১৪৯
আবূ হামজা খাযরাজীর সমালোচনা ১৪৯
আবূল হাসান নূরীর সমালোচনা ১৪৯
সূফীদের অর্থ-সম্পদ ত্যাগ করার সমালোচনা ১৪৯
উচ্চ স্তরের সূফীগণের পানাহার পরিত্যাগের সমালোচনা ১৫০
সূফীগণের কাজকে মন্দ আখ্যায়িত করা ১৫০
ওলী-আল্লাহদের সাথে ইবনুল জাওযীর বিরোধিতার জবাব ১৫১
আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর বর্ণনা ও ইবনুল জওযীর পক্ষে রেজাখান সাহেবের ওকালতী ১৫২

ফতওয়ায়ে রেজভীয়াতেও অগণিত মাওযূ হাদীস আছে ১৫৫
শহীদগণের প্রতি নিহত শব্দ ব্যবহার ১৫৬
শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের আহলে বায়ত প্রীতির নমুনা ১৫৬
খুতবায়ে ইবনে নাবাতা ও আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া ১৫৯
রেজাখানীদের কিতাব জালিয়াতির দৃষ্টান্ত ১৬১

পঞ্চম অধ্যায়

রেজাখানীদের বাতিল আকীদা ১৬২
রাসূল (সা.) এর আসন গ্রহণের জন্য চেয়ার রাখা ১৬২
পথভ্রষ্ট মুখতার ছকফীর সাথে আব্দুল করিম সিরাজনগরীর পীরের কাজের সাদৃশ্য ১৬৩
রাসূল পাক (সা.) এর স্বশরীরে হাযির-নাযির থাকা ১৬৩
হাযির-নাযির প্রসঙ্গে রেজাখানীদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ১৬৬
আহমদ রেজাখান সাহেবের দৃষ্টিতে নবী হাযির নন ১৬৭
রেজাখানীদের দৃষ্টিতে তা'যীমী সেজদা জায়িয ১৬৮
আল্লাহ তাআলা কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষী হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য ১৬৮
রেজাখানী ফতওয়ার নমুনা ১৬৯
দেওবন্দী আকীদাওয়ালারা মুসলমান নয় ১৭০
নিজেদের ফতওয়ায় নিজেরাই হারাম ও কুফরীতে লিপ্ত! ১৭০
হারাম ও কুফরী থেকে বিরত থাকুন ১৭১
দেওবন্দীদের সাথে মেলামেশা হারাম! ১৭১
দেওবন্দী আকীদা পোষনকারীদের কিতাবগুলো হিন্দুদের পুঁথি গ্রন্থ থেকেও নিম্নমানের ১৭২
নিজেদের ফতওয়ার শিকার রেজাখানীরা ১৭২
আহমদ রেজা খান সাহেবের চিন্তাধারার সাথে সলফে সালেহীনের চিন্তাধারার পার্থক্য ১৭৫
দেওবন্দীদের কিতাব পেশাবের উপযুক্ত ১৭৬
দেওবন্দী আলিমগণের ইল্‌মকে শূকর, কুকুর ও গাধার সাথে তুলনা ১৭৬
ওহাবীদের জানাযার নামাজ পড়া কুফরী ১৭৭
রেজাখানীরা কি আদায়কৃত নামাযের কাযা আদায় করেন? ১৭৭
রেজাখানীরা সাবধান ! ১৭৯

উম্মতের প্রতি রাসূলে পাক (সা.)-এর নির্দেশনা ১৭৯
নিজের ফতওয়া অনুযায়ী ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত আব্দুল করিম সিরাজনগরী ভ্রান্ত ছিলেন ১৭৯
আব্দুল করিম গং রেজাখানীদের বংশধারার অবস্থা কী হবে? ১৮১
বাহাছ করতে গিয়ে হারাম ও কুফরীতে লিপ্ত হলেন সিরাজনগরী ১৮২
রেজাখানীদের বাড়াবাড়ি ১৮৩
মনগড়া ফযীলত বর্ণনা ১৮৪
সুন্নত তরীকা বর্জন ১৮৪
হাশরের মাঠে আহমদ রেজাখান সাহেবের গজল পাঠ ১৮৫
আহমদ রেজা খান সাহেবের প্রশংসার ব্যাপারে সীমালঙ্গন ১৮৫
আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের মিথ্যাচার ও বেয়াদবি ১৮৭
সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)-কে নিয়ে অপপ্রচার ১৮৭
মা থেকে মাসীর দরদ বেশী ১৮৯
উস্তাদগণের সাথে শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীর বেয়াদবি ১৮৯
হক সিলসিলা নিয়ে বিভ্রান্তি ১৯১
স্বীয় পিতা-মাতার মুরশিদের ব্যাপারে সিরাজনগরীর বক্তব্য কী? ১৯২
রাবিয়া বসরী (র.) এর সাথে বেয়াদবি ১৯২
আহমদ রেজাখান সম্পর্কে রেজাখানীদের জঘন্য উক্তি ১৯৩
রেজাখানীরা নিজস্ব দ্বীন প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত ১৯৪
বড়পীর দস্তগীর (র.) তথা সলফে সালিহীনের সাথে রেজাখানীদের আদর্শের কোনো মিল নেই ১৯৬

উপসংহার ১৯৯

ভূমিকা

بسم الله الرحمٰن الرحيم

নাহমাদুহু ওয়ানুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম। আম্মা বা’দ

শয়তানের কাজ হল নবী-রাসূল ও ওলী-আউলিয়ার কথা ও কাজের অপব্যাখ্যা করে মানুষকে পথভ্রষ্ট করা। উদাহরণ স্বরূপ, শয়তান আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালামকে মানুষের সামনে যাদুকর হিসেবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টা করেছিল; কিন্তু আল্লাহ পাক তার এ ষড়যন্ত্রকে সমূলে বিনষ্ট করেন।

শয়তানের প্ররোচনায় আজো কিছু লোক আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের উপর নানা অপবাদ আরোপ করে যাচ্ছে। এদের অন্যতম জনৈক আব্দুল করিম সিরাজনগরী নামে অখ্যাত এক লোক। দীর্ঘদিন থেকে উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ ও ওলী ইমামুত তরীকত, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) ও তার উত্তরসূরী ওলী-আউলিয়া সম্পর্কে জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সে অপপ্রচার চালিয়ে আসছে। আমি আশা করেছিলাম সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর উত্তরসূরী বড় আলিমদের কেউ এ ব্যাপারে জবাব দিতে উদ্যোগী হবেন। কিন্তু এ সিলসিলার বুর্যুগণ এ বিষয়ে বিশেষ পাত্তা দিচ্ছেন বলে মনে হলো না। তারা নিজেরা আল্লাহর দীনের খালিস খিদমত নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তারা আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং এর এ আক্রমণকে শেখ সাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রহণ করেছেন বলে মনে হলো। শেখ সাদী (র.) এর কবিতায় রয়েছে-

কুকুরের কাজ কুকুর করেছে কামড় দিয়েছে পায়।
তা বলে কুকুরে কামড়ানো কিরে মানুষের শোভা পায় ?
(কাব্যানুবাদ)

কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে, সিরাজনগরী গং এর অপপ্রচারে সাধারণ তরুণ-যুবক ছাড়াও এ তরীকার কিছু মুতাআল্লিকীন এমনকি কোনো কোনো তরুণ আলিমের মনেও প্রশ্ন জাগছে। কারণ একটি মিথ্যা বারবার শুনলে সত্য বলে অনুমিত হয়। এ বিভ্রান্তি থেকে নতুন প্রজন্মকে রক্ষার লক্ষ্যে দায়িত্ব মনে করে তাদের অপপ্রচারগুলো মনযোগ সহকারে পাঠ করি এবং এগুলোর জবাব দেয়ার প্রয়াস নেই। আমি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করলাম যে, তারা আল্লাহর ওলীদের বিরোধিতা ও নিজ স্বার্থ হাসিলের লক্ষ নানা অপকৌশল গ্রহণ করে থাকে। যেমন :

১. কিতাব জালিয়াতী ও ইবারত পরিবর্তন (দেখুন : পৃষ্ঠা ৯৮-৯৯)
২. বাতিল ফিরকার অনুসরণে শাব্দিক অর্থের উপর নির্ভর করে আকীদা প্রমাণ ও ফতওয়া প্রদান (দেখুন : পৃষ্ঠা ৮৫)
৩. ইসলামী আকীদার বাইরে মনগড়া আকীদা প্রচার (দেখুন : পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৩)
৪. ওলীআল্লাহগণের বিরোধিতায় চরমপন্থী ওলীবিদ্বেষী ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ। (দেখুন : পৃষ্ঠা ১৪৮)
৫. একই বিষয়কে নিজের বুযুর্গের ক্ষেত্রে গুণ আর অন্য তরীকার বুযুর্গদের ক্ষেত্রে ত্রুটি হিসেবে উপস্থাপন। (দেখুন : পৃষ্ঠা ১৯, ৪৮)
৬. স্বপ্নের ব্যাপারে ইসলামী ব্যাখ্যার বাইরে নিজস্ব মনগড়া ব্যাখ্যা প্রদান (দেখুন : পৃষ্ঠা ৩৩, ৪১)
৭. নিজেদের মান্যবর আলিমের ফতওয়ার উপর আমল না করা। (দেখুন : পৃষ্ঠা ৫০, ৫৫-৫৬)
৮. সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুযুর্গানে কিরামের ভুল ধরার অপচেষ্টা। (দেখুন : পৃষ্ঠা ৬৬)
৯. স্ববিরোধিতা (দেখুন : পৃষ্ঠা ৬৯, ৯৫)
১০. মিথ্যাচার (দেখুন : পৃষ্ঠা ১৩২, ১৮৭, ১৯১)
১১. আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিরোধী আলিমদের ব্যাপারে ওকালতি (দেখুন : পৃষ্ঠা ১৫২)
১২. বাতিল আকীদা ও আমলের প্রতি নিবিষ্টতা (দেখুন : পৃষ্ঠা ১৬২, ১৬৮)
১৩. নিজেদের বুযুর্গদের ব্যক্তিত্ব ও আমলের ক্ষেত্রে মনগড়া ফযীলত বর্ণনা (দেখুন : পৃষ্ঠা ১৮৪, ১৮৭)

১৪. নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য আল্লাহর ওলীদের নাম ব্যবহার কিন্তু তাদের শিক্ষা ও আদর্শের বিরোধিতা (দেখুন : পৃষ্ঠা ১৯৬)

১৫. ইসলামের বাইরে নিজস্ব মনগড়া মতবাদ প্রতিষ্ঠায় প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা। (দেখুন : পৃষ্ঠা ১৯৪)

প্রকাশ থাকে যে, আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং নিজেদের আহমদ রেজা খান সাহেবের অনুসারী বলে দাবি করে থাকে। আহমদ রেজা খান সাহেবের পক্ষে বা বিপক্ষে আমাদের বুযুর্গানে কিরামের বিশেষ কোনো বক্তব্য দৃষ্টিগোচর হয়নি। তার সম্পর্কে কোনো বিরূপ আলোচনার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু আউলিয়ায়ে কিরামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে তার নাম ব্যবহার করার ফলে বাধ্য হয়ে তার অনুসারী আব্দুল করিম গং এর চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে তার আলোচনাও আনতে হয়েছে। এতদঞ্চলে আব্দুল করিম গং 'কড়া সুন্নী', 'গরম সুন্নী', 'রেজাখানী' ইত্যাদি নামে পরিচিত। আমি এখানে সংক্ষেপে তাদের 'রেজাখানী' হিসেবে উল্লেখ করেছি।

রেজাখানীরা দীর্ঘ দিন থেকে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ছাড়াও বিভিন্ন পুস্তিকায় হক্কানী বুযুর্গানে কিরাম সম্পর্কেও অশালীন ও বেয়াদবিমূলক বক্তব্য দিয়ে আসছে। মসনদে হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও তাঁর উত্তরসূরীদের মানুষের কছে সমালোচিত করার জন্য সুন্নী নামধারী এ পথভ্রষ্টরা বুযুর্গানে কিরামের উক্তির অপব্যাখ্যা করছে। এমনকি কিতাব পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের হেয় করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ তাদের অভিযোগগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও ভিত্তিহীন। এ বিষয়টি পাঠকের সামনে তুলে ধরার জন্য নমুনাস্বরূপ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও তার উত্তরসূরীগণের উপর রেজাখানীদের কথিত অভিযোগ ও মিথ্যা প্রপাগাণ্ডার কিছু আলোচনা এ পুস্তিকায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যাতে সচেতন পাঠকবৃন্দ বিভ্রান্তি থেকে বাঁচতে পারেন।

বইটিতে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তন্মধ্যে রয়েছে- বুযুর্গানে কিরামের মালফুযাতের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা, বাংলাদেশী রেজাখানীগণ কর্তৃক ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর উপর অভিযোগ ও তার জবাব, তাদের স্ববিরোধী বক্তব্য ও এর জবাব, নিজের ফতওয়ায় নিজেদের পথভ্রষ্ট

হওয়ার প্রমাণ, শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীর নিজ উস্তাদ ও বুযুর্গানে কিরামের সাথে বেয়াদবির নমুনা, শেখ আব্দুল করিম গং রেজাখানীদের মাজাযে আকলী এর ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা, কুরআনে পাকের অপব্যাখ্যার কিছু নমুনা, কুরআন শরীফের অনুবাদ বিকৃতকরণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাতিতে মানুষ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী ফতওয়া, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর সাথে বেয়াদবি, রেজাখানী ফতওয়ার নমুনা যেমন- দেওবন্দী কিতাবে কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি থাকা সত্ত্বেও এর উপর পেশাব জায়িয মনে করা (নাউযুবিল্লাহ), 'খেলাফে সুন্নাত তরিকায়' আলা হযরতের শয়নের ফযীলত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আসন গ্রহণের জন্য চেয়ার রাখা, স্বপ্নের ইসলামী তাবীর ও রেজাখানী তাবীরের পার্থক্য ইত্যাদি।

বইটিতে রেজাখানীদের বিভিন্ন অভিযোগের যৌক্তিক ও প্রমাণসমৃদ্ধ জবাব প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছে। কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এক সাথে সকল আপত্তির জবাব গ্রন্থবদ্ধ করা যায়নি। ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে এগুলোর জবাব দেয়া করা হবে। বইটি প্রকাশে যারা বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ তাদের উত্তম বিনিময় দান করুন (আমীন)।

মাসআসসালাম
সাইফুল্লাহ আল হানাফী

প্রথম অধ্যায়

আউলিয়ায়ে কিরামের বিরোধিতায় মিথ্যাবাদীদের হাতিয়ার

উপমহাদেশ ইসলামের এক উর্বর ভূমি। এখানে মূলত আউলিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ অঞ্চলে যারা দ্বীনের সুমহান খেদমত আন্‌জাম দিয়েছেন তাদের মধ্যে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), তাঁর সুযোগ্য সন্তান শাহ আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), শহীদে বালাকোট হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.), হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.), গাজীয়ে বালাকোট সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.), সূফী ফতেহ আলী ওয়ায়েসী (র.) সহ তাঁদের সিলসিলার পূর্বসুরী ও উত্তরসূরীগণের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুন্নী নামধারী কতিপয় মিথ্যাবাদী এ সকল বুযুর্গান ও তাঁদের সিলসিলার বিরুদ্ধে সর্বদা অপপ্রচারে লিপ্ত রয়েছে। এ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদীদের অন্যতম হাতিয়ার হলো-

- বুযুর্গানে কিরামের কথার অর্থবিকৃতি
- অপব্যাখ্যা
- নিজস্ব মনগড়া নীতির আবিষ্কার
- বাতিল মতবাদীদের রীতি অনুসরণ
- তাহরীফ তথা কিতাবের এবারত পরিবর্তন এবং
- মিথ্যাচার।

রেজাখানীদের অন্যতম স্বভাব হলো, তারা বুযুর্গানের কথার অর্থবিকৃতি ও অপব্যাখার মাধ্যমে তাদের প্রতি দোষারোপ করে। নিজেদের ধারা ছাড়া অন্য সকল ধারার ওলী-আল্লাহ ও আলিম-উলামার দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করত: তাদের গালিগালাজ করে এমনকি কুফরী ফতওয়া প্রদানেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা উপমহাদেশের প্রখ্যাত বুযুর্গ হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)

এর সুযোগ্য খলীফা, শহীদে বালাকোট হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর বিভিন্ন উক্তির অপব্যাখ্যা করেছে এবং নিজেদের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করে তার সমালোচনায় শত শত পৃষ্ঠা ব্যয় করেছে। শহীদে বালাকোট (র.) এর সিলসিলায় এমন সব মহান বুযুর্গ ও জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ গত হয়েছেন এবং এখনো আছেন যারা চাইলে তাদের এহেন ঘৃণ্যকর্মের দাত ভাঙ্গা জবাব দিতে পারতেন। কিন্তু তারা এ ক্ষেত্রে সময় ব্যয় না করে তার সিলসিলার দায়িত্ব আন্‌জাম দিয়ে গেছেন। ফলে তার সিলসিলার অনুসারী-অনুগামীদের সংখ্যা ভারত উপমহাদেশে সবচেয়ে বেশি। মানুষের কাছে এ এ সিলসিলার বুযুর্গদের গ্রহণযোগ্যতা সহ্য করতে না পেরে শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী নামে এক রেজাখানী একের পর এক অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। প্রয়োজনের তাগিদে তার কিছু অপপ্রচারের জবাব এখানে তুলে ধরা হলো।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সম্পর্কিত বক্তব্যের অর্থবিকৃতি ও অপব্যাখ্যা

সীরাতে মুস্তাকীম গ্রন্থে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) সম্পর্কে একটি উদ্ধৃতি রয়েছে যে,

پس کلیات شریعت اور احکام دین میں اسکو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا شاگرد ہی کہ سکتے ہیں اور ان
کا ہم استاد ہی کہ سکتے ہیں۔

এর অর্থ হলো- শরীয়তের সার্বিক দিক থেকে এবং আহকামে দ্বীনের ব্যাপারে তাকে নবীগণের ছাত্রও বলা যায় এবং নবীগণের মতো তাকে শিক্ষকও বলা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, আউলিয়ায়ে কিরাম যেহেতু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন সেহেতু তাদেরকে নবীগণের ছাত্রতুল্য বলা যায়। অনেক ওলীআল্লাহ নিজেকে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সরাসরি ছাত্র বলেও দাবি করেছেন। আবার নবী-রাসূলগণ যেমন মানুষদের দ্বীনের পথে আহ্বান করেছেন, তাদের হেদায়াতের পথ দেখিয়েছেন, জীবন চলার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তেমনি নবীর ওয়ারিশ হিসেবে ওলীআল্লাহগণ এবং উলামায়ে কিরামও এ সকল দায়িত্ব পালন করেন। এ হিসেবে নবীগণ যেমন উম্মতের জন্য শিক্ষক তেমনি

ওলামায়ে কিরাম ও ওলীআল্লাহগণও তাদের অনুসারী মুরিদদের জন্য শিক্ষকতুল্য। ইমাম গাযযালী (র.) এর ‘ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন’ এর মধ্যেও একথা রয়েছে। সুতরাং সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) সম্পর্কে উপরোক্ত উক্তি যথার্থ। অথচ রেজাখানীরা তাদের গ্রন্থে উক্ত এবারতের অর্থ বিকৃত করেছে এবং এর অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে।

রেজাখানীরা উক্ত এবারতের যে ভ্রান্ত অনুবাদ করেছে তা নিম্নরূপ-

“অর্থাৎ শরীয়তের সার্বিক দিক থেকে এবং আহকামে দ্বীনের ব্যাপারে তাকে (ছৈয়দ আহমদকে) নবীগনের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাগরিদ/ছাত্র এবং তাদের উস্তাদের সমানও বলা চলে।” (ইজহারে হক, পৃষ্ঠা ৭১)

নিজেদের কৃত অর্থের মাধ্যমে আব্দুল করিম গং রেজাখানীরা যে অপব্যাখ্যা করেছে তা নিম্নে পেশ করা হলো-

“এখানে ছৈয়দ আহমদের বেলায়তের মর্তবা বয়ান করতে গিয়ে তাকে নবীগণের উস্তাদের সমান বলা হয়েছে। তারপরও ছৈয়দ আহমদ তার প্রতিবাদ না করে নিশ্চুপ, অথচ নবীগণের উস্তাদ হলেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা, ছৈয়দ আহমদকে নবীগণের উস্তাদের সমান বলা দ্বারা তাকে আল্লাহ বলার বৃথা চেষ্টা নহে কি? আওর মুহাম্মদীগণ জবাব দিবেন কি? ইহা সুস্পষ্ট কুফরী।” (ত্বরীকায়ে মুহাম্মদীয়ার গোমর ফাঁস, পৃষ্ঠা ৮, হক বাতিলের পরিচয়, পৃষ্ঠা ১৮, মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা, পৃষ্ঠা ৮৫, ইজহারে হক্, পৃষ্ঠা ৪৫)

পাঠক লক্ষ্য করুন, এখানে মূল এবারতের অর্থ ও মর্মের সাথে রেজাখানীদের অনুবাদ ও অপব্যাখ্যার কী আকাশ পাতাল পার্থক্য। আর এর উপর ভিত্তি করে তারা একজন ওলী-আল্লাহর উপর কুফরী ফতওয়া দিয়ে দিল। এটা তাদের জ্ঞানের দৈন্যতা না স্বভাবসুলভ বিরোধিতা ?

সীরাতে মুস্তাকীমের যে অংশের অনুবাদ রেজাখানিরা করেছেন তাকে “তাদের (নবীদের) উস্তাদের সমানও বলা চলে” অথচ এর সঠিক অনুবাদ হলো- নবীগণ যেমন শিক্ষক তাকেও তেমনি শিক্ষক বলা চলে। একই ধরনের কথা ইমাম গাযযালী (র.) প্রণীত ‘ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন’ কিতাবে এসেছে এভাবে-

إن الشيخ في جماعة كالنبي في أمته

-‘উম্মতের জন্যে নবী যেমন, মুরীদের জন্য মুরশিদও তেমন।’
ইমাম গাযযালী (র.) এর এ উক্তির ব্যাপারে রেজাখানীরা কি বলবেন?

মুজাদ্দিদে আলফে সানী শায়খ আহমদ সিরহিন্দী (র.) এর মকতুবাত শরীফে উম্মতে মুহাম্মদীর আলিমগণের মর্যাদাকে বনী ঈসরাইলের নবীগণের মর্যাদার তুল্য বলা হয়েছে। মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) লিখেছেন, “হে বৎস! বর্তমান সময় এরূপ সময় যে, পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে এরূপ তমসাচ্ছন্ন কালে ‘উলুম আযম’ পয়গাম্বর (দৃঢ় সঙ্কল্পযুক্ত পয়গাম্বর) প্রেরিত হতেন এবং নতুন শরীআত প্রচার করতেন কিন্তু **এরা (উম্মতে মুহাম্মদী) যখন সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত ও তাদের পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ পয়গাম্বর, তখন এই উম্মতের আলিমগণকে বনী ইসরাঈলের পয়গাম্বরতুল্য মর্ত্তবা প্রদত্ত হয়েছে।**” (মকতুবাত শরীফ, খণ্ড ১, মকতুব নং ২৩৪)

রেজাখানীরা এখানে কি এ অভিযোগ তুলবেন যে, **মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) আলিমগণকে নবীদের সাথে তুলনা দিয়ে নবীদের সম্মানহানি করেছেন কিংবা তাঁদের সাথে বেয়াদবি করেছেন?**

রেজাখানীদের ভাষাজ্ঞানের পরিধি বাড়ানো উচিত

উপরোল্লিখিত এবারতের অনুবাদে রেজাখানীরা ‘হাম উস্তাদ’ এর অর্থ লিখেছেন- উস্তাদের সমান। অথচ ‘হাম উস্তাদ’ অর্থ হলো শিক্ষকতার বিবেচনায় সমান। বিশ্ববিখ্যাত উর্দূ আভিধান ‘ফিরুযুল লুগাত’ থেকে অনুরূপ কয়েকটি শব্দের অনুবাদ ও এর পাশাপাশি রেজাখানী নিয়মে অনুবাদ প্রদত্ত হলো।

কয়েকটি শব্দের রেজাখানী অনুবাদ ও সঠিক অনুবাদ

ক্রমিক	শব্দ	রেজাখানী নিয়মে অনুবাদ	সঠিক অনুবাদ
১	ہم وطن	দেশের মতো	এক দেশীয়
২	ہم مکتب	বিদ্যালয়ের মতো	একই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন রত
৩	ہم عصر	সময়ের মতো	এক সময়কার
৪	ہم رنگ	রং এর মতো	একই রঙের
৫	ہم جلیس	উপবেশনকারীর মতো	পাশে উপবেশনকারী
৬	ہم استاد	উস্তাদের মতো	শিক্ষকতার বিবেচনায় সমান

‘হাম উস্তাদ’ এর অর্থ যদি ‘উস্তাদের সমান’ হয় তবে উপরোল্লেখিত শব্দসমূহের অর্থ সঠিক অর্থ থেকে পরিবর্তন হয়ে রেজাখানী নিয়মে সেরূপই হবে যেমন উপরের ছকে দেখানো হয়েছে।

ওলী-আল্লাহগণকে কাফির সাব্যস্ত করার জন্য কি একটি ভাষার অভিধান পরিবর্তন করা সম্ভব?

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার

রেজাখানীরা সীরাতে মুস্তাকীমের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-কে নবীগণের ছাত্র বলার বিষয় নিয়েও কঠোর সমালোচনা করেছে। অথচ বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, **রেজাখানীরা দাবি করে থাকে যে, তাদের তরীকার শায়খদের হাতে বায়আত গ্রহণ করলে এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাতে বায়আত হয়। তারা এর নাম দিয়েছে ‘বায়আতে রাসূল’।** আমাদের হাতে প্রমাণ রয়েছে তাদের তরীকার মহাবুযুর্গ (আব্দুল করিম সিরাজনগরীর মুরশিদ) আবিদ শাহ নিজেকে ‘খলীফাতুর রাসূল’ দাবি করতেন। এ দাবির মাধ্যমে প্রথমত তিনি নিজের তরীকার উর্ধ্বতন সকল বুযুর্গকে অস্বীকার করে চরম আত্মম্ভরিতার পরিচয় দিয়েছেন। দ্বিতীয়ত নিজেকে সরাসরি ‘খলিফাতুর রাসূল’ দাবি করে তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী অনেক বড় অপরাধ করে বসেছেন। **কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাত্র হওয়ার দাবি করা অপরাধ হলে খলীফা হওয়ার দাবি করা নি:সন্দেহে মহা অপরাধ।**

উল্লেখ্য, আব্দুল করিম সিরাজনগরীর পীর আবিদ শাহ বায়আতে রাসূলের প্রবর্তন করেছেন, অথচ তাদের ইমাম আহমদ রেজা খান সাহেবের তরীকাগুলোর মধ্যে বায়আতে রাসূলের কোনো উল্লেখ নেই, তবে বায়আতে শায়খের কথা উল্লেখ আছে। এ ব্যাপারে আহমদ রেজা খান সাহেবের জীবনীগ্রন্থ ‘জীবন ও কারামত’ এর ভাষ্য নিম্নরূপ :

‘‘হযরত সৈয়্যেদেনা মাওলানা শাহ আলে রাসূল মারেহারভীর সাথে আলা হযরত কেবলা ও তার শ্রদ্ধেয় পিতার প্রথম সাক্ষাত হলো। তিনি আলা হযরত কেবলাকে দেখে যা বলেছেন, আসুন, আমি কয়েকদিন থেকে আপনার অপেক্ষায় রয়েছি। আলা হযরত ও তার পিতা মহোদয় তার হাতে বায়‘আত হলেন।’’ (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ৫৬)

উক্ত জীবন ও কারামত গ্রন্থের পূর্ণ নাম হচ্ছে “আ‘লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফযেলে বেরলভী (র.) এর জীবন ও কারামত”। এর লেখক শামশুল আলম নঈমী। বইটিতে অভিমত পেশ করেছেন কানযুল ঈমানের বঙ্গানুবাদক আব্দুল মান্নান, সায়্যিদ মসিহুদ দৌলা, ওবায়দুন্নাছের নঈমীসহ কতিপয় বিশিষ্ট রেজাখানী আলিম।

ওলী-আল্লাহগণ কর্তৃক সরাসরি রাসূলে পাক (সা.) এর ছাত্র দাবি করার হাকীকত

প্রকাশ থাকে যে, আউলিয়ায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, তারা সরাসরি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। যেমন ইমাম গাযযালী (র.) ‘আল মুনকিয মিনাদ দালাল’ কিতাবে লিখেছেন-

حتي انهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء ويسمعون أصواتا ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقي الحال من مشاهد الصور والأمثال إلي درجات يضيق عنها نطاق النطق– (المنقذ من الضلال)

অনুবাদ : এমনকি (সুফিয়ায়ে কিরাম) জাগ্রত অবস্থায় ফেরেশতা এবং আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামের রূহের সাথে যিয়ারত লাভ করেন, তাদের কথাবার্তা শুনতে পান এবং তাদের থেকে উপকার গ্রহণ করেন। অতঃপর অবস্থা প্রকৃত সুরত ও মিছালী সুরত দর্শনের এমন এক স্তরে পৌঁছে যায় যেখানে বাকশক্তি রুদ্ধ হয়ে যায়। (আল মুনকিয মিনাদ দালাল)

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) রাসূলে পাক (সা.) এর সরাসরি ছাত্র

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ত্রিশ বছর বয়সে হারামাইন শরীফে উপস্থিত হন এবং পূর্ণ এক বছর মদীনা শরীফে অবস্থান করেন। এ সময়ে তার যে সকল আধ্যাত্মিক ফয়েয লাভ হয়েছিল, সেগুলোকে তিনি তার ‘ফুয়ুযুল হারামাইন’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। উক্ত গ্রন্থে তিনি লিখেন- “আধ্যাত্মিক জগতে পূর্ণতা লাভের প্রতিটি সবক রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং আমাকে প্রদান করেছেন এবং তাঁরই পবিত্র সান্নিধ্য থেকে আমি পরিপূর্ণতা অর্জন করেছি। **এ বিচারে আমি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু**

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সরাসরি ছাত্র। কোনো মাধ্যম ব্যতীতই আমাকে এ সৌভাগ্য দান করা হয়েছে। তিনি আমাকে এ সুসংবাদ দিয়েছেন যে, তোমার মাধ্যমে উম্মতের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীকে সম্মানিত করা হবে।" (ফুয়ূযুল হারামাইন, পৃষ্ঠা ১২৬)

এখানে **শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তার নিজেকে 'রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সরাসরি ছাত্র' বলে দাবি করেছেন। রেজাখানীরা তার উপরও কি আপত্তি করবে ?** অবশ্য রেজাখানীরা চাইলে এটা করতে পারে। কেননা তারা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) কৃত কুরআনে কারীমের তরজমার উপর অনেক অভিযোগ এনেছে।

রেজাখানীদের দাবি খাজা খাদরীও রাসূল (সা.) থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন

রেজাখানী 'গরম সুন্নী'দের বর্তমান মুরশিদ তাহের শাহ সাহেবের দাদা পীর খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী সাহেবের পিতা ও মুর্শিদ খাজা খাদরী সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জ্ঞান অর্জন করেছেন বলে রেজাখানীরাও দাবি করেন। এ সম্পর্কে আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া ট্রাস্ট কর্তৃক অনূদিত 'মজমু'আহ-এ সালাওয়াতে রাসূল (সা.)'-এর বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লেখা হয়েছে- 'খাজা চৌহরভীর আব্বাজান ছিলেন রূহানিয়তের মূর্ত প্রতীক। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। কেউ কোনো মাসআলা জিজ্ঞেস করলে, জ্ঞাত বিষয় হলে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিতেন। অন্যথায় বলতেন, ''একটু অপেক্ষা করুন। আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জেনে নিয়ে এখনই বলছি।'' চোখ বন্ধ করতেন, কোনো মুরাকাবা করতেন না, কিছুক্ষণ পরই বলতেন, **''আমি হুযূরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞেস করেছি; মাসআলাটির সমাধান এরূপ হবে।''** এ মহান ওলীর সুযোগ্য সাহেবজাদা হলেন হযরত খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয।' (মজমু'আহ-এ সালাওয়াতে রাসূল এর বঙ্গানুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯)

রেজাখানীরা তাদের নিজেদের কোনো বুযুর্গ কর্তৃক রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে জানা বা শিক্ষাগ্রহণের বিষয়টি গৌরবের সাথে প্রচার করে অন্যদিকে তাদের ধারার নন এমন কারো সম্পর্কে এরূপ কথা বলা হলে, বা কাউকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ছাত্রতুল্য বলা হলে এটাকে বাতিল আকীদা বলে অপপ্রচার করে। তাদের এ বিপরীতধর্মী আচরণ প্রতিহিংসা ছাড়া আর কি হতে পারে ?

রেজাখানী মাযহাব অনুযায়ী ওয়াইযের আসন রাসূল (সা.) এর আসনের সমান

'নবীর মতো শিক্ষক' বলা রেজাখানীদের দৃষ্টিতে বেয়াদবি। অথচ তাদের ইমাম আহমদ রেজা খান বেরলভী সাহেব তার ফতওয়াগ্রন্থে ধর্মীয় আলোচনার মাহফিলে শোরগোল করা প্রসঙ্গে ফতওয়া দিতে গিয়ে লিখেছেন-

توہین اوس عالم دین کی توہین نہ ہوگی جو اس وقت وعظ کرتا ہے بلکہ اصل دین اسلام اور خود نبی اکرم علیہ افضل الصلوۃ والسلام کی توہین ٹھرے گی کہ مسند وعظ اصل مسند پورنور سید المرسلین ﷺ ہے۔ (فتاوی رضویہ، جلد۹)

অনুবাদ : দ্বীনি বক্তার সামনে শোরগোল করে তাকে অপমান করা শুধু ঐ আলিমকে অপমান করা নয় বরং দ্বীন ইসলাম ও নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে অবমাননা করার নামান্তর। কেননা ওয়াযের আসন প্রকৃতপক্ষে হুযূর পুরনূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আসন। (ফতওয়ায়ে রেজভীয়া, ৯ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২০৭)

দেখা যাচ্ছে আহমদ রেজা খান সাহেব (নিজ দলের) ওয়াইযকে অবমাননা করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবমাননা করার সমান বলেছেন এবং ওয়াইযের আসনকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আসন বলেছেন। আব্দুল করিম গং রেজাখানীরা তাদের ইমামের এ বক্তব্যের ব্যাপারে কি বলবেন?

বুযুর্গানে কিরাম থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয় এমন কথার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা

বুযুর্গানে কিরাম থেকে বাহ্যদৃষ্টিতে গ্রহণীয় নয় এমন অনেক কথা পাওয়া যায়। মুর্খরা তাদের কথার ব্যাখ্যা জানে না এবং তাসাউফের ইশারা-ইঙ্গিত না বুঝার কারণে অভিযোগ করে বসে। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম-এর মধ্যে এ ধরনের কোনো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করে তা নিরসন করতেন। আর কোনো সাহাবীর উক্তি হলে তাকেই জিজ্ঞেস করে তা নিরসন করা হতো। উদাহরণ স্বরূপ- হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, জনৈক আনসারী সাহাবীর বাড়ি মসজিদে নববী থেকে অনেক দূরে ছিল। অথচ তিনি প্রতি ওয়াক্তের নামাযই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পিছনে পড়তেন। তার এ কষ্ট দেখে আমার দয়া হল। ফলে আমি তাকে বললাম, আপনি যদি একটা ঘোড়া অথবা গাধা খরিদ করতেন তাহলে কতইনা ভাল হত। তাতে আপনি গরম পাথর ও পাথরকুচির উপর চলা থেকে মুক্তি পেতেন, পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা পেতেন। উত্তরে তিনি বললেন, শুনুন! আমার বাড়ি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ির কাছে হোক এটা আমি পছন্দ করি না। হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তার একথা আমার কাছে বড় বোঝা মনে হল। ফলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আমি সব ঘটনা খুলে বললাম। তিনি লোকটাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলে তিনি আগের মতই উত্তর দিলেন এবং বললেন, আমি দূর থেকে হেটে আসার সওয়াবের আশা রাখি। তিনি বললেন, তুমি যে আশা করছ তা তুমি পাবে। (মুসলিম শরীফ)

লক্ষ্য করুন, ঐ আনসারী সাহাবী এমন কথা বললেন যা বাহ্যদৃষ্টিতে খুবই আপত্তিকর ছিল। আর এ কারণেই হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিকট এটি অত্যন্ত কষ্টদায়ক মনে হয়েছিলো। অথচ উক্ত আনসারী সাহাবী স্বীয় ইখলাসকে গোপন করার জন্যই এমনটি করেছিলেন কিংবা এ জাতীয় অন্য কোনো বিষয় তাঁর মধ্যে ছিল। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করার কারণে আসল অবস্থাটা প্রকাশ পায়। কারণ তাঁর কাছে ইখলাস গোপন রাখার কোনো প্রয়োজন ছিল না।

এখানে এটা পরিষ্কার যে, **সাহাবায়ে কিরাম তাঁদের মধ্যকার কারো কথা বাহ্যিক দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় কিংবা অবোধগম্য হলে তাঁকে দোষারোপ না করে এর ব্যাখ্যা খুঁজতেন। কিন্তু রেজাখানীরা এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।** তাদের একটি স্বভাব হলো যে, তাদের ভ্রান্ত মতের সাথে মিল নয় এমন বুযুর্গদের তাত্ত্বিক কথার যথাযথ বা সুন্দর ব্যাখ্যা অন্বেষণ তো দূরে; বরং তারা উদ্দেশ্যমূলকভাবে এর অপব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে।

পূর্ববর্তী বহু বুযুর্গ, যাদেরকে রেজাখানীরাও ইমাম হিসাবে মেনে নিয়েছেন, তাদের থেকেও বাহ্যদৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয় এমন বক্তব্য পাওয়া যায়, তত্ত্বজ্ঞানীগণ যেগুলো ব্যাখ্যা দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে উপস্থাপন করেন। আর লা-মাযহাবী ওহাবীরা বুযুর্গদের ঐ সকল গূঢ় তত্ত্বকথার অপব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। দু:খজনক হলেও সত্য যে, রেজাখানীরা তাদের মনগড়া মতবাদের সাথে অমিল হলেই মান্যবর বুযুর্গদের কথার ব্যাখার ক্ষেত্রে ওহাবীদের পন্থা অবলম্বন করে। তাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল তাদের মতের পরিপন্থী উচ্চস্তরের ওলী আল্লাহগণের মা'আরিফত সম্পর্কিত উক্তিগুলোর অপব্যাখ্যা দেয়া।

বুযুর্গানে কিরামের তাত্ত্বিক কথার বিষয়ে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর অবস্থান

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রেজাখানীরা বুযুর্গানে কিরামের তাত্ত্বিক কথার অপব্যাখ্যা প্রদান করে। অথচ দেখা যায়, হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) তাঁর 'মাকতুবাত শরীফে' সাধারণ মানুষের ভুল বুঝাবুঝি নিরসনের জন্য ওলী-আল্লাহগণের বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছেন। যেমন :

ইমাম জা'ফর সাদিক (রা.) এর একটি উক্তির ব্যাখ্যা

মাকতুবাত শরীফ ৩য় খণ্ড, ৫ম ভাগ, ৯২ নং মাকতুবে ফকির হাশিম কাশমীর নিকট তার প্রশ্নের উত্তরে মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) লিখেন- ''আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কোনো আরিফ বলে থাকে, **আমরা আল্লাহ তা'আলার বাক্য শ্রবণ করি অথবা আমাদের সাথে তাঁর কথাবার্তা হয়'** যেরূপ হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'আমি পবিত্র কুরআনের আয়াতের পুনরাবৃত্তি করতে থাকি অবশেষে আমি বক্তা হতে তা শ্রবণ করি' আবার শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর 'রিছালায়ে গাউছিয়া' কিতাবের মধ্যেও এই প্রকারের আভাষ আছে; এর অর্থ কি? এবং আপনার নিকট এর সমাধান কি?'' আল্লাহ পাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুক। জানবেন যে, আল্লাহ পাকের বাক্য তদ্বীয় যাত ও অবশিষ্ট সিফাতসমূহের মতো প্রকারবিহীন। প্রকারবিহীন বাক্য শ্রবণ করাও প্রকারবিহীন হয়ে থাকে। কেননা প্রকারসম্ভূত বস্তুর প্রকারবিহীনের দিকে যাওয়ার পথ নেই। অতএব, উক্ত কান, যা সরাসরি প্রকারসম্ভূত, তা দ্বারা শ্রবণ করা সম্ভব নয়।

তথায় যদি কোনো দাস তা শ্রবণ করে, তবে তা রূহ বা আত্মার দ্বারা হয়ে থাকে। যেহেতু আত্মার মধ্যে প্রকারবিহীনতার অংশ আছে এবং এর শ্রবণ, বর্ণ ও শব্দের মাধ্যমে শ্রবণ নয় । এরূপ যদি কোনো বান্দা কথা বলে তাও রূহ্ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং বর্ণ ও শব্দ রহিত হিসেবে হয়ে থাকে। (মাকতুবাত শরীফ, ৯২ নং মাকতুব)

কোনো উম্মত হতে রাসূল (সা.)-এর আংশিক পরিপূর্ণতা লাভের ব্যাখ্যা

মাকতুবাত শরীফ ৩য় খণ্ড, ৫ম ভাগ, ৯৪ নং মাকতুবে মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) উল্লেখ করেছেন- ‘‘এটি নির্ধারিত কথা যে, যে কোনো পূর্ণতা কোনো উম্মত লাভ করে, তা উক্ত নবীর জন্যও (প্রকারান্তরে) হাসিল হয়ে থাকে। “যে ব্যক্তি কোনো সুপথের প্রচলন করে” ইত্যাদি (হাদীস)। অতএব হযরত নবীয়ে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উক্ত ব্যক্তির মাধ্যমে উক্ত বৃত্তের পরিধির পূর্ণতাসমূহও প্রাপ্ত হলেন।’’ (মকতুবাত শরীফ)

মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) আরো লিখেছেন, “যদিও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় উম্মতের কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে কোনো আংশিক পূর্ণতা লাভ করেন এবং তার উসীলায় কোনো মাকামে উপনীত হন, তথাপি এতে উক্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনোরূপ ত্রুটি অনিবার্য হয় না। উক্ত ব্যক্তিরও নবী হতে কোনো শ্রেষ্ঠত্ব লাভ হয় না। যেহেতু উক্ত ব্যক্তি নবীর অনুকরণের মাধ্যমে তা প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাঁর মাধ্যমে এই সৌভাগ্যে উপনীত হয়েছে। অতএব উক্ত পূর্ণতা যেন প্রকৃতপক্ষে উক্ত নবীরই অধিকৃত বস্তু, তাঁরই অনুসরনের ফল।” (মাকতুবাত শরীফ)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের কোনো ব্যক্তির মাধ্যমের আংশিক পূর্ণতা লাভ করেন। কোনো বুযুর্গ যদি এ ধরণের উক্তি করে থাকেন তবে তার উক্তির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে রেজাখানীদের মূলনীতি হচ্ছে, তাদের মতের নয় এমন কোনো বুযুর্গের এ রকম কোনো উক্তি পেলে এর সঠিক ব্যাখ্যা না দিয়ে বরং কুফরী ফতওয়া প্রদানের মাধ্যমে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে।

রেজাখানীরা অন্যান্য বুযুর্গদের সাথে চরম বেয়াদবি করে থাকলেও মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর মুজাদ্দিদ হওয়ার ব্যাপারে তাদের কোনো দ্বিমত নেই।

অথচ দেখা যায়, মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) পূর্ববর্তী ওলীআল্লাহগণের তাত্ত্বিক কথার ব্যাখ্যা দিলেও রেজাখানীরা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর ক্ষেত্রে তা করেনি। ইমামুত তরীকত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)’র মারিফত সম্পর্কিত বাণীসমূহের সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে হলে রেজাখানীদের জন্য উচিত হলো, ইয়াহুদীদের মতো বক্র মনোভাব ত্যাগ করে মুহাক্কিক সূফী আলিমদের পথ অবলম্বন করা।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর ফারসী কিরাতের ব্যাখ্যা

ইমাম আবূ হানিফা (র.) আরবীতে কুরআন তিলাওয়াতের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নামাযে ফারসীতে কুরআন তিলাওয়াত জায়িয হওয়ার ব্যাপারে মত প্রদান করেছিলেন। কোনো হক্কানী আলিম ইমাম আবূ হানীফা (র.)-কে এ বিষয়ের জন্য দোষারোপ করেননি বরং তার এ অবস্থানের কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। নূরুল আনওয়ার গ্রন্থকার এর কারণ ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে- ‘‘তার হিকমত হল নামাযের অবস্থা আল্লাহ তা‘আলার সাথে গোপনীয় কথা-বার্তা বলার অবস্থা। কিন্তু আরবী শব্দমালা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও গভীর অর্থপূর্ণ। তাই সম্ভবতঃ একজন নামাযী এমতাবস্থায় এরূপ অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণে সক্ষম হবে না। অথবা এজন্য ফারসী কিরাতকে জায়িয বলা হয়েছে যে, একজন নামাযী যদি নামাযের মধ্যে আরবী কিরাতে লিপ্ত হয়, তাহলে তার মনোযোগ নামায হতে সরে গিয়ে আরবী শব্দসমূহের ফাসাহত ও বালাগত এর অনুপম সৌন্দর্যের দিকে নিবিষ্ট হবে এবং সে ছন্দময় ও শ্রুতিমধুর শব্দসমূহের সৌন্দর্য উপভোগে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে। আর আল্লাহর সম্মুখে তার হুযূরে কলব বা আন্তরিকতাপূর্ণ উপস্থিতি খালিস ও নির্ভেজাল রাখতে সক্ষম হবে না। বরং এ আরবী শব্দমালা ঐ নামাযী ব্যক্তি ও আল্লাহর মধ্যখানে একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) যেহেতু আল্লাহ তা‘আলার তাওহীদ ও মুশাহাদার সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন, এ জন্য তিনি আল্লাহর সত্তা ব্যতিত অন্য কোনো কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। (নূরুল আনওয়ার, পৃষ্ঠা)

রেজাখানীরা নামাযের মধ্যে আল্লাহর ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া ছাড়া নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ওলীআল্লাহগণের ধ্যানের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তারা ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর এ ফতওয়ার ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিবেন?

কয়েকজন বুযুর্গের উক্তি যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে

আবূল কাশিম কুশাইরী (র.) (৩৭৬ হি.-৪৬৫ হি.) তার লিখিত “রিসালায়ে কুশাইরিয়া” কিতাবে তাকওয়া সম্পর্কে লিখেছেন– “তাকওয়া দুই প্রকার। এক প্রকার হলো বাহ্যিক, আর তা হলো প্রত্যেকটি নড়াচড়াই আল্লাহর জন্য হতে হবে। দ্বিতীয় প্রকার হলো আভ্যন্তরীন, আর তা হলো **তোমাদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।**” (রিসালায়ে কুশাইরিয়া, পৃষ্ঠা ২৯৪)

রেজাখানীরা এ উক্তিরও অপব্যখ্যা দেয়ার দুঃসাহস করবেন কি?

ইমাম গাজ্জালী (র.) ইহইয়াউ-উলুমিদ্দীন কিতাবে তরীকতের শায়খের মর্যাদা সর্ম্পকে লিখেছেন-

إن الشيخ فى جماعته كالنبى فى أمته

অর্থাৎ উম্মতের জন্য নবী যেমন, ঠিক মুরীদের জন্য পীর তেমন।

রেজাখানীরা ইমাম গায্যালী (র.) এর উক্ত বাণীর সঠিক ব্যাখ্যা না দিয়ে তার উপর পীরকে নবীর সমান বলার অভিযোগ আনার দুঃসাহস করবেন কি?

সূফীকুল সম্রাট মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী (র.) তার নিজের উপর স্বীয় পীর শামস তাবরিযী এর প্রভাব সম্পর্কে বলেন–

زاہد بودم ترنہ گویم کردی ☆ سرفتنہ بزم وبادہ جویم کردی
سجادہ نشیں باوقارے بودم ☆ بازیچہ کو دکاں کویم کردی

অর্থাৎ আমি ছিলাম দরবেশ, (তিনি) আমাকে গায়ক বানিয়ে দিলেন। বানিয়ে দিলেন মদ্যপায়ীদের সরদার ও মদখোর মাতাল। আমি ছিলাম মর্যাদাবান গদ্দীনশীন পীর, তিনি আমাকে অলিতে গলিতে ক্রীড়ারত শিশুদের খেলনায় পরিণত করলেন। (তারিখে দাওয়াত ও আযীমত)

প্রখ্যাত সূফি সম্রাট কবি হাফিয (র.) বলেন-

بے سجادہ رنگیں کن گرت پیرمغاں گوید ☆ کہ سالک بیخبر نبود زرادرسم منزلہا

অর্থাৎ কামিল পীর যদি তোমার জায়নামাযকে শরাব দিয়ে রঙ্গিন করে দিতে বলেন তবে তুমি তা করে নিও, কারণ তিনি তোমার গন্তব্য সম্পর্কে বেখবর নন।

রেজাখানীরা চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী উপরোল্লেখিত দুই প্রখ্যাত বুযুর্গ এর উক্তির অপব্যাখ্যা করার দুঃসাহস করবেন কি?

একই হুকুমের আওতাভুক্ত একাধিক বিষয়কে একসাথে বর্ণনা করা বেয়াদবি নয় যদিও উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান

দুটি বিষয়ের মধ্যে যদি আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকে এবং উভয়টি কোনো এক হুকুমের আওতাভুক্ত হয় তখন উক্ত দুটি বিষয়কে একত্রে বর্ণনা করা বেয়াদবি নয়। যেমন, মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إن قلوب بنى آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمٰن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء،

অনুবাদ : নিশ্চয় সকল আদম সন্তানের অন্তরসমূহ আল্লাহর দুই আঙ্গুলের (কুদরতের) মধ্যে একটি অন্তরের মতো রয়েছে। তিনি এটাকে ইচ্ছামতো পরিচালনা করতে পারেন। (মুসলিম)

এ হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, সকল আদম সন্তানের অন্তর আল্লাহর কুদরতের নিয়ন্ত্রণে। কোনো সৃষ্টি আল্লাহর কুদরতের বাইরে নয়। ছোট বড় সকল সৃষ্টিই তাঁর সামনে অত্যন্ত নগণ্য।

এ হাদীসে إن قلوب بني اٰدم كلها (সকল আদম সন্তানের অন্তর) সম্পর্কে আহলে সুন্নত ওয়াল জামাআতের মান্যবর ইমাম হযরত মোল্লা আলী কারী (র.) (ওফাত : ১০১৪ হিজরী) লিখেছেন : এ শব্দগুলো সকল নবী, ওলী এবং সকল গোনাহগার ও হতভাগ্য কাফির সকলের জন্য প্রযোজ্য। সকলেই আল্লাহর কুদরতের নিয়ন্ত্রণে। (মিরকাত, ১ম খণ্ড, ১৬০ পৃষ্ঠা)

উক্ত ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী (র.) নবী-অনবী, পরহেজগার-গুনাহগার, এমনকি মুসলমান-অমুসলমান সবাইকে একই হুকুমের মধ্যে একসাথে উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা কেউ যদি নবী ও অনবী সবাইকে সমান মনে করে তাহলে এটা হবে মূর্খতা। রেজাখানীরা তাদের সিলসিলার নন এমন কোনো ব্যক্তির লেখায় এরূপ বক্তব্য পেলেই তার উপর নবীকে সাধারণ মানুষের সাথে তুলনা

দেয়ার কিংবা নবী-রাসূলের সাথে বেয়াদবি করার অভিযোগ আনে। তারা কি এখানে হযরত মোল্লা আলী কারী (র.) এর উপর এ ফতওয়া প্রদান করবে যে, তিনি নবী-রাসূলগণকে সাধারণ মানুষের সাথে তুলনা দিয়েছেন কিংবা তিনি নবী-রাসূলের সাথে বেয়াদবি করেছেন? প্রকাশ থাকে যে, রেজাখানীরা মোল্লা আলী কারী (র.)-কে তাদের লিখিত আহমদ রেজাখান সাহেবের জীবনী গ্রন্থ ‘জীবন ও কারামত’ বইয়ে দশম শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে উল্লেখ করেছে।

উল্লেখ্য, রেজাখানীদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমীও উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় তার ‘মিরআতুল মানাজীহ’ কিতাবে অনুরূপ লিখেছেন :

اس میں انبیاء اولیاء مؤمنین کفار بھی داخل ہیں کوئی بھی رب کے قبضہ سے خارج نہیں (مرأۃ المناجیح۔ جلد۱ ۔ص ۹۷)

-এর মধ্যে নবীগণ, ওলীগণ, মুমিন ও কাফিরগণও শামিল। কেউই আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের বাইরে নয়। (মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড ০১, পৃষ্ঠা ৯৭)

এখানে দেখা যাচ্ছে **আহমদ ইয়ার খান নঈমীও নবী, ওলী, মুমিন ও কাফির সবাইকে এক কাতারে বর্ণনা করেছেন। এরূপ বক্তব্য রেজাখানীদের দৃষ্টিতে বেয়াদবিমূলক। রেজাখানীরা কি তাদের হাকীমুল উম্মতের উপরও নবী-রাসূলের সাথে বেয়াদবি করার ফতওয়া প্রদান করবেন ?**

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর উক্তি

বড়পীর দস্তগীর শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর ‘ফতহুর রব্বানী’ কিতাবে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক মজলিসে ইরশাদ করেন-

الخلق عند اهل المعرفة كالذباب والزنابير كدود القز ، (الفتح الربانى، ص ٦٢٢)

অনুবাদ : মারিফতপন্থীদের নিকট সৃষ্টি জগৎ হচ্ছে- মাছি, বোলতা ও রেশমী পোকার ন্যায়। (ফতহুর রব্বানী, পৃষ্ঠা ৬২২)

বড়পীর দস্তগীর (র.) এর উক্তি সৃষ্টি জগৎ হচ্ছে- মাছি, বোলতা ও রেশমী পোকার ন্যায়। প্রকাশ থাকে যে, সৃষ্টি জগতের মধ্যে নবী-রাসূলগণও অর্ন্তভুক্ত। সুতরাং এ কথাটির অপব্যাখ্যা দিয়ে নবী রাসূলের সাথে বেয়াদবি করা হয়েছে, হযরত বড়পীর (র.) এর বিরুদ্ধে এ ধরনের ফতওয়া প্রদানের দুঃসাহস রেজাখানীরা করবেন কি?

অবশ্য রেজাখানীরা তাদের প্রতিপক্ষ কোনো বুযুর্গের এ ধরনের উক্তির উপর

ভিত্তি করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে বেয়াদবির ফতওয়া প্রদান করে থাকে।

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর আরেকটি উক্তি

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর ‘ফুতুহুল গায়ব’ এর মধ্যে রয়েছে যে,

اجعل الخليقة اجمع كرجل كنفه سلطان ، عظيم ملكه شديد امره مهونة صولته وسطوته ، ثم جعل الغلة في رقبته مع رجليه ثم صلبه علي شجرة الارف علي شاطئ نهر عظيم موجه فسيح عرضه عميق غوره شديد جريه ، ثم جلس السلطان علي كرسي عظيم قدره عال سمائه بعيد مرامه ووصوله وترك الي جنبه احصالا من السهام والرماح والنبل وانواع السلاح والقسي مما لا يبلغ قدرها غيره فجعل يرمي الصلوب بما شاء من ذالك السلاح ، (فتوح الغيب ، المقالة السابعة عشر)

“তুমি সমস্ত সৃষ্টিজগতকে এমন (অসহায়) ব্যক্তির মতো মনে করবে, যাকে বিশাল রাজত্বের অধিকারী, হুকুমের দিক থেকে কঠোর এবং ভয়ংকর শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী এক বাদশাহ পাকড়াও করেছেন। অত:পর তিনি ঐ বন্দি ব্যক্তির গর্দান ও উভয় পায়ে জিঞ্জির (শৃঙ্খল) পরিয়ে তাকে এক উত্তাল, প্রশস্ত, গভীর ও খরস্রোতা নদীর কিনারে একটি ছনুবর বৃক্ষের উপর শূলিতে চড়িয়েছেন। এরপর বাদশাহ এক সুমহান, সুউচ্চ চেয়ারে আসনগ্রহণ করলেন, যাতে আসীন হওয়া দুরূহ ব্যাপার। আর তার পাশে ছিল তীর, কামান, নেজা, বর্শাসহ বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য অস্ত্র-শস্ত্র। তিনি এ সকল অস্ত্রের মধ্য থেকে ইচ্ছামতো অস্ত্র নিয়ে ঐ বন্দির দিকে ছুড়তে লাগলেন।” (ফুতুহুল গায়ব, মাকালা ১৭)

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এখানে উপমা দিয়ে একথা বুঝাচ্ছেন যে, একজন প্রবল-পরাক্রমশালী, শান-শওকত ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী বাদশাহর সামনে শূলিতে চড়ানো উপরোক্ত ব্যক্তি যেমন অসহায় আল্লাহর ইয্যত ও জালালতের মোকাবিলায় সমস্ত সৃষ্টিজগতও তদ্রূপ অসহায় ও দুর্বল।

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এখানে সমস্ত সৃষ্টিজগতকে শূলিতে চড়ানো অসহায় বন্দি ব্যক্তির মতো বলেছেন, যার মধ্যে নবী-রাসূল,

ওলী-আউলিয়া সকলেই শামিল রয়েছেন। রেজাখানীরা তাদের স্বভাবসুলভ অপব্যাখ্যার মাধ্যমে হযরত বড়পীর (র.) এর উপর কি এই অভিযোগ উত্থাপন করবেন যে, তিনি নবী-রাসূলগণকে শূলিতে চড়ানো অসহায় বন্দির সাথে তুলনা দিয়ে বেয়াদবি করেছেন ?

শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র.) এর উক্তি

ইমাম ইয়াফিঈ (র.) তদীয় 'রাওদুর রাইয়াহীন' গ্রন্থে হযরত শায়খ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী (র.) এর আকীদা বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, "তামাম সৃষ্টি, ফেরেশতাকুল, জিন, ইনসান, আরশ, কুরসী, লাওহ, কলম, যমীন, আসমান এবং অন্যান্য ও অন্যান্য সবকিছু আল্লাহ জাল্লা জালালুহু এর আযমত ও মহানত্বের মোকাবিলায় ষরিষা দানার চেয়েও ক্ষুদ্র।"

শায়খ শিহাবুদ্দীন (র.) এর প্রসিদ্ধ কিতাব 'আওয়ারিফুল মাআরিফ' এর মধ্যে আছে,

لا يكمل ايمان امرء حتي يكون الناس عنده كالاباعر (عوارف المعارف ، ص ٤٥)

অর্থাৎ **কোনো ব্যক্তির ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ তার নিকট সমস্ত মানুষ (আল্লাহর ইয্যত ও জালালতের মোকাবিলায়) উটের গোবরের মতো মনে না হয়।** (আওয়ারিফুল মাআরিফ, পৃষ্ঠা ৪৫)

রেজাখানীরা এ দুটি বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করার দুঃসাহস কি দেখাবেন ?

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর উক্তি

মিশকাত শরীফে বর্ণিত তিরমিযী ও আবূ দাউদ সূত্রে বর্ণিত একটি হাদীস :

الناس كلهم بنو اٰدم واٰدم من تراب ، (ترمذى ، ابو داود)

অনুবাদ : সকল মানুষ আদম হতে, আর আদম মাটি হতে (সৃষ্ট)। (তিরমিযী ও আবূ দাউদ)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন, সকল মানুষ আদম সন্তান। আর আদম মাটি হতে (সৃষ্ট)। মাটি লাঞ্চিত ও অবনমিত, ইয্যত ও উঁচু হওয়া এর বৈশিষ্ট্য নয়। (আশিআতুল লুমআত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯৪)

একথার উপর ভিত্তি করে কি কেউ বলতে পারবে যে, শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) হযরত আদম (আ.) কে লাঞ্চিত ও অবনমিত বলেছেন? কখনো না। কোনো মুসলমান এরূপ বেয়াদবি করবে না।

আহমদ রেজাখান সাহেবের জীবনী গ্রন্থ 'জীবন ও কারামত' বইয়ের ৮৭ নং পৃষ্ঠায় রেজাখানীরা আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-কে একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে উল্লেখ করেছে। তারা যেহেতু অন্যান্য বুযুর্গানে কিরামের লেখায় এ ধরনের বক্তব্য পেলে এর অপব্যাখ্যা করে সেহেতু হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর এ কথার অপব্যাখ্যা করে কি এ অভিযোগ করবে যে, তিনি হযরত আদম (আ.) কে লাঞ্চিত ও অবনমিত বলেছেন?

উলামা-মুহাদ্দিসীন ও বুযুর্গানে কিরামের কথা বুঝার দক্ষতা থাকার প্রয়োজন। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) যে দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন তা উপলব্ধি করার যোগ্যতা না থাকলে কেউ তার উপর অহেতুক অভিযোগ করে বসতে পারে, যেরূপ রেজাখানীরা করে থাকে। রেজাখানীদের জেনে রাখা উচিত, অপব্যাখ্যার মাধ্যমে আল্লাহওয়ালাদের প্রতি ভুল ধারনা সৃষ্টি করে তাদের প্রতি মানুষদের বীতশ্রদ্ধ করা খুবই জঘন্য অপরাধ।

বুখারী শরীফে আল্লাহর জ্ঞানের সাথে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞানের তুলনা

হযরত খিযির (আ.) এর সাথে মুসা (আ.) এর সাক্ষাত এবং তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান লাভের যে বর্ণনা বুখারী শরীফে উল্লেখ করা হয়েছে তাতে হযরত খিযির (আ.) এর জ্ঞান, মুসা (আ.) এর জ্ঞান এবং সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান মহান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় কতটুকু নগণ্য তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে,

وقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره فى البحر فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمى وعلم الخلائق فى علم الله الا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره ، (بخاري ، جلد ٢ ، كتاب التفسير ، سورة الكهف)

অর্থাৎ একটি চড়ুই পাখি নৌকার কিনারে বসল। অতঃপর সেই পাখিটি তার ঠোঁট দিয়ে সমুদ্র থেকে পানি নিলো, তখন খিজির (আ.) মূসা (আ.) কে বললেন, **আমার, আপনার এবং সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান মহান আল্লাহর জ্ঞানের তুলনায় এই চড়ুই পাখির ঠোঁটের পানির ন্যায়।** (বুখারী)

রেজাখানীরা উক্ত হাদীস শরীফে বর্ণিত খিযির (আ)-এর উক্তির অপব্যাখ্যা দিয়ে হযরত খিযির (আ.) এর উপর অপবাদ আরোপের দুঃসাহস দেখাবেন কি?

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার

একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, রেজাখানীরা আল্লাহর নিকট ছোট বা দুর্বল হতে চায় না। তাই কোনো বুযুর্গ বা কোনো লেখক সৃষ্টিজগতকে ক্ষুদ্র কোনো ক্ষুদ্র বিষয়ের সাথে তুলনা দিলে তারা এর অপব্যাখ্যায় লিপ্ত হয়। এমনকি বিষয়টিকে নবী-রাসূলগণের অবমাননার সাথে যুক্ত করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুমরাহীর ফতওয়া দেয়। পক্ষান্তরে তারা পীর-মুর্শিদের সামনে নিজেদের ছোট বা দুর্বল হিসেবে উপস্থাপন করতে কোনো অসুবিধা মনে করে না। আহমদ রেজা খান সাহেবের জীবনী গ্রন্থ 'জীবন ও কারামত' এর মধ্যে রয়েছে : "একদা সাজ্জাদনশীন সাহেব আলা হযরত কেবলার কাছে পাহারাদারের জন্য দু'টি কুকুরের ফরমায়েশ করলেন, তৎক্ষণাত আলা হযরত কেবলা ঘরে পৌছে উচ্চ বংশের দু'টি কুকুর খানেক্বায় নিয়ে সাজ্জাদনশীনের খেদমতে উপস্থিত করে আবেদন করলেন, হুজুর! আহমদ রেজা এ দু'টি কুকুর আপনার খেদমতে পেশ করতেছেন, এরা দিনের বেলায় আপনার কাজ কাম করবেন আর রাতের বেলায় পাহারা দেবেন। **কুকুর দু'টি ছিল আলা হযরত কেবলার সাহেবজাদা। একজন হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম হামেদ রেজা খান সাহেব অপরজন হলেন মুফতীয়ে আজম মুস্তফা রেজা খান সাহেব।**" (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ৮১)

এখানে পাঠক লক্ষ্য করুন, আহমদ রেজা খান সাহেব নিজের দুজন সন্তান, যারা রেজাখানীদের হুজ্জাতুল ইসলাম ও মুফতীয়ে আযম, তাদেরকে **দরবারের সাজ্জাদনশীনের খিদমতে কুকুর** হিসেবে পেশ করেছেন।

যখন অন্য কারো লেখায় এরকম কোনো তুলনা পাওয়া যায় তখন রেজাখানীরা এর মর্মার্থ গ্রহণ না করে শাব্দিক অর্থ নিয়ে থাকে। রেজাখানীরা এখানেও তাদের ইমাম আহমদ রেজা খান সাহেবের দুজন সন্তানকে কি সেভাবে কুকুরই মনে করবে?

আল্লাহর জালালিয়াতের শানকে উপেক্ষা করা যায় না

উলামায়ে কিরামের কেউ আল্লাহ পাকের ইয্যতের মুকাবিলায় কোনো নবী রাসূলের ইয্যতকে নগণ্য বলে কোনো উপমা পেশ করলে রেজাখানীরা এটাকে

অপরাধ মনে করে থাকে। অথচ আল্লাহর ইয্যতের মুকাবিলায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য মনে করতেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিভিন্ন হাদীসে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুসলিম শরীফের একটি হাদীস নিম্নে পেশ করা হল-

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللّٰهم إنى أعوذبك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل (رواه مسلم)

অনুবাদ : হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ আমি আমার কৃত সকল মন্দ কাজ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং আর যে সকল মন্দ কাজ করিনি তা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম শরীফ)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় রেজাখানীদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমী লিখেন-

یعنی جو برائی میں کر چکا ہوں ان کی شر سے بچالے کہ ان کی معافی دیدی اور جو برائی ابھی نہیں کی ہیں آئندہ کرنے والا ہو ان کی شر سے بچالے کہ ان کے نہ کرنے کی توفیق دے (مرآۃ المناجیح۔ جلد ۴ صفحہ ۷۲)

অর্থাৎ **আমি যে সকল মন্দ কাজ করেছি এগুলোর মন্দ থেকে আমাকে বাঁচান অর্থাৎ ক্ষমা করে দিন। আর যে সকল মন্দ কাজ এখনও করিনি, ভবিষ্যতে করব এগুলোর মন্দ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন অর্থাৎ তা না করার তাওফীক দিন।** (মিরআতুল মানাজিহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২)

এ ধরনের ব্যাখ্যা রেজাখানী আলিম ছাড়া অন্য কেউ দিয়ে থাকলে তার সম্পর্কে তারা দাজ্জালি ফতওয়া দিবে যে তিনি যেন বলেছেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীতেও গুনাহ করছেন, ভবিষ্যতেও গুনাহ করবেন (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ, দাজ্জালী ফতওয়া প্রদান তাদের চিরাচরিত অভ্যাস।

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর একটি স্বপ্ন নিয়ে অপপ্রচার

স্বপ্নে দেখা বিষয় এবং তার তা'বীরের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রয়েছে। রেজাখানীদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমীও এটা স্বীকার করেন। আহমদ ইয়ার খান নঈমী তার 'মিরআতুল মানজীহ' কিতাবের ভূমিকায় ইমাম বুখারী (র.) এর একটি স্বপ্ন ও এর তা'বীর প্রসঙ্গে লিখেছেন, "**তিনি (ইমাম বুখারী) স্বপ্নে দেখেছেন যে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারক থেকে মাছি তাড়াচ্ছেন। তার এ স্বপ্নের তাবীর দেয়া হলো, তুমি হাদীসের খেদমত করবে** অর্থাৎ সহীহ হাদীসকে যঈফ হাদীসকে পৃথক করবে।" (মিরআতুল মানাজীহ এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২৭)

এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, স্বপ্ন ও এর তা'বীর এক নয়। কিন্তু আব্দুল করিম গং রেজাখানীরা অজ্ঞতাবশতঃ কিংবা বুযুর্গানে কিরামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করার উদ্দেশ্যে স্বপ্ন আর বাস্তবকে একই মনে করে। এর একটি নমুনা নিম্নে পেশ করা হল।

রেজাখানীদের লিখিত বালাকোট 'আন্দোলনের হাকীকত' (পৃষ্ঠা ১৯), 'হক ও বাতিলের পরিচয়' (পৃষ্ঠা ১৮) ও 'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়ার গোমর ফাঁস' (পৃষ্ঠা ৯) এর মধ্যে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর একটি স্বপ্ন উল্লেখ করা হয়েছে যে- "একদিন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) বেলায়তের সম্রাট হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এবং রমণীকূল রাণী হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা কে স্বপ্নে দর্শন লাভে ধন্য হন, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আপন হাত মুবারক দ্বারা গোসল দেন এবং তার শরীরকে খুব ভালভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেন, যে ভাবে পিতা-মাতা আপন সন্তানকে গোসল করিয়ে দেন এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে দেন এবং হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা তাকে খুবই উন্নত মানের মূল্যবান পোশাক আপন হাত মুবারক দ্বারা পরিয়ে দেন। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ত্বরীকে নবুওয়াতের কামালত বিকাশ লাভের সূচনা হয়েছে।"

উক্ত স্বপ্নের উপর অভিযোগ করতে গিয়ে রেজাখানীরা লিখেছে : "এ ধরনের স্বপ্ন দ্বারা নিজের ভণ্ডামীর আড়ালে কামালিয়াত প্রকাশ করা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। কারণ হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা প্রিয় নবীর এমন কন্যা যাকে পৃথিবীতে কোনো পুরুষ দেখতে পায়নি, আর এ মূর্খ ছৈয়দ আহমদ বেরলভী দাবী করে বসল তাকে ফাতিমা ও আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু গোসল দিয়ে কাপড় পরিধান করানোর মাধ্যমে নবুওয়তের রাস্তা সমুজ্জল করে দিলেন। নাউজুবিল্লাহ! এক সাথে কত ভণ্ডামী? তার এ কথা নবুওয়াত দাবীর ইঙ্গিত নয় কি? কত বড় সাহস আর ভণ্ডামী করার ইচ্ছা থাকলে এরকম আজগুবী স্বপ্নের কথা বলে সরল প্রাণ মুসলমানকে ধোকা দিতে পারে তা সহজে অনুমেয়। অতএব ছৈয়দ আহমদ বেরলভীর এরকম আজগুবী স্বপ্ন নিকৃষ্ট ভণ্ডামীর সর্বশেষ নমুনা। স্বীয় বাতিল আক্বীদা মুসলমানদের মধ্যে বিস্তারের লক্ষ্যে তার এ অপকৌশল। এতে অজ্ঞতা ও বেহায়াপনা প্রমাণ হল কি না? ছোট শিশুকে মা-বাবা তো অবশ্যই উলঙ্গ করে ঘষে মেঝেই গোসল দিয়ে থাকেন। কিন্তু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কিভাবে ছৈয়দ আহমদের ন্যায় এত বড় যুবক ব্যক্তিকে নিজ হাতে গোসল দিলেন তাও আবার ছোট শিশুর ন্যায় আবার তাকে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নাকি নতুন উত্তম পোশাক পরিধান করিয়ে দিয়েছেন নাউজুবিল্লাহ। তা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে কি? এতে তাদের শানের অবমাননা হয় নাই কি? আওর মুহাম্মদীগণ সঠিক জবাব দেবেন কি? এমন বেহায়া পীরকে বুঝি আপনারা আমীরুল মুমিনীন হিসেবে মান্য করছেন? আর এমন বেহায়াপনাকেই বুঝি আপনাদের তাসাউফ শাস্ত্রে কামালাত বলা হয়? আছতাগফিরুল্লাহ। ওহে আওর মুহাম্মদী ছাহেবান! এরপরেও কি আপনারা এ স্বপ্নকে কামালাত হিসাবে মান্য করেন? হ্যা যদি মান্য করেন তাহলে আপনাদেরকে আমরা তিন মাসের বোকার ন্যায় মনে করব।" (বালাকোট আন্দোলনের হাকীকত, পৃষ্ঠা ১৯, হক বাতিলের পরিচয়, পৃষ্ঠা ১৮, ত্বরিকায়ে মুহাম্মদীয়ার গোমর ফাস, পৃষ্ঠা ৯)

এখানে রেজাখানীরা মূলত: দুটি অভিযোগ করেছে যে,

১. ত্বরীকে নবুওয়াতের কামালত এর মাধ্যমে নাকি সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) নবুওয়াতের পরোক্ষ দাবী করেছেন। (এ অভিযোগের জবাব এ অধ্যায়ে পরবর্তীতে রয়েছে)

২. এ স্বপ্নের মাধ্যমে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা-এর সুমহান শানের অবমাননাও নাকি করা হয়েছে। তাদের প্রশ্ন হলো- "হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কিভাবে সায়্যিদ আহমদের ন্যায় এত বড় যুবক ব্যক্তিকে নিজ হাতে গোসল দিলেন, তাও আবার ছোট শিশুর ন্যায়, আবার তাকে হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা নাকি নতুন উত্তম পোশাক পরিয়ে দিয়েছেন।"

রেজাখানীদের এ অভিযোগ মারাত্মক মুর্খতার পরিচায়ক। কারণ স্বপ্ন এবং বাস্তবতা এক নয়। স্বপ্ন ও এর তা’বীর যে ভিন্ন ভিন্ন হয় নিম্নে হাদীসের নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো।

* হযরত আয়শা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা স্বপ্নে দেখেছিলেন তাঁর ঘরে তিনটি চাঁদ অস্তমিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তা’বীর করেছেন যে তিনি এবং হযরত আবূ বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এ ঘরে সমাহিত হবেন।
* হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে দেখেছিলেন যে তিনি এক আঙ্গুলে দুধ ও এক আঙ্গুলে মধু চুষছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তা’বীরে তাঁকে বলেছেন, তুমি তাওরাত ও কুরআনের জ্ঞান অর্জন করবে।
* রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত ওরাকা বিন নওফেলকে স্বপ্নে সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় দেখে এর তা’বীর করেছেন যে, তিনি বেহেশতী।
* হযরত উম্মুল ফদ্বল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা স্বপ্নে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি অঙ্গ তাঁর ঘরে দেখতে পেয়ে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বর্ণনা করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাবীরে বলেছেন যে, তুমি ফাতিমার সন্তানকে দুধ পান করাবে।

আমরা উপরোক্ত আলোচনা থেকে অবগত হলাম যে, স্বপ্ন এবং এর তা’বীর ভিন্ন হয়। কিন্তু রেজাখানীদের অভিযোগ থেকে প্রমাণ হয় যে, তারা স্বপ্নকে বাস্তবের মতোই মনে করে।

আহমদ রেজা খান সাহেবের একটি স্বপ্ন

‘জীবন ও কারামত’ গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে যে, আহমদ রেজা খান সাহেব আট বছর বয়সে হেদায়াতুন্নাহু কিতাবখানা পড়েছেন এবং এটি পড়ার পর এর একটি আরবী ব্যাখ্যাও লিখেছেন। ঐ সময় তিনি একটি স্বপ্ন দেখেছেন। গ্রন্থকার লিখেছেন- “আলা হযরত কেবলা স্বপ্নে দেখলেন, একটি সু-উচ্চ প্রাসাদ, যার পাহারা দিতেছেন ভারত বর্ষের একজন সুপ্রসিদ্ধ অলি হযরত কাফী (রাহমাতুল্লাহে আলাই) হযরত কাফী (রাহমাতুল্লাহে আলাই) আলা হযরতকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেন-

يا احمد رضا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذا الدار فادخل وزره صلي الله عليه وسلم

-হে আহমদ রেজা নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এ ঘরে তাশরীফ এনেছেন, তুমি ভিতরে যাও এবং আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম এর সাথে স্বাক্ষাত করে আস।

অতঃপর **আলা হযরত কেবলা প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন, প্রবেশ করার পর দেখলেন, মাহবুবে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁর দয়ালু মাতা হযরত সৈয়দাতুনা আমেনা খাতুন রাদিয়াল্লাহু আনহার কোল মোবারকে নিজ শিশুকালীন অবস্থায় তাশরীফ ফরমায়েছেন এবং তাঁর পবিত্র বুকের দুধ পান করতেছেন।** রাসূলে খোদা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ঐ প্রাসাদে তাঁর গোলাম আলা হযরতকে দেখে তাঁর শ্রদ্ধেয়া আম্মাজানকে বললেন, আমার আহমেদ রেজা এসে গেছেন। আলা হযরত রাসূলে খোদাকে সালাতো সালাম, সম্মান ও তাজীম আরজ করে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে আসলেন। আসার সময় পাহারায় নিয়োজিত হযরত কাফী (রাহমাতুল্লাহে আলাই) কে বললেন,

يا كافي لقد زرت رسول الله صلي الله عليه وسلم

অর্থাৎ হে কাফী নিশ্চয় আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে স্বাক্ষাৎ করেছি।” (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ১৭৯)

রেজাখানীরা অন্যান্য বুযুর্গানে কিরামের স্বপ্নের অপব্যাখ্যা করে থাকে। তারা কি এখানে আহমদ রেজা খান সাহেবের স্বপ্নের অপব্যাখ্যা করবে? কেননা এ স্বপ্নের বর্ণনা মোতাবেক **আহমদ রেজা খান সাহেব নিজের আট বছর বয়সে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুধের শিশু অবস্থায় মাতৃকোলে দুগ্ধপানরত দেখেছেন।** অর্থাৎ আহমদ রেজা খান সাহেবের বয়স যখন আট বছর, তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল দুধের শিশু। রেজাখানীরা তাদের রীতি অনুযায়ী চাইলে এখানে প্রশ্ন আনতে পারে অথবা সে তাদের অনুযায়ী প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, **আহমদ রেজা খান সাহেব কি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেয়ে বড় ?**

আওলাদে রাসূল, ইমামুত তরীকত, আমীরুল মু’মিনীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কর্তৃক হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ফাতিমা

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে স্বপ্নে দেখার বিষয়টি অপব্যাখ্যা করতে গিয়ে শেখ আব্দুল করিম গং রেজাখানীরা তার উপর অনেক অপবাদ আরোপ করেছে। অথচ তিনি হলেন সায়্যিদ বংশীয় অর্থাৎ তিনি রাসূলে পাক (সা.) এর আহলে বায়ত তথা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর বংশধর। অন্যদিকে তাদের ইমাম পাঠান বংশীয় হওয়া সত্ত্বেও নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর মাতা হযরত আমিনা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর দুধ পানরত অবস্থায় দেখা তার নবী প্রেমিক হওয়ার প্রমাণ হিসেবে তারা গৌরবের সাথে উল্লেখ করেছে।

আসলে তাদের কথা ও কাজে কোনো মিল নেই। নতুবা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর স্বপ্নের ব্যাপারে রেজাখানীরা যে সকল অভিযোগ আরোপ করেছে, আহমদ রেজাখান সাহেবের স্বপ্নের বিষয়ে নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার সেই সকল অভিযোগ আরোপ করা উচিৎ।

ইসলামী তা’বীর ও রেজাখানী তা’বীরের পার্থক্য

রেজাখানীদের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, স্বপ্নে যা দেখা যাবে বাস্তবে তার উপরই ফতওয়া হবে। এ হিসেবে তাদের দৃষ্টিতে, **কেউ যদি স্বপ্নে কোনো বেগানা মহিলার সাথে সহবাস করতে দেখে তাহলে তার উপর কি যিনার শাস্তি আরোপিত হবে?**

অনুরূপভাবে **কেউ যদি স্বপ্নে তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিতে দেখে তাহলে তার স্ত্রীর উপর কি তালাক পতিত হবে?** একইভাবে **কাউকে যদি স্বপ্নে মৃত দেখা যায় তাহলে তার ওয়ারিশগণ কি তার সম্পতি ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে পারবে?**

বিশিষ্ট তাবিঈ ইমাম ইবনে সিরীন (র.) এর স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কিত ‘‘তাফসীরুল আহলামিল কবীর’’ কিতাব থেকে কয়েকটি স্বপ্নের তাবীর দেয়া হলো-

* যদি কোনো মহিলা কোনো কিশোরকে স্বপ্নে দেখে, তবে সে ঐ কিশোরের রূপসৌন্দর্যের ও ভাল মন্দের হিসাবে কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করবে।

* যদি কোনো অপরিচিতা মেয়েকে তার সাথে কথা বলতে দেখে বা তাকে কোনো কিছু দিতে দেখে, বা কোনো মেয়ের সাথে আলিঙ্গন করতে দেখে, বা তাকে আদর করতে দেখে, বা তার সাথে উঠাবসা করতে দেখে, তার সাথে

বীর্যপাত করা ছাড়াই সহবাস করতে দেখে, তবে এর ব্যাখ্যা হলো, বৎসর বা দিনকালের ভালমন্দ উক্ত মেয়ের ভাল-মন্দ অবস্থার উপর নির্ভরশীল হবে। অর্থাৎ মেয়ে যদি সুন্দরী মোটা তাজা হয়, তবে তার বৎসর ভাল যাবে (শুভ হবে) এবং উত্তম জীবিকা লাভ করবে। আর যদি মেয়ে এর বিপরীত হয়, তবে বৎসরও ঐ রকম যাবে, যেরকম সে স্বপ্নে দেখেছে। (তাফসীরুল আহলামিল কবীর, ১১নং পরিচ্ছেদ)

উল্লেখ্য, **বর্ণিত দু’টি স্বপ্নের প্রথমটির রেজাখানী সিদ্ধান্ত হবে মহিলাটি কিশোরকে দেখার কারণে হারাম কাজ সম্পাদনকারী সাব্যস্ত হবে। দ্বিতীয় স্বপ্নের রেজাখানী সিদ্ধান্ত হবে সহবাস করার কারণে উক্ত ব্যক্তিকে রজম করতে হবে, যদি সে বিবাহিত হয়। আর অবিবাহিত হলে দুররা তথা বেত্রাঘাত করতে হবে।** চিন্তা করে দেখুন রেজাখানী তা’বীর মানা কি কোনো মুসলমানের পক্ষে সম্ভব।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহমদ ইয়ার খান নঈমী তার ‘মিরআতুল মানজীহ’ কিতাবের ভূমিকায় ইমাম বুখারী (র.) এর একটি স্বপ্ন ও এর তা’বীর প্রসঙ্গে লিখেছেন, “তিনি (ইমাম বুখারী) স্বপ্নে দেখেছেন যে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীর মুবারক থেকে মাছি তাড়াচ্ছেন। তার এ স্বপ্নের তাবীর দেয়া হলো, তুমি হাদীসের খেদমত করবে অর্থাৎ সহীহ হাদীসকে যঈফ হাদীসকে পৃথক করবে।” (মিরআতুল মানাজীহ এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২৭)

আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং রেজাখানীরা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর স্বপ্নকে যেভাবে বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে অপব্যাখ্যা করেছে এবং তার উপর নানা অভিযোগ করেছে সেভাবে ইমাম বুখারী (র.) এর উক্ত স্বপ্নের অপব্যাখ্যা করে তার উপর কি তারা কোনো অভিযোগ করবেন? কেননা **আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের তা’বীর অনুযায়ী এ স্বপ্ন থেকে প্রমাণ হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরে মাছি বসত। অর্থাৎ তিনি নূর ছিলেন না।**

প্রকাশ থাকে যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরীরে মাছি বসত না। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর কারণ লিখেছেন যে, তিনি নূর হবার কারণে তাঁর শরীরে মাছি বসত না।

রেজাখানীরা হিংসাবশতঃ সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর স্বপ্নের যেরূপ অপব্যাখ্যা করেছে এরূপ করলে তা পক্ষান্তরে ইমাম আবূ হানীফা (র.), ইমাম বুখারী (র.) সহ জগদ্বিখ্যাত ফকীহ, বুযুর্গ ও মুহাদ্দিসীনে কিরামের উপর গিয়ে পড়বে। সুতরাং এরূপ অপব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকা উচিত।

ইমাম ইবনে সিরীন (র.) এর স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কিত ''তাফসীরুল আহলামিল কবীর'' কিতাবের ২২নং পরিচ্ছেদ থেকে আরেকটি স্বপ্নের তা'বীর প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হলো-

বর্ণিত আছে, একজন লোক ইমাম ইবনে সিরীনের (র.) নিকট এসে বলল, **আমি স্বপ্নে দেখেছি বসরার মসজিদে একজন লোক বিবস্ত্র অবস্থায় (ছতর ব্যতিত) খোলা তলোয়ার হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে**। আর একটি পাথরে আঘাত করে পাথরটি ছিদ্র করতেছে। **ইমাম ইবনে সিরীন (র.) বললেন, এ লোকটি ইমাম হাসান বসরী (র.) হবেন। লোকটি বলল– আল্লাহর কসম, তিনি হাসান বসরীই**। ইমাম ইবনে সিরীন (র.) বললেন, আমি বুঝতে পেরেছি যে,তিনিই বিবস্ত্র হয়ে (দুনিয়ার সম্পর্ক ছেদ করে) শুধুমাত্র দ্বীনের জন্য মসজিদে বসেছেন। আর যে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতেছিলেন তা হলো, হাসান বসরী (র.) এর যবান বা হক কথা, যা দ্বারা তিনি (দিলের) পাথর ছিদ্র করতেছিলেন। (তাফসীরুল আহলামিল কবীর, ২২নং পরিচ্ছেদ)

উক্ত স্বপ্নের রেজাখানী তা'বীর অনুযায়ী হাসান বসরী (র.) এর অবস্থা কি দাঁড়ায়? রেজাখানীদের সমালোচনা থেকে কারও বাঁচার কি উপায় আছে?

স্বপ্নে আল্লাহকে দেখার তা'বীর

আব্দুল করিম গং রেজাখানীরা আমিরুল মু'মিনীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর স্বপ্নযোগে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত হওয়ার ঘটনাকেও বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। সুন্নী নামধারী ভণ্ডদের জেনে রাখা উচিৎ যে, ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) এর স্বপ্নযোগে আল্লাহর সাথে বহুবার সাক্ষাত হওয়ার প্রমাণ রয়েছে।

ইমাম ইবনে সিরীন (র.) তদীয় স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কিত ''তাফসীরুল আহলামিল কবীর'' কিতাবে **"স্বপ্নে নিজেকে আল্লাহ তাআলার সম্মূখে উপস্থিত দেখা"** শিরোনামে একটি পরিচ্ছেদ পর্যন্ত এনেছেন। এতে রয়েছে–

* **যদি কেউ স্বপ্নে আল্লাহ তাআলার সাথে কানে কানে কথা বলতে দেখে, তবে আল্লাহ তাআলা তাকে সান্নিধ্য ও নৈকট্য দানের মাধ্যমে সম্মানিত করবেন এবং মানুষের মধ্যে জনপ্রিয়তা দান করবেন**। যেহেতু আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন "আমি তাকে (মুসা আ.) ভেদ বা গূঢ়তত্ত্ব আলোচনার জন্য নিকটবর্তী করলাম।" (তাফসীরুল আহলামিল কবীর, ২য় পরিচ্ছেদ)

* **যদি কেউ আল্লাহ তাআলার কুরসী বা সিংহাসনের দিকে তাকাতে দেখে, তবে সে নিয়ামত বা রহমত লাভ করবে**। (তাফসীরুল আহলামিল কবীর, ২য় পরিচ্ছেদ)

* **যদি কেউ কোনো পরিচিত জানাশুনা জায়গায় আল্লাহ তাআলার সম্মূখে নিজেকে হাযির দেখে, তবে সেখানে আদল ইনসাফ ছড়িয়ে পড়বে, উক্ত স্থান শস্য-শ্যামল প্রান্তরে পরিণত হবে এবং তথাকার যালিমরা ধ্বংস হবে, মাযলুমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে**। (তাফসীরুল আহলামিল কবীর, ২য় পরিচ্ছেদ)

কামালাতে নবুওয়াত (নবুওয়াতের উচ্চ গুণাবলী) অর্জিত হওয়া

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের জানা উচিত যে, একজন কামিল ওলীকে আল্লাহকে আল্লাহ তাআলা অনেক উচ্চ মর্যাদা দান করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- **تخلَّقوا بأخلاق الله** অর্থাৎ তোমরা আল্লাহর চরিত্রে চরিত্রবান হও। এ হাদীস থকে বুঝা যায়, **একজন ওলীর ক্ষেত্রে কেবল কামালাতে নবুওয়াতই সম্ভব- এমন নয়, বরং আল্লাহর চরিত্র অর্জিত হওয়াও সম্ভব**। তবে এর তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

জামে' সগীর কিতাবে এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে,

إن لله تعالي مأة خلق وسبعة عشر خلقا– من أتاه بخلق منها دخل الجنة ،

অর্থাৎ আল্লাহ তাআ'লার একশ' সতেরটি আখলাক রয়েছে। যে ব্যক্তি এর যে কোনো একটি অবলম্বন করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস উল্লেখ করা যেতে পারে-

عن أبي هريرة عن النبي فيما يروى عن ربه عز وجل أنه قال ما تقرب إلى عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ،

অর্থ- হযরত আবূ হুরাইরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর প্রতিপালকের নিকট থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার নৈকট্য লাভের সবচেয়ে বড় মাধ্যম হলো ফরয। বান্দা নফলের মাধ্যমেও আমার নিকটবর্তী হয়। এমনকি তাকে আমি ভালবাসতে শুরু করি। আর যখন তাকে আমি ভালবাসি, তখন আমি তার শ্রবণেন্দ্রিয় হয়ে যাই; যার দ্বারা সে শুনতে পায়, আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যার দ্বারা সে দেখতে পায়, আমি তার হাত হয়ে যাই যার দ্বারা সে ধরে, আমি তার পা হয়ে যাই যার দ্বারা সে চলাফেরা করে।

মাওলানা রূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মছনবীতে অতি সুন্দর করে আল্লাহর সাথে আল্লাহর ওলীদের সম্পর্কের স্বরূপ তুলে ধরেছেন:-

مطلق آں آواز خود از شہ بود

گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

মুতলাক আঁ আওয়াযে খোদ আয শাহ্ বুওয়াদ
গারচে আয হলকুমে আব্দুল্লাহ বুওয়াদ।

অর্থ: ঐ ধ্বনি আল্লাহ পাকেরই আওয়াজ যদিও তা আল্লাহর বান্দার (ওলীয়ে কামিল এর) কণ্ঠে ধ্বনিত হয়।

گفت اورا من زبان و چشم تو

من حواس و من رضاو خشم تو

গুফতে উরা মান যবানো চশমে তূ
মান হাওয়াছ ও মান রেযা ও খাশমে তূ।

অর্থ: আল্লাহ তাআলা (তার ওলীকে) বলেন আমিই তোমার রসনা ও চক্ষু। আমিই তোমার ইন্দ্রিয়, তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি।

رو کہ بِی یسمع و بِی یبصر توئی

سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی

রাউ কে বী ইয়াসমাউ ওয়া বী ইউবছিরু তূয়ী
সিররে তুয়ী ছে জায়ে সাহিবে সিররে তুয়ী

অর্থ: যাও (হে প্রিয়!) তুমি আমার দ্বারা শ্রবণ কর, আমার দ্বারা প্রত্যক্ষ কর। তুমি আমার গুপ্ত রহস্য ভাণ্ডার; বরং তুমি নিজেই আমার রহস্য।

چوں شدي من كان لله از ولہ

من ترا باشم کہ کان اللہ لہ

চুঁ শুদী মান কানা লিল্লাহি আয ওলাহ্
মান তোরা বাশাম কে কানাল্লাহু লাহ।

অর্থ: যখন তুমি (এশকে এলাহীর বদৌলতে) আল্লাহর জন্য হয়ে গেলে তখন আমিও তোমার বন্ধু ও সাহায্যকারী হয়ে গেলাম।

মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) এর দৃষ্টিতে কামালাতে নবুওয়াত অর্জিত হওয়া

ইমামে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) মকতুবাত শরীফে মিয়া শেখ মোহাম্মদ ছাদিক এর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে এক পর্যায়ে লিখেছেন-

اے فرزند! نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کامل تابعدار تابعداری کے سبب جب کمالات نبوت کو تمام کر لیتا ہے پھر وہ اگر اہل مناصب سے ہے تو منصب امامت سے اس کو سرفراز کرتے ہیں۔

“প্রিয় বৎস! **নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিপূর্ণ অনুসারী তাঁর অনুসরনের কারণে কামালাতে নবুওয়াত (নবুওয়াতের উচ্চ গুণাবলী) পরিপূর্ণভাবে অর্জন করে উচ্চাসনের যোগ্য হলে তাকে ইমামতি দান করা হবে।**” (মকতুবাত শরীফ, দফতরে আউয়াল, ২৬০ নং মকতুব)

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের অভিযোগ থেকে মনে হয় যে তারা কামালতে নবুওয়াতকে নবুওয়াতের পরোক্ষ দাবী মনে করেন। অথচ মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) বলেছেন, **নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের মাধ্যমে কামালাতে নবুওয়াত অর্জিত হয়।** মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) সম্পর্কে রেজাখানীরা এখন কী বলবেন? মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর বক্তব্য কি তাদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়? যদি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র.) এর বক্তব্য তারা গ্রহণ করে থাকেন তাহলে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর ব্যাপারে দাজ্জালী ফতওয়া কেন?

আহমদ রেজা খান সাহেবের দৃষ্টিতে কামালাতে নবুওয়াত

আহমদ রেজা খান তার ‘‘ফতওয়ায়ে আফ্রিকা’’ গ্রন্থে আব্দুল কাদির জিলানী (র.) সম্পর্কে লেখেন- হুযূরে পুরনূর সাইয়িদুনা গউসে আজম (র.) হুযূরে আকদ্দছ ও আনোয়ারে সাইয়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পরিপূর্ণ ওয়ারিস, পূর্ণাঙ্গ স্থলাভিষিক্ত, তাঁর সত্বার প্রতিচ্ছবি। **তাঁর মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সমস্ত গুণাবলি, জামাল ও কামাল এবং শ্রেষ্ঠত্ব উদ্ভাসিত হয়েছে।** (ফতওয়ায়ে আফরিকা, করাচি থেকে প্রকাশিত, পৃষ্ঠা ১৬)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, **আহমদ রেজা খান সাহেবও কোনো ওলীর মধ্যে কামালাতে নবুওয়াত প্রকাশিত হওয়ার বিষয় স্বীকার করেছেন এবং এটাকে নবুওয়াতের দাবি বা এরূপ কিছু মনে করেননি।** তাহলে আব্দুল করিম গংরা কেন সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেন? এটা তাদের অজ্ঞতা কিংবা তাদের অন্তরে লালিত হিংসা-বিদ্বেষের ফলশ্রুতি ও শয়তানী চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।

আব্দুল করিম সিরাজনগরীর কাঠগড়ায়
ইমাম জা’ফর সাদিক (র.) ও বড়পীর দস্তগীর (র.)

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং ভাওতাবাজীর উদ্দেশ্যে সর্বক্ষেত্রেই বড়পীর দস্তগীর (র.) এর নাম ব্যবহার করেন, কিন্তু সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর ব্যাপারে অপপ্রচার চালাতে গিয়ে পরোক্ষভাবে বড়পীর দস্তগীর (র.) এর অনেক আধ্যাত্মিক ব্যাপারেরও কঠোর সমালোচনা করেছেন, যেমন শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী ‘মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা’, (নতুন সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৭৯-৮৬) ‘ইজহারে হক্ব’ (পৃষ্ঠা ৪৪) পুস্তকদ্বয়ে যা লিখেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো, সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর আল্লাহর সাথে আলাপ করা, সাক্ষাত করা ইত্যাদি দাবি করা জঘন্য অপরাধ (নাউযুবিল্লাহ)।

অথচ **হযরত জাফর সাদিক (র.) থেকে বর্ণিত আছে যে, আমরা আল্লাহ তা’আলার বাক্য শ্রবণ করি অথবা আমাদের সাথে তাঁর কথাবার্তা হয়। হযরত বড়পীর (র.) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি আল্লাহর দীদার লাভ করেছেন অর্থাৎ তাঁকে দেখেছেন।**

উল্লেখ্য যে, **সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর আল্লাহকে দেখা ও তাঁর সাথে কথা বলার বিষয়গুলো ছিল স্বপ্নের বর্ণনা। এতে যদি অপরাধ হয়, তবে তথাকথিত সুন্নীরা ইমাম জা’ফর সাদিক (র.) ও হযরত বড়পীর (র.) সম্পর্কে কি সিদ্বান্ত নিবেন?** তারা কি হযরত জাফর সাদিক (র.) ও হযরত বড়পীর (র.) কেও ‘জঘন্য অপরাধে অপরাধী’ বলার দু:সাহস দেখাবেন?

প্রকাশ থাকে যে, মুজাদ্দিদে আলফে সানি (র.) এর মকতুবাত শরীফে ঈমাম জাফির সাদিক (র.) এর উক্তি ও বড়পীর (র.) সম্পর্কিত বর্ণনার ব্যাখ্যা রয়েছে, যা সিরাজনগরীর ভ্রান্ত উক্তির জবাবে যথেষ্ট। মাকতুবাত শরীফ ৩য় খণ্ড, ৫ম ভাগ, ৯২ নং মাকতুবে ফকির হাশিম কাশমীর নিকট তার প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছেন- আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, কোনো আরিফ বলে থাকে **‘আমরা আল্লাহ তা’আলার বাক্য শ্রবণ করি অথবা আমাদের সাথে তাঁর কথাবার্তা হয়’** যেরূপ হযরত ইমাম জাফর সাদিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, ‘আমি পবিত্র কুরআনের আয়াতের পুনরাবৃত্তি করতে থাকি অবশেষে আমি বক্তা হতে তা শ্রবণ করি’ আবার শায়েখ আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর ‘রিসালায়ে গাউসিয়া’ কিতাবের মধ্যেও এই প্রকারের আভাষ আছে; এর অর্থ কি? এবং আপনার নিকট এর সমাধান কি?’’ আল্লাহপাক আপনাকে সরল পথ প্রদর্শন করুক। জানবেন যে, আল্লাহপাকের বাক্য তদ্বীয় জাত ও অবশিষ্ট সিফাতসমূহের মত প্রকারবিহীন। প্রকারবিহীন বাক্য শ্রবণ করাও প্রকারবিহীন হয়ে থাকে। কেননা প্রকারসম্ভূত বস্তুর প্রকারবিহীনের দিকে যাওয়ার পথ নেই। অতএব, উক্ত শ্রবণেন্দ্রীয়, যা সরাসরি প্রকারসম্ভূত, তদ্বারা শ্রবণ নহে। তথায় যদি কোনো দাস তা শ্রবণ করে, তা রূহ বা আত্মার গ্রহণ দ্বারা হয়ে থাকে। যেহেতু আত্মার মধ্যে প্রকারবিহীনতার অংশ আছে এবং এর শ্রবণ বর্ণ ও শব্দের মাধ্যমে শ্রবণ নয়। এরূপ যদি কোনো বান্দা কথা বলে তাও রূহ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হওয়া এবং বর্ণ ও শব্দ রহিত হিসেবে হয়ে থাকে। (মাকতুবাত শরীফ ৩য় খণ্ড, ৫ম ভাগ, ৯২ নং মাকতুব)।

পাঠক লক্ষ্য করুন, এখানে **মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র.) ঈমাম জাফর সাদিক ও আব্দুল কাদির জিলানী (র.) কে দোষী সাব্যস্ত না করে তাদর কথার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং স্বীকার করেছেন যে ওলী আল্লাহগণ কর্তৃক আল্লাহকে দেখা ও তাঁর কথা শুনা অসম্ভব নয়।**

সুতরাং আব্দুল করিম সিরাজনগরীর উচিত শত্রুতা ছেড়ে সততার পথ অবলম্বন করা এবং ওলী-আল্লাহদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো থেকে বিরত থাকা।

সীরাতে মুস্তাকীমের আরেকটি উদ্ধৃতির অপব্যাখ্যা

রেজাখানীরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী সীরাতে মুস্তাকীমের বিভিন্ন বক্তব্য আগ-পিছ কিংবা কাট-ছাট করে উপস্থাপন করে কিংবা ভুল অনুবাদ ও অপব্যাখ্যা করে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে যাচ্ছে। এ বিষয়টি ইতোমধ্যে পাঠকবৃন্দের নিকট সুস্পষ্ট হয়েছে। এ রকম অপব্যাখ্যার আরেকটি নমুনা দেখুন :

সীরাতে মুস্তাকীমের মূল ভাষ্য

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) তার সময়ে প্রচলিত বিদআত ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। বিশেষত তৎসময়ে প্রচলিত বিদআত-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে তার অবস্থান ছিল অত্যন্ত কঠোর। সে সময়ে একটি জঘন্য বেদআত রুসম হিসেবে বিভিন্ন মাজারে পালিত হতো। তা হচ্ছে- নির্দিষ্ট একটি সময়ে মাজারে বাতি জালানো হতো এবং ঐ সময়কে শবে বরাত ও শবে কদরের নূর প্রকাশিত হওয়ার সময়ের মতো দুআ কবূলের সময় মনে করে অপেক্ষা করা হতো। এমনকি বাতি প্রজ্জলিত হওয়ার সাথে সাথে দুআ করা জরুরী মনে করা হতো। যারা এ বিদআতী কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল তাদের বিষয়ে সীরাতে মুস্তাকীমের মধ্যে আছে :

“আর এ সমস্ত (বিদআতী) লোকেরা এ সময়কে (বাতি জ্বালানোর নির্ধারিত সময়কে) শবে বরাত ও শবে কদরের নূর প্রকাশিত হওয়ার সময়ের মতো দুআ কবূলের সময় মনে করে উক্ত সময়ে দুআ করার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। বাতির আলোতে আলোকিত হওয়ার সাথে সাথে দুআ করাকে তারা অত্যন্ত জরুরি মনে করে। হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, ‘চোর ও যিনাকারীর ঈমান চুরি ও যিনার সময় পৃথক হয়ে যায়।’ ঠিক তেমনি এভাবে দুআ করার সময় ঐ সমস্ত লোকের ঈমান অধিক পরিমাণে বরবাদ হয়ে যায়। মুর্খতা ও অজ্ঞতার ওজর না থাকলে তারা পরিস্কার কাফির হয়ে যেত। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞ নয় সে কাফিরই। কেননা শরঈ হারামকে সে ইচ্ছাকৃত উত্তম ইবাদত মনে করে। একে তো হারামকে হালাল জানা কুফরী আর এখানে হারামকে বরং ইবাদত মনে করে।”
(সীরাতে মুস্তাকীম, পৃষ্ঠা ১০৫)

রেজাখানীদের দেয়া উদ্ধৃতি

রেজাখানীরা সীরাতে মুস্তাকীমের উপরোক্ত বক্তব্যের প্রথম অংশ উল্লেখ না করে অভিযোগ করে যে, এতে নাকি কবর যিয়ারতকে অস্বীকার করা হয়েছে। তারা এটাকে বাতিল আকীদা হিসেবেও উল্লেখ করে। সীরাতে মুস্তাকীমের ১০৫ নং পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে তারা যা উল্লেখ করে তা হলো-

“হাদীস শরীফের বর্ণনা চোর ও জিনাকারের ঈমান চুরি ও জিনার সময় পৃথক হয়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে মাজার শরীফে অবস্থান করে দোয়া করার সময় অধিক পরিমাণে ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। অজ্ঞতার ওজর না থাকলে তারা পরিষ্কার কাফের হয়ে যেত। জিয়ারতকারী ব্যক্তি যদি আলেম হয়, দোয়া করার সময় নিঃসন্দেহে কাফির। (নাউজুবিল্লাহ) [ইজহারে হক্ব, পৃষ্ঠা ৪০]

পাঠকগণ বিবেচনা করুন কিরূপ অপব্যাখ্যা করছে রেজাখানীরা। এর চেয়ে বড় মিথ্যাচার আর কি হতে পারে? পাঠকদের জন্য সীরাতে মুস্তাকীমের ১০৫ নং পৃষ্ঠার উর্দু এবারতের অনুলিপি নিম্নে দেয়া হলো।

সীরাতে মুস্তাকীমের ১০৫ নং পৃষ্ঠার উর্দু এবারতের অনুলিপি :

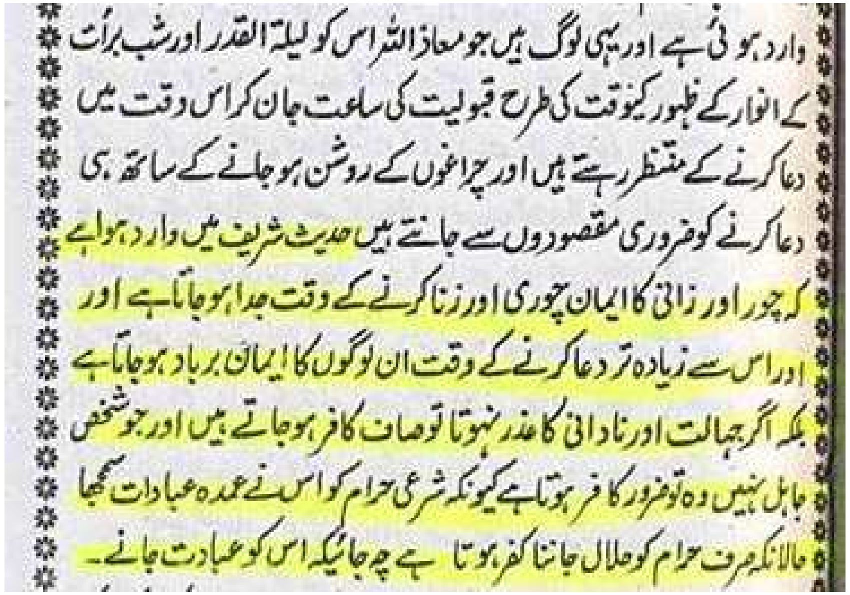

وارد ہوئی ہے اور یہی لوگ ہیں جو معاذ اللہ اس کو لیلۃ القدر اور شب برأت
کے انوار کے ظہور کے وقت کی طرح قبولیت کی ساعت جان کر اس وقت میں
دعا کرنے کے منتظر رہتے ہیں اور چراغوں کے روشن ہو جانے کے ساتھ ہی
دعا کرنے کو ضروری مقصودوں سے جانتے ہیں حدیث شریف میں وارد ہوا ہے
کہ چور اور زانی کا ایمان چوری اور زنا کرنے کے وقت جدا ہو جاتا ہے اور
اور اس سے زیادہ تر دعا کرنے کے وقت ان لوگوں کا ایمان برباد ہو جاتا ہے
بلکہ اگر جہالت اور نادانی کا عذر نہ ہوتا تو صاف کافر ہو جاتے ہیں اور جو شخص
جاہل نہیں وہ تو ضرور کافر ہوتا ہے کیونکہ شرعی حرام کو اس نے عمدہ عبادات سمجھا
حالانکہ صرف حرام کو حلال جاننا کفر ہوتا ہے چہ جائیکہ اس کو عبادت جانے۔

মাকতুবাত ও মালফুযাত এর পার্থক্য

লিখিত গ্রন্থ ও মাকতুবাত তথা লিখিত বক্তব্যের ভাষা লেখকের নিজস্ব। পক্ষান্তরে মালফুযাত তথা মৌখিক বক্তব্য পরবর্তীতে লিখিত হলে এতে সাধারণত: বক্তার ভাষ্য হুবহু থাকে না। মালফুযাত যিনি লিখেন তিনি বক্তার বক্তব্যের বিষয় নিজের ভাষায় লিখে থাকেন। ফলে মালফুজাত ও মাকতুবাত এর মধ্যে ভাষাগত অনেক পার্থক্য থাকে। এটা রেজাখানীরাও সমর্থন করেন। উদাহরণস্বরূপ, মাহবুবে এলাহী হযরত খাজা নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.) এর মালফুজাত ‘ফাওয়াইদুল ফাওয়াইদ’ মীর হাসান মোল্লা সনজরী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাতে নিজাম উদ্দিন (র.) এর একটি উক্তি হল-

ایمان کسے تمام نہ شود تا ہمہ خلق نزد اوایں چنیں نہ نماید کہ پشک شتر (فوائد الفوائد، صفحہ ٦١)

অর্থাৎ কোনো লোকের ঈমান এ সময় পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ তার কাছে (আল্লাহর ইযযতের মুকাবিলায়) অন্য সকল মানুষ উটের গোবরের ন্যায় না হয়। শাহ ইসমাঈল দেহলভী’র ‘তাকবিয়াতুল ঈমান’ এর একটি বক্তব্যের সাথে এ উক্তিটির মিল হয়ে যাওয়ার কারণে রেজাখানীদের ছদরে আফাজিল নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী সাহেব এর জবাব দিতে গিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন, সে বক্তব্য দ্বারা উপরোক্ত বিষয়টি (মালফুযাত ও মাকতুবাতের পার্থক্য) স্পষ্ট হয়ে যায়।

নাঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী সাহেব লিখেছেন-

کہ فوائد الفوائد حضرت محبوب الٰہی کی تصنیف نہیں ہے انکے ملفوظات ہیں جو دوسروں نے مرتب کیے ہیں لہذا بالیقین نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بعینہ انہی کے الفاظ ہیں۔ (اطیب البیان، صفحہ ٦١)

অর্থাৎ ফাওয়াইদুল ফাওয়াইদ হযরত মাহবুবে এলাহীর লিখিত নয় বরং **এটা তার মালফুযাত, যা অন্য কেউ লিখেছেন। এজন্য নিশ্চিত ভাবে এটা বলা যাবে না যে, এটি তার শব্দ।** (আতইয়াবুল বয়ান, পৃষ্ঠা ৬১)

এ বক্তব্যের আলোকে বলা যায় যে, ‘সীরাতে মুস্তাকীম’ সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর লিখিত নয় এবং এতে ব্যবহৃত শব্দসমূহকে নিশ্চিতভাবে তার শব্দ বলা যাবে না। সুতরাং এতে উল্লেখিত শব্দসমূহ নিয়ে তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা অন্যায়।

খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভীর শিক্ষাগত যোগ্যতা

আব্দুল করিম সিরাজনগরী সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে শয়তানী অভিযোগ উত্থাপন করেন। অথচ রেজাখানীদের বিশ্ববরেণ্য বুযুর্গ তৈয়্যব শাহ সাহেবের মুর্শিদ খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী (জন্ম: ১৮৪৩) এর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে ‘মাজমুআহ-এ সালাওয়াতে রাসূল’ এর বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় রয়েছে-**“হুযূর পুরনূর খাজা চৌহরভী প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে মুক্ত ছিলেন।** শুধু কোরআন শরীফ ওস্তাদের কাছে পড়েছিলেন। বাকী প্রচলিত শিক্ষা তথা ইলমে হাদীস, তাফসীর, ফিক্বহ, উসুল, মানতিক ইত্যাদি কোনো কিছুই ওস্তাদের কাছে পড়েননি। শৈশবে অপ্রাপ্ত বয়সেই বুযুর্গ পিতা হযরত খাজা খাদ্বরী সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহির স্থলাভিষিক্ত হয়ে **যামানার গাউসের মহা মর্যাদায় সমাসীন হন**।” (মাজমুআহ-এ সালাওয়াতে রাসূল, আনজুমানে রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া ট্রাস্ট কর্তৃক অনূদিত)

খাজা আব্দুর রহমান চৌহরভী প্রচলিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে যদি ওলায়াতের মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারেন তাহলে সায়্যিদ আহমদ শহীদ আহমদ বেরলভী (র.) এর ক্ষেত্রে বাঁধা কোথায়?

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের জেনে রাখা উচিৎ যে, ওলী আউলিয়াগণ কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয় বরং খোদা প্রদত্ত জ্ঞান বা ইলমে লাদুন্নীর অধিকারী হয়ে থাকেন। যাকে হাদীস শরীফে প্রকৃত উপকারী জ্ঞান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

ইলমে লাদুন্নী বা খোদাপ্রদত্ত জ্ঞান সম্পর্কে রেজাখানীদের উদ্দেশ্যে মাওলানা রূমী রহমতুল্লাহি আলাইহির মসনবী শরীফে উল্লেখিত কয়েকটি পংক্তি উল্লেখ করছি-

رومیاں آں صوفیاند اے پسر
نے ز تکرار کتاب و نے ہنر
রূমীয়া আঁ সুফীয়ান্দ আয় পেসার
নায় যে তাকরারে কিতাবো নায় হুনার।

অর্থ: প্রিয় বৎস! রূমীগণ এমন সূফীদের অন্তর্ভুক্ত, যাদের কিতাব পাঠ ও শিল্প-বিজ্ঞান শেখার প্রয়োজন নাই।

لیک صیقل کردہ اند آں سینا

پاک ز آز و حرص و بخل و کینہ ہا

লেকে ছায়কাল করদা আন্দ আঁ সীনা
পাক যে আযও হিরছো বোখলো কীনাহা।

অর্থ: কিন্তু তারা নিজেদের বক্ষকে পরিশুদ্ধ করে নিয়েছে, লোভ-লালসা, কৃপণতা ও হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র থেকেছে।

آں صفا آئینہ وصف دل است

صورت بے منتہا را قابل است

আঁ ছাফায়ে আঈনা ওয়াছফে দিলাস্ত
সূরতে বেমুনতাহা রা কাবিলাস্ত।

অর্থ: অতঃপর তাদের দিল ঐ আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন হওয়া তাদের অন্তরের বৈশিষ্ট্য হয়ে যায়, ফলে তারা অনন্ত জ্ঞান হাছিলের যোগ্য হয়ে যায়।

عکس ہر نقشے نتابد تا ابد

جز ز دل ہم با عدد ہم بے عدد

আকসে হার নকশে নাতাবাদ তা আবাদ
জুয যে দিল হাম বা আদদ হাম বে আদদ।

অর্থ: অন্তর ব্যতীত এমন কিছুই নাই যাতে নকল বিষয়ের নকশা অঙ্কন করা যায়, আর ঐ চিত্র গণনাযোগ্য হোক আর না হোক।

اہل صیقل رستہ اند از بو و رنگ

ہر دمے بینند خوبی بے درنگ

আহলে ছায়কাল রাস্তাআন্দ আয বূ ও রাঙ্গ
হার দামে বীনান্দ খুবী বে দারাঙ্গ।

অর্থ: যাদের অন্তর পরিস্কার তারা মেহনত করে ইলম হাছিল করা থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, তারা সর্বদা প্রশংসনীয় ইলম বিনা দ্বিধায় প্রত্যক্ষ করেন।

সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) সম্পর্কে আহমদ রেজা খানের ফতওয়া

সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কে বুযুর্গ মনে করলে ওহাবী হবে না

আহমদ রেজা খান সাহেব ফতওয়ায়ে রেজভীয়ার ২৯ নং খণ্ডের ২২ নং পৃষ্ঠার ৯১ নং ফতওয়ায় কয়েকটি প্রশ্ন ও তার জবাব প্রদান করেছেন, তন্মধ্যে একটি প্রশ্ন হলোঃ

سید احمد رائے بریلوی کو نیک بزرگ بلکہ ولی جانتا ہے۔ پس کیا فرماتے ہیں علمائے دین

ایسے شخص کے حق میں کہ ان کا اصل مذہب کیا ہے؟

অর্থ: সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কে নেক বুযুর্গ এমনকি ওলী মনে করলে উলামায়ে দ্বীন ঐ সকল লোককে কী বলবে? তাদের আসল মাযহাব কী? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি লিখেছেন,

سید احمد کو صرف بزرگ جاننے سے وہابی نہ ہو گا

অর্থ: "কেবল সায়্যিদ আহমদকে বুযুর্গ মনে করলে ওহাবী হবে না।"

তরীকতের মহান ইমাম, আমীরুল মু'মিনীন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) রেজাখান সাহেব বা অন্য কারো ফতওয়ার মুখাপেক্ষী নন। এ উপমহাদেশের লাখো কোটি মু'মিন তার রূহানী সন্তান। তবে আহমদ রেজা খান সাহেবের এ ফতওয়া তার অনুসারীদের জেনে রাখা উচিত। রেজাখান সাহেবের উত্তরসূরী দাবীদার সিরাজনগরী সাহেব তার ইমামের এ ফতওয়ার ব্যাপারে কী বলেন?

বিস্তারিত ফতওয়া

মাসআলা ৯০-৯১ : গ্রাম- শীশগড়, ডাক- খাস বেরেলী থেকে সায়্যিদ মুহাম্মদ সাজ্জাদ ছাহেব, ২৯ মহরম, ১৩৩৭ হিজরী।

(১) যায়েদ নিজেকে সিদ্দিকী ওয়ারিসী দাবী করা সত্ত্বেও ইসমাঈল দেহলভীকে "হযরত মাওলানা মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি" লিখেন।

(২) বকর নিজেকে চিশতী হায়দারাবাদী বলে থাকেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত বিশ্বাস রাখেন : যে সকল মুসলমান হযরত পীর জনাব শায়খ মুহি

উদ্দিন জিলানী (র.) এর এগার শরীফ নির্ধারিত করে তার রূহের উপর সওয়াব পৌঁছান- এ সম্পর্কে বলে থাকে যে, এগার তারিখ নির্ধারিত করা দোষণীয়। রজব মাস সম্পর্কে লেখেন- "ঐ মাসে নফল নামায, রোযা ও ইবাদত সম্পর্কিত বেশি বেশি সওয়াবের যে অনেক বর্ণনা রয়েছে তার কোনটি সহীহ নয়। হযরত নূহ (আ.) এর কিশতি তৈরীর নির্দেশ রজব মাসে দেয়া হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভুল ও সনদবিহীন। শা'বান মাসে মিষ্টি দ্রব্য পাক করা, ১৩ তারিখে আরাফা পালন করা, ঈদের দিনে খাদ্য বিতরণ নিষিদ্ধ। মহররম মাসে বিশেষ করে খিচুড়ী বা শরবত পাক করা, পান করানো এবং ইমামগণের নামে নিয়ায প্রদান, দান-খয়রাত করা খুবই মন্দ বিদআত। সফর মাসে বিশেষ কোনো সওয়াব বা বরকতের খেয়াল রাখা মূর্খতা। **আর সায়্যিদ আহমদ রায় বেরলভীকে নেক বুযুর্গ এমনকি ওলী মনে করে। তাহলে উলামায়ে দ্বীন ঐ সকল লোক সম্পর্কে কি বলবেন?** তাদের আসল মাযহাব কি? এবং উপরোক্ত বিষয়সমূহের বাস্তবতা বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

উত্তর : (১) উপরোক্ত ক্ষেত্রে যায়েদ গোমরাহ, বদদীন, নজদী ও ইসমাঈলী। ফুকাহায়ে কিরামের হুকুম অনুযায়ী তার উপর কুফরীর হুকুম প্রয়োগ আবশ্যক। যার বিস্তারিত বর্ণনা 'আল কাওকাবাতুশ শিহাবিয়্যাহ' থেকে প্রকাশ পায়। আল্লাহই অধিক জ্ঞাত।

(২) বকরকে চালাক ওহাবী বলে মনে হয়। এগার শরীফকে নিন্দনীয়, শা'বানের হালওয়া, ১৩ তারিখের আরাফা, ঈদের দিনের খাবারকে নিঃশর্ত নিষিদ্ধ বলা, মহররম শরীফের খিচুড়ী, আয়িম্মায়ে আতহার এর উদ্দেশ্যে শরবত আল্লাহর ওয়াস্তে প্রদানকে নিঃশর্ত মন্দ বিদআত বলা ওহাবীদের লক্ষণ। আর ওহাবীরা গুমরাহ। বদদীন ওহাবী কর্তৃক রজব মাসের আমল সম্পর্কিত হাদীসকে "সহীহ" না বলা বড়ই চালাকীর বিষয়। এক্ষেত্রে মুহাদ্দিসীনের পরিভাষাগত সহীহ হাদীসের প্রয়োজন নেই। আমলের ফযীলতের ক্ষেত্রে সর্বসম্মতিতে 'যঈফ' হাদীস গ্রহণযোগ্য। রজব মাসে কিশতি তৈরীর নির্দেশ আসেনি তবে রজব মাসে কিশতি চালু হয়, শত্রুদের উপর শাস্তি এবং নেক বান্দাদের উপর (আমি নূহকে আরোহন করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত নৌযানে, যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা ছিল তার পক্ষ হতে প্রতিদান যার প্রতি কুফরী করা হয়েছিল) আয়াতে বর্ণিত অনুগ্রহ এ মাসেই প্রকাশ পায়।

এটি আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য থেকে বর্ণিত হাদীস

দ্বারা প্রমাণিত। সফর মাস, আশুরার সুরমা সম্পর্কিত তার বক্তব্য খণ্ডন করা যাবে না যদিও দ্বিতীয়টি সম্পর্কে অনেক মতবিরোধ রয়েছে। যদি সীরাতে মুস্তাকিম-এর বাতিল কথাকে বাতিল, কুফরিকে কুফরি, ইসমাঈল দেহলভীকে গুমরাহ ও বদদীন মনে করে, ওহাবিয়াত থেকে আলাদা থাকে, **তবে কেবল সায়্যিদ আহমদকে বুযুর্গ মনে করলে ওহাবী হবে না।** অন্যথায় আমি বুদ্ধিমানের জন্য নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করলাম। যেমনিভাবে আমার রব আমাদেরকে হেদায়ত করেছেন। তাদের কথাবার্তা থেকে আল্লাহ উচ্চ ও মহান। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ, জিলদ-২৯, মুদ্রণকালঃ সফর, ১৪১৫ হিজরী, প্রকাশকঃ রেজা একাডেমী, বোম্বাই-৩)

উক্ত ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, ফতওয়ায় বর্ণিত শর্তসমূহ মানার শর্তে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-কে কেউ ওলী মনে করলে ওহাবী হবেনা। যেহেতু সকল রেজাখানী বর্ণিত শর্তসমূহ মেনে চলেন সেহেতু সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.)-কে ওলী মানতে তাদের বাধা কোথায়? আবার রেজাখানীদের মধ্যে যারা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-কে ওলী মনে করে থাকেন তাদের ওহাবী মনে করে রেজা খানের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে শয়তানী ফিৎনা ফাসাদে লিপ্ত হবার সুযোগটা কোথায়?

মিথ্যা কুফরী ফতওয়া প্রদানের পরিণতি

রেজাখানীরা কথায় কথায় কুফরী ফতওয়া প্রদান করে। অথচ এর পরিণতি অত্যন্ত খারাপ। হাদীস শরীফে আছে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ. وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ

অনুবাদ : যে কোনো লোককে কাফির বলবে, কিংবা আল্লাহর শত্রু বলে সম্বোধন করবে অথচ সে এরূপ নয়, তাহলে তা সম্বোধনকারীর দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। (মুসলিম শরীফ)

এ হাদীসের আলোকে শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের কুফরী ফতওয়া তাদের নিজেদেরই উপরেই পতিত হয়েছে।

আহমদ রেজাখান সাহেবের ফতওয়া তার নিজের উপর পতিত হয়েছে

মুফতী মাহমুদুল হাসান সাহেব তার লিখিত 'মালফুযাতে ফাক্বীহুল উম্মত' কিতাবে ৭নং হিসসায় 'মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া তার

নিজের উপর পতিত হয়েছে’ শিরোনামে যা লিখেছেন তা নিম্নরূপ-

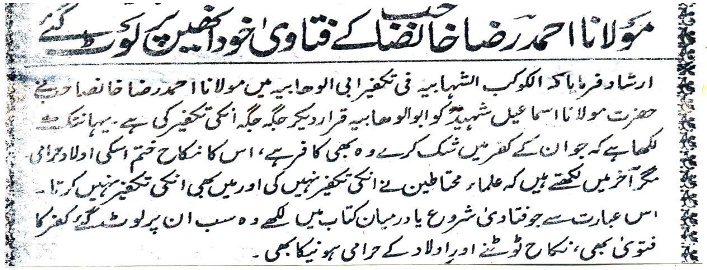

مولانا احمد رضا خانصاحب کے فتاوی خود انہیں پر لوٹ گئے

ارشاد فرمایا کہ الکوکب الشہابیہ فی تکفیر ابی الوھابیہ میں مولانا احمد رضا خانصاحب نے حضرت مولانا اسماعیل شہیدؒ کو ابوالوھابیہ قرار دیکر جگہ جگہ انکی تکفیر کی ہے۔ یہانتک لکھا ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے، اس کا نکاح ختم اسکی اولاد حرامی مگر آخر میں لکھتے ہیں کہ علماء محتاطین نے انکی تکفیر نہیں کی اور میں بھی انکی تکفیر نہیں کرتا۔ اس عبارت سے جو فتاوی شروع یا درمیان کتاب میں لکھے وہ سب ان پر لوٹ گئے کفر کا فتوی بھی، نکاح ٹوٹنے اور اولاد کے حرامی ہونیکا بھی۔

“মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া তার নিজের উপর পতিত হয়েছে

কাউকাবাতুস শিহাবিয়্যাহ কিতাবে মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব মাওলানা ইসমাঈল শহীদ সাহেবকে আবূল ওয়াহ্হাবিয়্যাহ (ওহাবীদের পিতা) আখ্যায়িত করতঃ স্থানে স্থানে তার উপর কুফরী ফতওয়া দিয়েছেন। তার কুফরীর ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করলে সেও কাফির হয়ে যাবে বলেছেন। এমনকি তার বিবাহ ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং তার সন্তান জারজ হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত লিখেছেন সচেতন আলিমগণ তার উপর কুফরীর ফতওয়া প্রদান করেননি এবং আমিও তাকে কাফির ফতওয়া দেইনি। এখানে (প্রথম) ইবারতের মাধ্যমে যে ফতওয়া আরম্ভ করেছিলেন মধ্যখানে এসে এ কথা বলার কারণে সমস্ত ফতওয়া তার উপরই পতিত হয়েছে, অর্থাৎ কাফির হওয়া, বিবাহ ভঙ্গ হওয়া, সন্তান জারজ হওয়া।” (মাকালাতে ফক্বীহুল উম্মত, পৃষ্ঠা ৫০)

ইসমাঈল দেহলভীকে কাফির না বলার ব্যাপারে আহমদ রেজা খান অন্য একটি ফতওয়া এভাবে দিয়েছেন-

علماء محطاطین انہیں کافر نہ کہیں۔ یہیں صواب ہے۔ وھو الجواب وبہ یفتی وھو المذھب وعلیہ الاعتماد

(سبحان السبوح، احمد رضا خان بریلوی، صفحہ ۹۰)

অনুবাদঃ সতর্ক উলামায়ে কিরাম এদেরকে কাফির বলেননি এটাই সঠিক, এটাই উত্তর, এর উপরই ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে। এটিই প্রকৃত মত এবং এটিই নির্ভরযোগ্য কথা। (সুবহানাস সুবুহ, পৃষ্ঠা ৯০)

অথচ পূর্বোক্ত আলোচনায় এসেছে যে, তিনি বলেছেন, তার (ইসমাইল দেহলভী’র) কুফরীর ব্যাপারে কেউ সন্দেহ করলে সে কাফির হয়ে যাবে। সুতরাং তার নিজের বক্তব্য থেকে তার উপর কি ফতওয়া আসে তা সচেতন পাঠকগণই বিবেচনা করবেন।

মুস্তফা হামিদী সাহেবের বক্তব্যের জবাবে
আবিদ শাহ’র হুশিয়ারী

শর্ষিনা দরবার শরীফের মুখপাত্র, বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় আলিম আল্লামা মুফতী মুস্তফা হামিদী এর জবাবে আব্দুল করিম সিরাজনগরীর পীর আবিদ শাহ ‘মুস্তফা হামিদী সাবধান’ শিরোনামে লিফলেট প্রচার করেছিলেন। লিফলেটটি নিম্নরূপ :

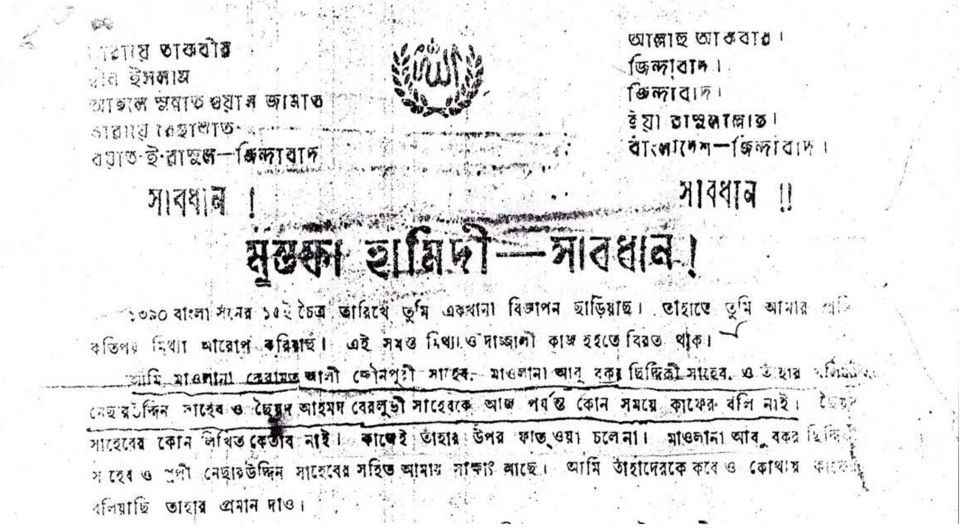

নারায় তাকবীর — আল্লাহু আকবার।
দীন ইসলাম — জিন্দাবাদ।
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত — জিন্দাবাদ।
নারায়ে রেছালাত — ইয়া রাছুলাল্লাহ।
বয়াত-ই-রাছুল—জিন্দাবাদ — বাংলাদেশ—জিন্দাবাদ।

সাবধান ! সাবধান !!

মুস্তফা হামিদী—সাবধান !

১৩৯০ বাংলা সনের ১৫ই চৈত্র তারিখে তুমি একখানা বিজ্ঞাপন ছাড়িয়াছ। তাহাতে তুমি আমার প্রতি কতিপয় মিথ্যা আরোপ করিয়াছ। এই সমস্ত মিথ্যা ও দাজ্জালী কাজ হইতে বিরত থাক।

আমি মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী সাহেব, মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিকী সাহেব, ও তাহার খলিফা নেছারউদ্দিন সাহেব ও ছৈয়দ আহমদ বেরলুভী সাহেবকে আজ পর্যন্ত কোন সময়ে কাফের বলি নাই। ছৈয়দ সাহেবের কোন লিখিত কেতাব নাই। কাজেই তাঁহার উপর ফাত্ওয়া চলেনা। মাওলানা আবু বকর ছিদ্দিকী সাহেব ও সুফী নেছারউদ্দিন সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ আছে। আমি তাঁহাদেরকে কবে ও কোথায় কাফের বলিয়াছি তাহার প্রমান দাও।

এতে তিনি লিখেছেন- “১৩৯০ বাংলা সনের ১৫ ই চৈত্র তারিখে তুমি একখানা বিজ্ঞাপন ছাড়িয়াছ। তাহাতে তুমি আমার প্রতি কতিপয় মিথ্যা আরোপ করিয়াছ। এই সমস্ত মিথ্যা ও দাজ্জালী কাজ হইতে বিরত থাক। আমি মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী সাহেব, মাওলানা আবূ বকর ছিদ্দিকী সাহেব ও তাহার খলিফা নেছার উদ্দিন সাহেব ও ছৈয়দ আহমদ বেরলুভী সাহেবকে আজ পর্যন্ত কোন সময়ে কাফির বলি নাই। ছৈয়দ সাহেবের লিখিত কোন কিতাব নাই। কাজেই তাহার উপর ফতওয়া চলেনা। মাওলানা আবূ বকর ছিদ্দিক সাহেব ও সূফী নেছারউদ্দিন সাহেবের সহিত আমার সাক্ষাৎ আছে। আমি তাহাদেরকে কবে ও কোথায় কাফের বলিয়াছি তাহার প্রমাণ দাও।”

আবিদ শাহ সাহেবের লিফলেট থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো প্রমাণিত হয় :

১. হাদিয়ে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) সহ জৌনপুরী, ফুরফুরাবী কোনো বুযুর্গের বিরুদ্ধে তিনি কুফূরী ফতওয়া প্রদান করেননি।

২. সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর লিখিত কোনো কিতাব নেই।

লিফটের সারকথা হলো, আবিদ শাহ সাহেব হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.), মুজাদ্দিদে যামান হযরত হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী (র.), শাহ মাওলানা নেছারুদ্দীন (র.) ও সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) কে কাফির মনে করতেন না। কিন্তু বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, আব্দুল করিম সিরাজনগরী নিজেকে আবিদ শাহ সাহেবের মুরীদ দাবি করেন অথচ তিনি উপরোক্ত বুযুর্গদেরকে কাফির বানানোর প্রাণান্তকর প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছেন।

রেজাখানীদের মতো পথভ্রষ্টদের প্রতি রাসূলে পাক (সা.) এর সতর্ক বাণী

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তিকে ইলম ব্যতিত (না জেনে) ফতওয়া দেয়া হয়েছে আর সে তদানুযায়ী আমল করেছে, এর গুনাহ ফতওয়া প্রদানকারীর উপরই বর্তাবে এবং যে ব্যক্তি তার ভাইকে (কোনো মুসলমানকে) এমন পরামর্শ দিয়েছে যে, সে ভালোভাবে জানে, কল্যাণ এর অপর দিকেই, তবে সে তার ভাইয়ের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। (আবূ দাঊদ)

অন্য হাদীসে আছে, হযরত মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী কথা বলতে বা বিভ্রান্তিকর গুজব ছড়াতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাঊদ)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ সতর্কবাণী দুটি পথভ্রষ্ট রেজাখানীদের জেনে রাখা উচিত।

রেজাখানীরা ওলী-আল্লাহগণের ভুল-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। তাদের প্রসঙ্গে মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহির নিম্নবর্ণিত পংক্তিমালা প্রণিধানযোগ্য।

حرف درویشاں بدوزدیدہ بسے

تا گما آید کہ ہست او خود کسے

হরফে দরবেশাঁ বদযদীদাহ বছে
তা গুমা আইয়াদ কে হাস্ত উ খূদ কাসে।

অনুবাদঃ সে বুযুর্গানে দ্বীনের অনেক বাণী চুরি করে নিয়েছে, যাতে সাধারণ মানুষ মনে করে সে অনেক বড় বুযুর্গ।

خردہ گیرد در سخن بر بایزید

ننگ دارد از دریدن او یزید

খরদা গিরাদ দর সুখুন বর বায়েযীদ
নঙ্গে দারাদ আয দারীদন উ ইয়াযীদ।

অনুবাদ : স্বীয় খ্যাতি বর্ধিত করার মানসে সে বায়েযীদ বোস্তামীর মত ওলীদেরও ভুল-ত্রুটি খুঁজে বেড়ায়। তার অন্তর দর্শনে ইয়াযীদের মত অন্তরও লজ্জিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর ভুল ধরার অপচেষ্টা

রেজাখানীরা শুধু সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) কিংবা সমকালীন বুযুর্গদের সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না বরং তারা পূর্ববর্তী আরো অনেক বুযুর্গানে কিরামের ত্রুটি অন্বেষণ ও তাদের প্রতি মানুষকে বিদ্বিষ্ট করতে অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এমন সকল বুযুর্গের উপর অভিযোগ বা অপবাদ আরোপ করছে যাদের দ্বারা এ উপমহাদেশে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষা, তরীকা-তাসাউফ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এদের একজন হলেন হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)। রেজাখানীরা এ মহান বুযুর্গকে তাদের পাল্লায় তুলে মাপতে চেষ্টা করেছে।

রেজাখানীরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর ত্রুটি অন্বেষণ করে তাকে খাটো ও তাদের আলা হযরতকে 'মহান' বানানোর চেষ্টা করেছে। এ বিষয়টি আলোচনার পূর্বে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করছি, যাতে তরীকা-তাসাউফ ও ইলমে দীনের খিদমতে তার অবদান সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা যায়।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) (১১১৪-১১৭৬ হি:) ছিলেন উপমহাদের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও বুযুর্গ। তিনি হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর পিতা, মুরশিদ ও উস্তাদ ছিলেন। উলামায়ে কিরামের নিকট তাকে নতুন করে পরিচয় করে দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি ফিকহ, তাফসীর, উসূল, হাদীস, আকাঈদ, তাসাউফ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক মহামূল্যবান কিতাব রচনা করেছেন। তার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে–

- **ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء**
- **الطاف القدس (فارسى)**
- **انفاس العارفين (فارسى)**
- **تراجم ابواب بخارى**
- **التفهيمات الالهية**
- **حجة الله البالغة**
- **حسن العقيدة**
- **الدر الثمين**
- **فيوض الحرمين**
- **الفوز الكبير**

সায়্যিদ আবূল হাসান আলী নদভী তার ৫৩টি কিতাবের তালিকা দিয়েছেন 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত' কিতাবে। এই কিতাবগুলোর মধ্য থেকে তিনখানা কিতাব সরকারি-বেসরকারি মাদ্রাসায় সিলেবাসভুক্ত আছে। এই কিতাবগুলো হচ্ছে-

- **الفوز الكبير**
- **حجة الله البالغة**
- **تراجم ابواب بخارى**

তিনিই সর্বপ্রথম ফার্সী ভাষায় কুরআন শরীফের তরজমা লিখেছেন। তাছাড়া তরজমার মূলনীতি বিষয়েও একখানা কিতাব লিখেছেন। যার নাম **مقدمة قوانين ترجمة** তাফসীরের মূলনীতি বিষয়ক তার রচিত কিতাব **الفوز الكبير** শত শত বৎসর যাবৎ সরকারি-বেসরকারি মাদ্রাসায় পাঠ দানে ব্যবহার হচ্ছে। তার রচিত কুরআন শরীফের তরজমাকে অনুসরণ করেই পরবর্তীতে ভারত উপমহাদেশে কুরআনের তরজমাগুলো সংকলিত হয়েছে এবং শুরু থেকে অদ্যাবধি পাক ভারতের সকল মুহাক্কিক উলামায়ে কিরামের নিকট তার কৃত কুরআন শরীফের

তরজমাটি গ্রহণীয় হয়ে আছে। কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, সাম্প্রতিককালে কতিপয় সুন্নী নামধারী রেজাখানী কিছু আলিম তার তরজমাকে ভুল প্রমাণ করার অপপ্রয়াসে লিপ্ত।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর যথোপযুক্ত পরিচয় প্রদানের যোগ্যতা আমাদের নেই। তিনি নিজে তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

سلکنی رسول الله صلی الله علیه وسلم وربانی بیده فانا اویسیة وتلمیذه بلا واسطة بینه وبینی– (**فیوض الحرمین ، ص ٤٤**)

অর্থ: **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বয়ং আমাকে তরীকতের পথ অতিক্রম করিয়েছেন। তিনি নিজ হাতে আমাকে লালন-পালন করেছেন। সুতরাং আমি ওয়াইসী, আমার ও তাঁর মধ্যে কোনো ধরনের মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তাঁর ছাত্র।** (ফুয়ুযুল হারামাইন)

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর লেখনীর বিষয়ে তার ছাহেবজাদা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) বলেন-

بعد مراقبہ ہرچہ بکشف می رسیدی نگاشتند (ملفوظات، صفحہ ۱۵۴۰)

অর্থাৎ মোরাকাবার পর কাশ্‌ফের মাধ্যমে যা তিনি লাভ করতেন তা লিখে রাখতেন। (মালফুযাত, পৃষ্ঠা ১৫৪০)

স্বপ্নযোগে ইমাম হাসান ও হোসাইন (রা.) এর নিকট থেকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কলম ও চাদর মোবারক লাভ করেছিলেন। এ কারণে তার লেখা-লেখির ক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। এ স্বপ্নের ঘটনাটি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) নিজেই 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' কিতাবের ভূমিকায় এবং 'আদ দুররুস সামীন' ও 'ফুয়ুযুল হারমাইন' কিতাবে লিখেছেন। তার ভাষায়– "ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমার ঘরে তাশরীফ নিয়ে এলেন। ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হাতে একটি কলম ছিল যার অগ্রভাগ ছিল ভাঙা। হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কলমটি আমাকে দান করার জন্য হাত বাড়ালেন এবং বললেন এই কলমটি আমার নানাজান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। তিনি আরো বললেন এটা হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মেরামত করে দেবেন। কারণ দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর মতো এটা মেরামত করতে পারবেন না। অতপর হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কলমটি হাতে নিয়ে ঠিক করে

দিলেন। আমি এই দান প্রাপ্তিতে অতি আনন্দিত হলাম। অতপর আমাকে ঝালর বিশিষ্ট একটি চাদরও দান করা হলো ... প্রথমত: চাদরটি ইমামদ্বয়ের সামনে রাখা হলো। ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু চাদরটি তুলে নিয়ে বললেন, এ চাদরটি আমার নানাজান রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর। চাদরটি আমাকে (শাহ ওয়ালিউল্লাহকে) পরিয়ে দেয়া হলো। আমি সম্মান করত: চাদরখানা মাথায় রেখে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।" (আদ দুররুস সামীন)

উক্ত স্বপ্ন বর্ণনা করার পর শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) 'আদ দুররুস সামীন কিতাবে লিখেছেন-

فمن یومئذ انشرح صدری فی تصنیف العلوم الشرعیة (**صفحة٢٠**)

অর্থ: আর সে দিন থেকেই শরঈ জ্ঞান বিষয়ক রচনার কাজে আমার বক্ষ উম্মুক্ত হয়ে যায়। (আদ দুররুম সামীন, পৃষ্ঠা ২০)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) কোন মাপের বুযুর্গ ছিলেন এ সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে পাঠকবৃন্দ কিছুটা অনুমান করতে পারবেন। তার পূর্ণ পরিচিতি এখানে তুলে ধরা সম্ভব নয়। এ পর্যায়ে আমরা তার ভুল ধরতে রেজাখানীদের অপচেষ্টার কিছু নমুনা উপস্থাপন করছি।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর অনুবাদকে ভুল প্রমাণ করতে রেজাখানীদের অপচেষ্টা

আহমদ রেজাখান সাহেব কৃত 'কানযুল ঈমান' এর বাংলা অনুবাদক আব্দুল মান্নান আহমদ রেজা খান সাহেবের অনুবাদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের লক্ষে অনুবাদ গ্রন্থের ভূমিকায় "কানযুল ঈমান শ্রেষ্ঠ কেন" শিরোনামে এক দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন। এতে শাহ আব্দুল কাদির (র.), শাহ রফী উদ্দীন (র.), শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) প্রমূখ কৃত কুরআন কারীমের কয়েকটি আয়াতের অনুবাদের পাশাপাশি আহমদ রেজা খান সাহেবের অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে। পাশাপাশি আরো কয়েকজন অনুবাদকের অনুবাদও উল্লেখ করা হয়েছে। এতে তাদের (রেজাখানীদের) চিন্তাধারা অনুযায়ী কয়েকটি আয়াত ও শব্দের বিশ্লেষণ করে যে বক্তব্য দেয়া হয়েছে তা হুবহু নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

''অনুবাদকদের মধ্যে শাহ আব্দুল কাদের, শাহ রফী' উদ্দীন, **শাহ ওয়ালিউল্লাহ** (ফার্সী অনুবাদক), আব্দুল মাজেদ দরিয়াবাদী, ডিপুটী নযীর আহমদ, মৌলভী

আশরাফ আলী থানভী, মির্যা হায়ারাত দেহলভী, মিঃ মওদুদী, মুফতী মুহাম্মদ শফী, গিরীশ চন্দ্র সেন প্রমুখ তাঁদের অনুবাদে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয়াদির প্রতি গুরুত্ব দেননি। কেন দেননি তার কারণও অস্পষ্ট। **কিন্তু আ'লা হযরত শাহ মুহাম্মদ আহমদ রেজা খান বেরলভী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু** ঐসব বিষয়ের প্রতি অতি গুরুত্বারোপ করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা ও নবী করীম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলায়হি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভক্তি, আদব বা শালীনতা বজায় রাখাকে জীবনের মহান উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছেন। ফলতঃ তিনি বিশ্ববাসীদের সামনে এমন এক অনুবাদ (কানযুল ঈমান) পেশ করতে সক্ষম হন, যার মধ্যে আদব-শালীনতা, লক্ষ্যস্থিরতা, অনুবাদের যর্থাথতা, বিন্যাস-সজ্জা ও বর্ণনার সৌন্দর্য ইত্যাদি পূর্ণাঙ্গভাবে উপস্থিত।'' (কানযুল ঈমানের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৩৫)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে যে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় তা হলো-

১. **শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রতি ভক্তি, আদব ও শালীনতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন।**

২. **গিরিশ চন্দ্র সেন ও শাহ ছাহেবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।**

৩. **অনুবাদের যথার্থতা, বর্ণনা বিন্যাস এসবের যোগ্যতা আহমদ রেজা খান ছাড়া অন্য কারো মধ্যে নেই।**

কানযুল ঈমানের অনুবাদকের বক্তব্যের সাথে নাসির উদ্দীন আলবানীর বক্তব্যের সাদৃশ্য

উপরোক্ত কথাগুলো লা-মাযহাবী সালাফী নাসির উদ্দীন আলবানীর বক্তব্যের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নাসির উদ্দীন আলবানী হানাফী মাযহাবের নামাযকে ভুল সাব্যস্ত করতঃ বিশুদ্ধ নামাযের বর্ণনা দিতে গিয়ে যে বক্তব্য দিয়েছেন এ বক্তব্য তারই অনুরূপ। নাসির উদ্দীন আলবানীর বক্তব্য হলো- "আমি যেহেতু এ বিষয়ে (নামায বিষয়ে) পরিপূর্ণ কোনো কিতাবের সন্ধান পাইনি, তাই আমি ইবাদতের ক্ষেত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পথ অনুসরণে আগ্রহী মুসলিম ভাইদের জন্য এমন একটি কিতাব লেখা নিজের ওপর অনিবার্য মনে করলাম, যে কিতাবে তাকবীর থেকে সালাম পর্যন্ত যথাসম্ভব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সালাতের পূর্ণ বিবরণ সন্নিবেশিত হবে। যাতে করে সত্যিকারার্থে যারা নবীপ্রেমিক তাদের যে কেউ এ কিতাবখানা পেলে সহজেই পূর্বোক্ত

হাদীসের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে পারে।" (সিফাতু সালাতিন নাবিয়্যি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিনাত তাকবীর ইলাত তাসলীম কাআন্নাকা তারাহা)

এখানে লা-মাযহাবী আলবানী দাবি করেছেন যে, তিনি ছাড়া আর কেউ নামাযের সঠিক পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারেননি। ঠিক তদ্রূপ রেজাখানীরা দাবি করলো যে, আহমদ রেজা খান ছাড়া আর কেউ কুরআনের সঠিক অনুবাদ করতে পারেননি।

এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, কানযুল ঈমান এর বঙ্গানুবাদ করেছেন জনাব আব্দুল মান্নান, ভূমিকাও লিখেছেন তিনি। তার এ অনুবাদের ভূমিকার দায় কী সমস্ত রেজাখানির উপর বর্তায় ?

এর উত্তর হলো, আব্দুল মান্নানের ভূমিকা ও অনুবাদটির দায় সমস্ত রেজাখানীর উপরই বর্তায়। কেননা রেজাখানী মসলকের প্রখ্যাত ও অখ্যাত সকল শীর্ষস্থানীয় আলিম-উলামা তার অনুবাদ ও ভূমিকার প্রশংসা করে অভিমত দিয়েছেন, যা উক্ত বঙ্গানুবাদের প্রথম দিকে সংযোজিত রয়েছে। যারা অভিমত ব্যক্ত করেছেন তাদের মধ্যে অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল ও শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীও রয়েছেন। (দেখুন : কানযুল ঈমান এর ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২-৭)

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, রেজাখানীরা জ্ঞানের অভাবে অথবা জেনে শুনে মানুষকে প্রতারিত করা এবং আহমদ রেজা খান সাহেবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে ইমামুল হিন্দ, **হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) কৃত কুরআনের তরজমাকে ভুল আখ্যায়িত করার দুঃসাহস দেখিয়েছে, যিনি আহমদ রেজা খান সাহেবের জন্মেরও প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে ভারত উপমহাদেশকে ইলমে শরীআত ও ইলমে মা'রিফত দ্বারা আলোকিত করেছিলেন**। রেজাখানীরা যাকে মুজাদ্দিদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, সেই শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) হচ্ছেন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর সন্তান, ছাত্র ও মুরীদ। আর আহমদ রেজা খান সাহেবের পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদ আলে রাসূল মারেহারাভী ও তার ভাতিজা শাহ আচ্ছে মিয়া আলে আহমদ সাহেবও শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেছেন। আচ্ছে মিয়া তার 'আনোয়ারুল আরিফীন' কিতাবে লিখেছেন-

سند حدیث شریف از مولانا عبد العزیز گرفته اند

অর্থাৎ মাওলানা আব্দুল আযীয (র.) এর কাছ থেকে আমি হাদীস শরীফের সনদ লাভ করেছি। (আনোয়ারুল আরিফীন, শাহ আচ্ছে মিয়া আলে আহমদ মারেহারাভী)

একটি হাস্যকর ব্যপার

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহমদ রেজা খান সাহেবের কানযুল ঈমান এর বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় “কানযুল ইমান শ্রেষ্ঠ কেন?” শিরোনামে দীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এতে কানযুল ঈমানের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান দিক হলো বিভিন্ন অনুবাদের তুলনামূলক পর্যালোচনা। শুরুতে **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ** এর অনুবাদ পর্যালোচনা করে যা বলা হয়েছে তা তাদের অন্যান্য উলামায়ে কিরামের অনুবাদের সাথে মিলালে হাস্যকর হয়ে পড়ে। নিম্নে নমুনাস্বরূপ উক্ত ভূমিকা থেকে কয়েকটি অনুবাদ তুলে ধরা হল:

شروع کرتا ہو اللہ کے نام سے جو رحم والا ہیں ۔(شاہ عبد القادر)

-আরম্ভ আল্লাহর নামে, যিনি মহান দয়ালু, অতীব করুণাময়। -[শাহ আব্দুল কাদের]

شروع کرتا ہو میں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے کے نام سے ۔(شاہ رفیع الدین)

-আরম্ভ করছি আমি নাম সহকারে আল্লাহ দাতা, দয়ালুর -[শাহ রফী’ উদ্দীন]

شروع اللہ نہایت رحم والے بار بار رحم کرنے والے کے نام سے۔(عبد الماجد دریا آبادی دیوبندی)

-আরম্ভ আল্লাহ, অত্যন্ত দয়ালু, বারংবার দয়াকারীর নামে -[আব্দুল মাজেদ দরিয়াআবাদী দেওবন্দী]

شروع کرتا ہو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہیں ۔(اشرف علی تھانوی دیوبندی)

-শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু হন। - [আশরাফ আলী থানভী দেওবন্দী]

দাতা দয়ালু ঈশ্বরের নামে **প্রবৃত্ত** হইয়াছি। -[গিরিশ চন্দ্র সেন]

সর্বশেষে আহমদ রেজা খানের অনুবাদ এভাবে উল্লেখ করেছেন-

اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا (اعلیٰ حضرت)

-আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। -[আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান]

উপরোক্ত অনুবাদসমূহ উল্লেখ করে কানযুল ঈমানের ভূমিকায় আলা হযরত ব্যতীত অন্যান্যদের অনুবাদের সমালোচনা করা হয়েছে এভাবে “লক্ষ্যণীয় যে,

আ’লা হযরত ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদক “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম”- এর অনুবাদ এভাবে করেছেন- “আরম্ভ করছি আল্লাহর নামে অথবা আরম্ভ আল্লাহর নাম সহকারে, শুরু করিতেছি আল্লাহর নামে ইত্যাদি। সুতরাং খোদ অনুবাদকদের দাবি তাদের ভাষায়ই মিথ্যা প্রমাণিত হচ্ছে। কারণ, তারাতো شروع کرتا ہو (আরম্ভ করছি) ক্রিয়া দ্বারাই অনুবাদ আরম্ভ করছেন; অথচ আল্লাহ তা’আলার নাম দ্বারা আরম্ভ করা উচিত ছিলো, যা শুধু আ’লা হযরতের অনুবাদেই পাওয়া যায়। অন্য সব অনুবাদে এ যেন বিসমিল্লায় গলদ।” (আব্দুল মান্নান লিখিত ভূমিকা, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৩৬)

এখানে হাস্যকর ব্যপার হল- بسم اللہ এর অনুবাদে شروع (আরম্ভ) শব্দ প্রথমে আনার কারণে উল্লেখিত অনুবাদকগণের অনুবাদকে ভুল বলা হয়েছে। এমনকি ‘বিসমিল্লায় গলদ বলা’ হয়েছে। **অথচ রেজাখানীদের কাছে ‘হাকীমুল উম্মত’ হিসেবে পরিচিত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী তার অনুবাদে شروع (আরম্ভ) শব্দ প্রথমে এনেছেন।** মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘‘মিরআতুল মানাজিহ’ এর প্রথম পরিচ্ছেদ, ‘কাফিরদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত ও পত্র প্রেরণ’ শীর্ষক অনুচ্ছেদে **بسم اللہ** এর অনুবাদে তিনি লিখেছেন–

شروع کرتا ھو اللہ کے نام سے جو مھربان اور رحم والا ھے (مرآۃ المناجیح)

অনুবাদ : শুরু করছি আল্লাহর নামে, যিনি মেহেরবান ও দয়ালু। (মিরআতুল মানাজীহ)

অনুরূপভাবে **الفصل الثالث** এর প্রথম হাদীসে **بسم اللہ** এর অনুবাদ এভাবে লিখেছেন–

شروع کرتا ھو مھربان اللہ کے نام سے جو رحم والاہیں (مرآۃ المناجیح)

অনুবাদ : শুরু করছি মেহেরবান আল্লাহর নামে, যিনি দয়ালু হন। (মিরআতুল মানাজীহ)

রেজাখানীরা অন্যান্য অনুবাদকের অনুবাদে ভুল ধরেন আবার তাদের নিয়ম অনুযায়ী তাদের হাকীমুল উম্মতেরও যদি ভুল হয় তবে তাদের মাযহাব কোথায় যায়?

নিজেদের হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেবের অনুবাদকে ভুল প্রমাণ করার মাধ্যমে কানযুল ঈমানের অনুবাদক আব্দুল মান্নান মহা হাকীমুল উম্মত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করলেন !

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, রেজাখানীরা আশরাফ আলী থানভীর অনুবাদের উপর আপত্তি করতে গিয়ে লিখেছে– **“আশরাফ আলী থানভী সাহেব তার অনুবাদের শেষ ভাগে ہیں (হন) শব্দটারও সংযোজন করেছেন (যা ‘বিধেয়’ সূচক পদ)। তাঁর শাগরিদ ও ভক্তগণ জবাব দেবেন কি? এখানে ہیں (হন) কিসের অনুবাদ?”** পাঠক লক্ষ্য করুন পূর্বোক্ত আশরাফ আলী থানভীর অনুবাদ আর আহমদ ইয়ার খান নঈমীর অনুবাদের কোনো পার্থক্য নেই। **আহমদ ইয়ার খান নঈমীর অনুবাদের শেষ ভাগেও ہیں (হন) শব্দটা রয়েছে। রেজাখানীরা তাদের হাকীমুল উম্মতের অনুবাদের বিষয়ে কী বলবে?**

উল্লেখ্য যে, রেজাখান সাহেবের অনুবাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে বাংলা কানযুল ঈমান এর ভূমিকায় লেখা হয়েছে, **অন্যান্য অনুবাদকগণের উচিৎ ছিল আল্লাহ তাআলার নাম দ্বারা আরম্ভ করা, যা শুধু রেজা খান সাহেবেরই অনুবাদে পাওয়া যায়। অন্যসব অনুবাদে এ যেন বিসমিল্লায় গলদ**। এখন আমাদের প্রশ্ন হল, তাদের ভাষ্য মোতাবেক আল্লাহ শব্দ আগে না আসলে যদি ভুল হয়, তবে আল-কুরআনুল করীমে **بسم** الله তে الله শব্দের আগে **بسم** শব্দ এসেছে। এটাও কি ভুল? (নাউযুবিল্লাহ) **তাহলে কি আল কুরআনুল কারীমের চেয়েও রেজা খানের অনুবাদ শ্রেষ্ঠ?** (নাউযুবিল্লাহ)।

রেজাখানীদের দৃষ্টিতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর অনুবাদে ভুল

কানযুল ঈমানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় অনুবাদক সুরা ফাতহ এর ১নং আয়াত **ليغفرلك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر** এর ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর অনুবাদ উল্লেখ করেছেন এভাবে-

آنچہ کہ سابق گذشت از گناہے تو وآنچہ پس ماند

অর্থ: খোদা তোমাকে ক্ষমা করবেন যা পূর্বে গত হয়েছে, তোমার পাপসমূহ থেকে এবং যা পরে হবে। (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪৭)

উক্ত অনুবাদের পাশাপাশি আহমদ রেজা খানের অনুবাদ এভাবে উল্লেখ করেছেন- “যাতে আল্লাহ আপনার কারণে পাপ ক্ষমা করেছেন আপনার পূর্ববর্তীদের এবং আপনার পরবর্তীদের।” (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪৮)।

এরপর বলেছেন– “আ’লা হযরত ব্যতীত অন্যান্যদের অনুবাদগুলো দ্বারা তো একথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের মহান নিষ্পাপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীতেও গুনাহ করেছিলেন, ভবিষ্যতেও গুনাহ করবেন” (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমানের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪৮)

এখানে প্রথম কথা হলো, আহমদ রেজাখান সাহেব যে অনুবাদ করেছেন সেটা অনুবাদ নাকি ব্যাখ্যা? উক্ত অনুবাদে কতগুলো ভুল রয়েছে তা পর্যালোচনা করার জন্য এটি মুহাক্কিক আলিমগণের নিকটই পেশ করা হলো।

দ্বিতীয়ত : আয়াতে কারীমার হুবহু শাব্দিক অনুবাদ দ্বারা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ‘পাপী’ আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে, তবে মূল আয়াতে কারীমাতেও তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পাপী আখ্যায়িত করা হয়ে যায়। রেজাখানীরা অনুবাদ নিজেদের মতো করে সাজাতে পারবেন, কিন্তু আয়াত তো নিজেদের মতো করে সাজাতে পারবেন না। আল কুরআনের শাব্দিক অনুবাদের উপর অভিযোগ পরোক্ষভাবে কুরআন শরীফের উপরই অভিযোগ। রেজাখানীরা কি মনে করেন ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের মাধ্যমেই সব কিছু ফয়সালা করতে পারবেন? কেবল অনুবাদ দ্বারাই কি তারা আল-কুআন ও রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঠিক মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তুলতে পারবেন? তাই যদি হয়, তবে তারা কেন আবার কুরআনে কারীমের তাফসীর করলেন?

উল্লেখ্য, আহমদ রেজা খানের জীবনী গ্রন্থ ‘জীবন ও কারামত’ এর মধ্যে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-কে আহমদ রেজা খানের দাদা ওস্তাদ উল্লেখ করা হয়েছে (জীবন ও কারামত পৃষ্ঠা ৫১)। অথচ তারাই আবার তার উপর আপত্তি তুললেন। আসলে এটা তাদের স্বভাবসুলভ বেয়াদবি।

রেজাখানীদের দৃষ্টিতে শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)ও ভুল করেছেন

হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-কে রেজাখানীরা একাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলে উল্লেখ করেছে। অথচ তিনিও উক্ত **ليغفرلك الله ما تقدم**

من ذنبك وما تأخر আয়াতের অনুবাদ এভাবে করেছেন :

ھر چہ پیش رفتہ ست از گناہے تو و ھر چیزے کہ پس آید (اشعۃ اللمعات:۴۸۰)

অর্থ: যাতে তিনি আপনার পূর্বাপর গুনাহসমূহকে ক্ষমা করে দেন। (আশিআতুল লুমআত, পৃষ্ঠা ৪৮০)

এ অনুবাদ বিবেচনায় **তাদের দৃষ্টিতে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)ও ভুল করেছেন**। এ ভুল ধরা কিংবা তা প্রমাণ করার দু:সাহস রেজাখানীরা করবেন কি?

মোট কথা, গরম সুন্নীরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিস্পাপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত বলে পরোক্ষভাবে শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদকে ভুল আখ্যায়িত করেছে।

প্রকাশ থাকে যে, **নবীগণ সকলেই নিষ্পাপ। একথার উপরই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের ঈমান ও আকীদা। নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ তারা কখনো পাপ কাজে লিপ্ত হননি। নবুয়তের পূর্বেও নয়, পরেও নয়**। তবে উক্ত বিষয়টি কুরআনের আয়াতের অনুবাদের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং এ জন্য তাফসীর বা ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হতে হবে। শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দীসে দেহলভী (র.)ও এর কয়েকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্যে সর্বোত্তম সমাধান বলে তিনি যা উল্লেখ করেছেন তা হলো– "কুরআনের আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি গুনাহের সম্বন্ধ করা হয়েছে। বাস্তবে এটা তাঁর অত্যধিক মর্যাদার কারণে বলা হয়েছে। যদিও তাঁর কাছ থেকে কোনো গুনাহ সংঘটিত হয়নি। এরপরও আল্লাহ পাক সব কিছু ক্ষমা করে দিয়েছেন।" (আশিআতুল লুম'আত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৮)

আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) উল্লেখিত আয়াতের অনুবাদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এর অনুরূপ করেছে। অতঃপর ব্যাখ্যার মাধ্যমে এটার সমাধান করেছেন। রেজাখানীরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এর ব্যাখ্যার অপেক্ষা না করে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদে লিপ্ত হয়েছেন। তাদের এ ধরনের শয়তানী চক্রান্ত থেকে বিরত থাকা উচিত।

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর অনুবাদের উপর রেজাখানীদের আরো অভিযোগ

কানযুল ঈমানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় কুরআন শরীফের আরো কয়েকটি আয়াতের ক্ষেত্রে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদের সাথে আহমদ রেজা খানের অনুবাদকে তুলনা করে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদকে ভুল আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং আহমদ রেজা খানের অনুবাদকে বিশুদ্ধ অখ্যায়িত করা হয়েছে। এতে রেজাখানীরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর উপর বেশ কিছু অভিযোগ এনেছে। নিম্নে তাদের অভিযোগগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

১. সূরা ফাতিহার ৪নং আয়াতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর উপর অভিযোগ আনা হয়েছে যে, তিনি বর্ণনামূলক বাক্য দ্বারা অনুবাদ করেছেন। আর আহমদ রেজা খান সাহেব প্রার্থনা সূচক বাক্য দ্বারা অনুবাদ করেছেন। (আব্দুল মান্নান অনূদিত কান্‌যুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭)

২. সূরা বাকারার ১২০নং আয়াতের অনুবাদে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা'সূম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত বলা হয়েছে এবং আহমদ রেজা খানের অনুবাদকে সন্দেহমুক্ত বলা হয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮)

৩. সূরা আনফালের ৩০নং আয়াতের অনুবাদে শাহ ছাহেব (র.) যে শব্দ ব্যবহার করেছেন, আল্লাহর শানে তা কোনো মতেই শোভা পায় না বলা হয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪১-৪২)

৪. সূরা আনফালের ৬৪নং আয়াতের অনুবাদে আহমদ রেজা খানের অনুবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে, এটা মাহাত্ম্যপূর্ণ ও রহস্যময়, পক্ষান্তরে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদে নাকি এটা অনুপস্থিত। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৩)

৫. সূরা শু'রার ২৪নং আয়াতের অনুবাদে অভিযোগ করা হয়েছে, শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর কলম দ্বারা রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হৃদয়ে আঘাত হানা হয়েছে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৫-৪৬)

৬. সূরা শু'রার ৫২নং আয়াতের অনুবাদে অভিযোগ আনা হয়েছে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদের দ্বারা একথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াত প্রকাশের পূর্বে মু'মিন ছিলেন না। অথচ রেজা খানের অনুবাদে এ ধরণের সমস্ত ভ্রান্তি ও আপত্তির অবসান ঘটে। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৬-৪৭)

৭. সূরা ফাতাহ্'র ১নং আয়াতের অনুবাদে অভিযোগ আনা হয়েছে, আহমদ রেজা খান ব্যতিত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)সহ অন্যান্যদের অনুবাদে এ কথা প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের নিস্পাপ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীতে গোনাহ করেছিলেন, ভবিষ্যতেও গোনাহ করবেন। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮)

৮. সূরা বালাদের ১নং আয়াতের অনুবাদের উপর অভিযোগ আনা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা সবধরনের পানাহার থেকে মুক্ত, অথচ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)সহ অন্যান্যরা অনুবাদে আল্লাহকে কসম খাইয়েছেন। (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০-৫১)

রেজাখানীরা উপরোক্ত অভিযোগগুলো বাংলা কানযুল ঈমানের ভূমিকায় এনেছে। আর এ সকল অভিযোগের স্বপক্ষে মত প্রদান করেছেন জালালুদ্দীন আল কাদেরী, অধ্যক্ষ হাফিজ এম এ জলিল, উবায়দুল হক নঈমী, শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী প্রমুখ।

আমরা এগুলোর উত্তর দিতে যাচ্ছি না। কারণ, সাধারণ যে কোনো আলিম বা ভালো কোনো ছাত্রই যদি শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও আহমদ রেজা খান সাহেবের অনুবাদ পড়েন, তবে সহজেই বুঝতে পারবেন উভয় অনুবাদের মধ্যে কোনটি সঠিক। শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদ কেবল অনুবাদই নয়, অনুবাদের জন্য একটা অনুসরণীয় আদর্শও বটে।

রেজাখানীদের স্ববিরোধী কাজের দৃষ্টান্ত

শাহ আব্দুল কাদির (র.) ও শাহ রফী উদ্দিন (র.) হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর সুযোগ্য সন্তান। তারা উভয়েই কুরআন মজীদের তরজমা করেছেন। রেজাখানীরা তাদের তরজমার ভুল ধরেছেন। যা পূর্বে "একটি হাস্যকর ব্যাপার" নামক শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু তারা যেটাকে ভুল বলেন সে রকম অনুবাদ তারাও করে থাকেন। যেমন :

কানযুল ইমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে বঙ্গানুবাদে **لا اقسم بهذا البلد** এ আয়াতের অনুবাদের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরা হয়েছে-

''মানুষ কসম খায়। উর্দু ও ফার্সী ভাষার পরিভাষায় অবশ্য কসম খাওয়া যায়। আল্লাহ তা'আলা তো সব ধরনের পানাহার থেকে পবিত্র। প্রথমোক্ত অনুবাদকগণ তাদের অনুবাদে আপন আপন পরিভাষায় আল্লাহ তাআলাকেও কেন মানুষের অনুসারী করলেন? এ জন্যই কি তারা এ অনুবাদ করলেন যে, **ঐ মহান আল্লাহ তো কিছু পানাহার করেন না, অন্ততঃপক্ষে কসম হলেও আহার করুক,** না, এ সূক্ষ্ম মাসআলাটার দিকে কোনো অনুবাদকই মনযোগ দেননি? কিন্তু আ'লা হযরত কতই সুন্দর পন্থায় অনুবাদ করেছেন- "আমার এ শহরের শপথ" (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫০)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায়, আহমদ রেজা খান 'কসম খাওয়া' শব্দটি ব্যবহার না করে মহাপাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। তাছাড়া রেজাখানীদের নিকট কসম হচ্ছে এক ধরণের খাদ্যদ্রব্য। **অথচ তাদেরই হাকিমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমী আল্লাহর উপর কসম খাওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন।** উদাহরণ স্বরূপ তার লিখিত 'মিরআত' কিতাবে **لو اقسم على الله** এর অনুবাদে লিখেন :

اگر اللہ پر قسم کھالے

অর্থাৎ যদি আল্লাহর উপর কসম খায়। (মিরআত, খণ্ড : ৭, পৃষ্ঠা ৫৮)

রেজাখানীদের দৃষ্টিতে কসম যদি খাওয়ার বস্তু হয়, তবে উক্ত অনুবাদের শাব্দিক অর্থ হবে, কসমটা যদি আল্লাহর উপর রেখে খায়। এটা কিভাবে সম্ভব হবে তা কেবল রেজাখানীরাই ভালো জানেন।

হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) **لو اقسم على الله** অর্থ লিখেছেন-

اگر سوگند خورد بخدا (اشعۃ اللمعات، جلد ۴ ص:۴۸)

অর্থাৎ যদি আল্লাহর নামে কসম খায়। (আশিআতুল লুমআত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১০)

দেখুন, **শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদ আর আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে তাদের দৃষ্টিতে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এখানেও ভুল করেছেন?**

ধৃষ্টতার নমুনা

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-কে রেজাখানীরাও বিভিন্ন কিতাবে মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকার করেছে। "আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফাযেলে বেরলভী-এর জীবন ও কারামত" গ্রন্থে আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-কে মুজাদ্দিদ স্বীকার করা হয়েছে। অন্যদিকে উক্ত গ্রন্থে আহমদ রেজা খান সাহেবের হাদীসের সনদে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-কেও দাদা উস্তাদ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও কানযুল ঈমানের বাংলা অনুবাদের ভূমিকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর অনুবাদকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করা হলো। এটা কেমন ধৃষ্টতা?

রেজাখানীদের ধৃষ্টতার আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো বাংলা কানযুল ইমানে বলা হয়েছে **يا ايها النبى** এর অনুবাদে শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) *پیغمبر* । (হে পয়গাম্বর) বলেছেন, এটা অসম্পূর্ণ অনুবাদ। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, রেজাখানীরা যে সূত্র অনুযায়ী শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর ভুল ধরেছেন সে সূত্রে শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদও ভুলের তালিকায় পড়ে গেছে। যেমন আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) **اشعة اللمعات** কিতাবে বিভিন্ন হাদীসে **نبى** (নবী) শব্দের অর্থে *پیغمبر* (পয়গাম্বর) শব্দ উল্লেখ করেছেন। যেমন-

১. **اشعة اللمعات** -এর ৩য় খণ্ডের ১৬ পৃষ্ঠায় **عن النبى** এর অর্থ লিখেছেন- **روايت مى كند از پيغمبر خدا** অর্থাৎ পয়গাম্বরে খোদা থেকে বর্ণিত।

২. উক্ত খণ্ডের ৭৭ পৃষ্ঠায় **فات النبى** এর অর্থ লিখেছেন- *پس آمد پیغمبر را* পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলেন।

৩. ১১৭ পৃষ্ঠায় **وفينا نبى** এর অর্থ লিখেছেন- *درمیاں ما پیغمبر است* আমাদের মধ্যে একজন পয়গাম্বর আছেন।

৪. ১১৫ পৃষ্ঠায় **فخيرها النبى صلى الله عليه وسلم** এর অর্থ লিখেছেন- *پس مخیر گردانید اورا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم* অর্থাৎ তাকে পয়গাম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এখতিয়ার প্রদান করলেন।

তাদের দৃষ্টিতে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) **نبى** এর অর্থ *پیغمبر* লিখে ভুল করেছেন। আবার হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুরূপ অনুবাদ করেছেন। ফলে তারা উভয়েই (রেজাখানীদের দৃষ্টিতে) ভুলের মধ্যে পতিত। এ ধরণের ভুল অন্বেষণ করে বুযুর্গানে দ্বীনের সাথে কিরূপ বেয়াদবি করা হয়েছে পাঠকগণ তা চিন্তা করে দেখুন।

রেজাখানীরা নিজেদের অনুবাদকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের লক্ষে নিজস্ব কিছু নীতিমালা তৈরি করে নিয়েছে। তাদের মতে নবী শব্দের অর্থ 'পয়গাম্বর' লেখলে ভুল হবে আবার রাসূল শব্দের অর্থ 'পয়গাম্বর' লেখলে যথার্থ হবে। এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে কান্‌যুল ঈমানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় লেখা হয়েছে-

"কুরআন কারীমে 'রসূল' (**رسول**) ও 'নবী' (**نبى**) শব্দদ্বয় কতিপয় স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে। অনুবাদকদের দায়িত্ব হচ্ছে উভয় শব্দের যথাযথ অনুবাদ করা। 'রসূল' শব্দের অনুবাদ 'পয়গাম্বর' করা তো সুস্পষ্ট। কিন্তু 'নবী' (**نبى**) শব্দের অনুবাদ 'পয়গাম্বর' করলে তা হবে অসম্পূর্ণ। আ'লা হযরত 'নবী' (**نبى**) শব্দের অনুবাদ এমনভাবে করেছেন যে, সেটার মাহাত্ম্যগত ও রহস্যগত দিকও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়।" (কান্‌যুল ঈমানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪৩)

স্ববিরোধিতার আরেকটি দৃষ্টান্ত

রেজাখানীরা শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) কর্তৃক অনুদিত নবী শব্দের অর্থকে ভুল প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে। অথচ রেজাখানিদের মুখপাত্র অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল তার লিখিত 'হায়াত মউত কবর হাশর' পুস্তকের ২৬, ৪৪, ৬৮, ৯৬, ৯৭, ১৭৬, ১১৯, ২৬৭, ৩৯৪, ৩৯৭, ৩৯৮, ৪০১ নং পৃষ্ঠায় নবী শব্দের অর্থ লিখেছেন 'রাসূল'। এ থেকে প্রমাণ হয় নবী শব্দের অর্থ রাসূল। আর তাদের মূলনীতি অনুযায়ী রাসূল শব্দের অর্থ পয়গাম্বর হওয়া যথাযথ। সুতরাং নবী শব্দের অর্থ তারাই করেছেন পয়গাম্বর। আব্দুল জলিল সাহেব কি অসম্পূর্ণ অর্থ করলেন নাকি তার কাছে কানযুল ঈমানের অনুবাদের মূলনীতি পৌঁছেনি?

রেজাখানীদের অবস্থা দৃষ্টে একটি গ্রাম্য কৌতুক মনে পড়ছে। একবার এক ঘরে চোর ঢুকল। স্বামী স্ত্রী দু'জন চোর ঢুকার বিষয়টি টের পেলেন। স্বামী তার স্ত্রীকে

বলল, তুমি যাও একজন পুরুষ মানুষকে ডেকে নিয়ে আস। স্ত্রী বলল, তুমিও তো পুরুষ। স্বামী জবাব দিল হ্যাঁ, তাইতো, আমিতো ভুলেই গিয়েছিলাম যে আমি পুরুষ। রেজাখানীদের অবস্থাও তেমনি। তারা মনগড়া নীতির আলোকে অন্যের ভুল ধরার শয়তানী চক্রান্তে ব্যস্ত অথচ তাদের নিজস্ব নীতি অনুযায়ী তাদের মধ্যেও যে ভুল রয়েছে সে বিষয়ে তারা বেখবর।

বানরের গাছ চিরা

কানযুল ঈমানের ভূমিকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) কৃত কুরআনে কারীমের আরেকটি আয়াতের অনুবাদ উদ্ধৃত করা হয়েছে যে– “সুতরাং যদি খোদা চাইতেন তবে তোমার অন্তরের উপর মোহর করে দিতেন” (সূরা শু’রা, আয়াত ২৪, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমানের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ৪৫)

এ অনুবাদ তুলে ধরে রেজাখানীরা অভিযোগ করেছে যে, শাহ সাহেব (র.) এর উক্ত অনুবাদের দ্বারা রহমতে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র হৃদয়ে আঘাত হানা হয়েছে।

অথচ কানযুল ঈমানে সূরা ‘আল-হাক্কাহ’ এর ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে- “এবং যদি তিনি আমার নামে একটা কথাও বানিয়ে বলতেন, তবে অবশ্যই তার নিকট থেকে সজোরে বদলা নিতাম; অত:পর **তার হৃদয়-শিরা কেটে দিতাম**” (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান পৃষ্ঠা ১০২৫)

পাঠকগণ লক্ষ্য করে দেখুন, উক্ত অনুবাদে হৃদয়-শিরা কেটে দেয়ার কথা বলা হয়েছে। **মোহর লাগানোর চেয়ে শিরা কেটে দেয়া রেজাখানিদের ধারণা অনুযায়ী আরো জঘন্য নয় কি?** অথচ তারা নিজেদের ভ্রান্তি বজায় রেখে তাদের চিন্তাধারা অনুযায়ী অন্যের সমালোচনায় ব্যস্ত।

রেজাখানীরা যদি শাহ সাহেবের এ অনুবাদকে বেয়াদবি বলে তবে অবশ্যই তারা এর চাইতে আরো বড় বেয়াদবি করেছে। **উদ্দেশ্যমূলক অযথা বিরোধিতা করতে গিয়ে তারা চরম বেয়াদব সাব্যস্ত হয়েছে।**

কুরআন ও হাদীসের মর্মার্থ অনেক সময় অনুবাদ দ্বারা উদঘাটন করা সম্ভব হয় না। এর জন্য ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হতে হয়। রেজাখানীদের নিকট হাকীমুল উম্মত খ্যাত আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেব তার মিরআতুল মানাজীহ” কিতাবে একটি হাদীস **قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انه ليغان على قلبى** এর

অনুবাদ করেছেন নিম্নরূপ :

ترجمہ: فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے دل پر پردہ آتا ہے (مرأۃ المناجیح)

অর্থ: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার কলবের উপর পর্দা এসে যায়।

এ হাদীসের মর্ম ব্যাখ্যা ছাড়া অনুধাবন করা সম্ভব। মুহাদ্দিসীনে কিরাম উক্ত হাদীসে উল্লেখিত কলবের উপর ‘পর্দা’ আসার ব্যাপারে বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। এমনকি আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেবও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ব্যাখ্যা ছাড়া কেবল অনুবাদের উপর ফতওয়া দিলে নঈমী সাহেবের অবস্থা কি হবে? আর অনুবাদই যদি ব্যাখ্যা হয় তবে ব্যাখার প্রয়োজন কি ছিল?

রেজাখানীদের কুরআন অনুবাদের মূলনীতি সম্পর্কে কিছু কথা

বাংলা কানযুল ঈমানের ভুমিকায় রেজাখানী অনুবাদক লিখেছেন, **“কুরআন করিমের অনুবাদ শব্দগত না হয়ে তাফসীর সম্মত হওয়া চাই। যদি কুরআন করীমের নিছক শব্দগত অনুবাদ করা হয় তবে তা থেকে অনেক অসুবিধার সৃষ্টি হয়। কখনো আল্লাহর শানে বেয়াদবি হয়, কখনো নবীগণের শানে, কখনো ইসলামের বুনিয়াদী আক্বীদা আহত হয়।”** (বাংলা কানযুল ইমানের ভূমিকা পৃ: ৫২)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, কুরআনের তরজমাই সকল সন্দেহ নিরসনের জন্য যথেষ্ট। আকীদার ক্ষেত্রেও কেবল তরজমার উপর নির্ভর করলেই চলবে। **তাদের মূলনীতির উপর ভিত্তি করে যদি ফতওয়া প্রদান করা হয় তবে তাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি বেয়াদবি প্রদর্শনকারী, ইসলামের বুনিয়াদি আকিদা আহতকারী ও শহীদগণের সাথে বেয়াদবি প্রদর্শনকারী সবই প্রমাণ করা সম্ভব।**

কানযুল ঈমানের অনুবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন

কোনো আকীদা বা বিশ্বাস প্রমাণের জন্য যদি অনুবাদই যথেষ্ট হয় তবে আহমদ রেজাখান সাহেবের কানযুল ঈমানের অনুবাদ থেকে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করা হলো। রেজাখানীরা কি বলবেন, অনুবাদে যা এসেছে তাই তাদের আকীদা?

আয়াতগুলো দ্বারা কি তাফসীরের চাহিদা পুরণ হয়ে যাবে? আর একথা মেনে নিলে তারাই তাদের দাবি অনুযায়ী পথভ্রষ্ট নয় কি?

সূরা নমল, আয়াত ৬৫ এর অনুবাদ :
“আপনি বলুন, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান রাখেনা যারা আসমান সমূহ ও জমীনে রয়েছে কিন্তু আল্লাহ।” (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৬৯৪)
প্রশ্ন হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ইলমে গায়বের ব্যপারে কি উক্ত আয়াতের অনুবাদ দ্বারা কোনো ফয়সালা দেয়া যাবে? আর যদি দেয়া না যায়, তবে এই অনুবাদ তাফসীরসম্মত হল কিভাবে?

সূরা নমল, আয়াত ৮০ এর অনুবাদ :
“নিশ্চয়, আপনার শুনানো (কথা) শুনতে পায়না মৃতরা।” (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৬৯৫)
উক্ত আয়াতের দ্বারা কি মৃত ব্যক্তির শ্রবণ সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়া যায়?

সূরা সিজদাহ, আয়াত ১১ এর অনুবাদ :
“আপনি বলুন, তোমাদেরকে মৃত্যু প্রদান করে মৃত্যুর ফিরিশতা, যে তোমাদের জন্য নিযুক্ত রয়েছে।” (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৭৪৭)
এ অনুবাদের আলোকে ফিরিশতার মৃত্যু প্রদানের ব্যপারে সিদ্ধান্ত দেয়া যাবে কি? অথচ অন্য আয়াতে আল্লাহ মৃত্যু প্রদান করেন বলে উল্লেখ আছে।

সূরা আহকাফ, আয়াত ৯ এর অনুবাদ :
‘‘আপনি বলুন আমি কোনো নতুন রসুল নই এবং আমি জানিনা আমার সাথে এবং তোমাদের সথে কি ব্যবহার করা হবে।’’ (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৮৯৮)
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করবেন সে বিষয়ে কি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্দিহান?

সূরা নিসা, আয়াত: ১০৫-১০৬ এর অনুবাদ :
“এবং প্রতারণাকারীদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করো না। এবং **আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও**।” (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১৮৮)
উক্ত আয়াতে প্রতারণাকারীদের পক্ষ থেকে ঝগড়া না করা ও ক্ষমা চাওয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি ঝগড়া করেছেন? (নাউযুবিল্লাহ) তিনি কেন ক্ষমা চাইবেন?

রেজাখানীদের নীতিমালা অনুযায়ী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্ষেত্রে পাপ মার্জনা, ক্ষমা বা এ ধরণের শব্দ ব্যবহার করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবি হয় এবং তাঁর মা'সুম হওয়াকে অস্বীকার করা হয় তাহলে এখানে এ অনুবাদে ‘ক্ষমা’ শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে তারা কি আল্লাহর রাসূলের মা'সুম তথা নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করলেন?

আয়াত ও হাদীসের মর্ম বুঝার জন্য অনুবাদই কি যথেষ্ট?

রেজাখানীরা তাদের অনুবাদকে তাফসীরসম্মত দাবী করে থাকেন। কিন্তু তাদের অনুবাদও কি মর্ম বুঝার জন্য যথেষ্ট? নিম্নে এমন কয়েকটি রেজাখানী অনুবাদ পেশ করা হলো, যা ব্যাখ্যার দাবি রাখে। যেমন :

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (النجم : ٣٩)

অর্থ: এবং এ যে, মানুষ পায় না, কিন্তু আপন প্রচেষ্টা। (সূরা নজম, আয়াত ৩৯, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৯৪৯)
মানুষ যদি চেষ্টা ছাড়া কিছু পায় না তবে মৃতের নিকট সওয়াব পৌছানোর ব্যাপারে এ অনুবাদের দ্বারা কি ফয়সালা দিবেন?

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ (البقرة: ١٨٧)

বঙ্গানুবাদ : এবং পানাহার কর এ পর্যন্ত যে, তোমাদের নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে শুভ্র রেখা কৃষ্ণ রেখা থেকে, ভোর হয়ে; (সূরা বাকারা, আয়াত ১৮৭, বঙ্গানুবাদ কানযুল ইমান, পৃষ্ঠা ৬৮-৬৯)
আহমদ রেজা খানের উপরোক্ত উক্ত অনুবাদও সঠিক মর্ম বুঝার জন্য যথেষ্ট নয়। কেননা আয়াতে বর্ণিত ‘শুভ্ররেখা’ ও ‘কৃষ্ণ রেখা’ দ্বারা কী বুঝানো হয়েছে তার কোনো ব্যাখ্যা এখানে নেই।

প্রকাশ থাকে যে, সাহ্‌রী কতক্ষণ পর্যন্ত খাওয়া যাবে এ আয়াতে সে বিষয়ের বর্ণনা এসেছে। সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম উক্ত আয়াতের বাহ্যিক মর্ম অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শরণাপন্ন হলে তিনি তা ব্যাখ্যা করে দেন। **যদি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ দ্বারা মর্ম অনুধাবন সম্ভব হতো তাহলে তাফসীর বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন দেখা দিল কেন?**

রেজাখানীদের জেনে রাখা উচিত, জটিল বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা ছাড়া কেবল অনুবাদ দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। কুরআন পাকের কোনো কোনো আয়াতে এক বা একাধিক শব্দ এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে পূর্ণ একটি বাক্যও উহ্য থাকতে পারে। যেমন: নিম্নোক্ত আয়াত فَأَرْسِلُونِ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ অর্থ: আমাকে প্রেরণ কর হে ইউসূফ! হে বড় সত্যবাদী। (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৪৩৯)

পরিপূর্ণ বাক্যটি হল-

ارسلونى الى يوسف لاستعبره الرؤيا ففعلوا فاتاه وقال يا يوسف (دروس البلاغة)

অর্থ্যাৎ আমাকে ইউসূফের নিকট পাঠিয়ে দাও, আমি তাকে স্বপ্নের তাবির জিজ্ঞাসা করব, অত:পর সে ইউসূফ (আ.) এর নিকট আসল এবং তাকে বলল হে ইউসূফ !

উল্লেখ্য, এখানে পরিপূর্ণ একটি বাক্য উহ্য রয়েছে। উপরে উল্লেখিত কানযুল ঈমানের অনুবাদ দ্বারা এ আয়াতের সঠিক মর্ম কি উদ্ঘাটিত হলো? যদি মর্ম উদঘাটন না হয় তাহলে এটা তাফসীরসম্মত অনুবাদ কিভাবে হলো?

কানযুল ঈমানের তাফসীরসম্মত অনুবাদের নমুনা!

রেজাখানীরা কানযুল ঈমানের অনুবাদকে তাফসীরসম্মত দাবি করলেও বাস্তবে এ দাবি সঠিক নয়। এর অনেক প্রমাণ দেখানো যাবে। যেমন : সূরা বাক্বারার ১৮৮ নং আয়াতে কাবা শরীফের দিকে মুখ ফিরানোর কথা বলা হয়েছে। সূরা গাশিয়াহ এর ২ ও ৮ নং আয়াতে কিয়ামতের দিন চেহারাসমূহ সজীব ও লাঞ্ছিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কানযুল ঈমানে উল্লেখিত আয়াতসমূহের অনুবাদে ‘চেহারা’র কথাই বলা হয়েছে। অথচ আয়াতে ‘চেহারা’ দ্বারা মূলত: ব্যক্তি উদ্দেশ্য। তাহলে এটা তাফসীরসম্মত অনুবাদ নাকি শব্দগত অনুবাদ?

সূরা হজ্জের ১নং আয়াতে بيدك (তোমার হাত) ايديكم (তোমাদের হাত) এবং সূরা আনফালের ৫১ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। উপরোক্ত শব্দগুলোর অনুবাদে কানযুল ঈমানে ‘হাত’ লেখা হয়েছে। অথচ আয়াতে হাত দ্বারা ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সূরা মুজাম্মিলের ২ নং আয়াতে, সূরা হাশরের ৭৮ নং আয়াতে, সূরা বাক্বারার ৪৩ নং আয়াতে যথাক্রমে القيام والقرأة والركوع والسجود (দাঁড়ানো, কিরাত পাঠ, রুকু করা, সিজদা করা) শব্দগুলো এসেছে। অথচ এই সব শব্দেগুলোর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে নামায। কানযুল ঈমানে নামায না বলে শব্দ যেভাবে আছে সেভাবেই—দাড়ানো, রূকু, কিরাত, সিজদা—অর্থ করা হয়েছে অর্থাৎ শাব্দিক অনুবাদ করা হয়েছে। অনুবাদ যদি তাফসীরসম্মতই হতে হয় তাহলে কানযুল ঈমানে এরূপ তরজমা করা হলো কেন?

মোটকথা, রেজাখানীরা যে ফাঁদ পেতেছে, তাদের পাতানো ফাঁদে তারাই ধরা পড়বে।

প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত শব্দগুলো বা এ ধরনের শব্দাবলী পবিত্র কুরআনে কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে ব্যপারে বিস্তারিত জানতে হলে الاتقان فى علوم القرا ن ২য় খণ্ড, النوع الثانى والخمسون فى حقيقته ومجازه অধ্যায় দেখুন।

তাফসীরসম্মত অনুবাদের নামে আয়াতের খেতাব পরিবর্তন ও অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন

লক্ষ্যণীয় যে, কোনো কোনো আয়াতে উহ্য বাক্যকে কানযুল ঈমানের অনুবাদে উল্লেখ না করলেও অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন-

لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থ: হে শ্রোতা! যদি তুমি আল্লাহর শরীক স্থির কর, তবে অবশ্যই তোমার সমস্ত কর্ম নিস্ফল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতির মধ্যে থাকবে। (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৮৩৭)

তাফসীর সম্মত অনুবাদ করতে গিয়ে “হে শ্রোতা” একটি শব্দ বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। অথচ তা কুরআনে নাই। আবার এ শব্দের মাধ্যমে আয়াতের খেতাব (সম্বোধন) নিয়েও সন্দেহ সৃষ্টি করা হয়েছে। তাদের সৃষ্ট সন্দেহ নিরসন করতে হলে আয়াতের তাফসীর জানা আবশ্যক।

রেজাখানীদের জানা থাকা দরকার যে, পবিত্র কুরআন শরীফে অনেক স্থানে বাহ্যিকভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন (খেতাব) করা হয়েছে, অথচ এর দ্বারা উম্মতদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উপরোক্ত আয়াত সম্পর্কে ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর ‘আল ইতকান’ এর মধ্যে রয়েছে :

خوطب النبى (ص) واريد غيره لاسيحالة الشرك عليه شرعا (الاتقان جلد٢، صحفة ١٦٢)

অর্থাৎ এখানে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে খেতাব (সম্বোধন)

করা হয়েছে এবং অন্যদের উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। কেননা শরীআতের দৃষ্টিতে শিরকের সাথে তাঁর সম্পর্ক থাকা অসম্ভব। (আল ইতকান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬২)

সূরা যুখরূফ, আয়াত ৮১ এর অনুবাদেও অনুরূপ অতিরিক্ত শব্দ সংযোজন করা হয়েছে। যেমন–

قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ

تم فرماؤ، بفرضِ محال رحمٰن کے کوئی بچہ ہوتا تو سب سے پہلے میں پوجتا۔ (کنزالایمان)

অনুবাদ : আপনি বলুন, **অসম্ভব কল্পনায়** পরম দয়াময়ের যদি কোনো সন্তান থাকতো তবে সর্ব প্রথম আমিই তার ইবাদত করতাম। (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৮৮৬)

আমাদের প্রশ্ন হল, এটা তাফসীর না তরজমা? **আহমদ রেজা খান সাহেব তাফসীরসম্মত তরজমা করতে গিয়ে 'অসম্ভব কল্পনায়' শব্দ বাড়িয়ে দিলেন।** এটা কতটুকু ঠিক হলো? এটি কি আয়াতের মধ্যে সংযোজন নয় ?

রেজাখানীদের কুরআন বিকৃত করার চক্রান্ত

রেজাখানীরা কানযুল ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে সূরা আর রাহমানের নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের অনুবাদ নমুনাস্বরূপ পেশ করেছে এবং এখানেও শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদকে ভুল বলা হয়েছে।

রেজাখানীদের দৃষ্টিতে শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদের সাথে আহমদ রেজা খান সাহেবের অনুবাদের একটি তুলনা নিম্নরূপ :

الرَّحْمٰن ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ ، خَلَقَ الْإِنْسَانَ ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ

(১) শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদ-

خدا آموخت قرآن را، آفرید آدمی را و آموختش سخن گفتن،

বঙ্গানুবাদ : খোদা শিক্ষা দিলেন কুরআন। সৃজন করলেন মানুষকে এবং শিক্ষা দিলেন তাকে কথা বলা।

(২) আহমদ রেজা খান এর অনুবাদ -

رحمٰن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا ، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ، ماکان وما یکون کا بیان انہیں سکھایا،

বঙ্গানুবাদ : পরম দয়ালু (রহমান); **আপন মাহবুবকে** কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। **মানবতার প্রাণ মুহাম্মদকে** সৃষ্টি করেছেন; যা সৃষ্টি হয়েছে এবং **যা সৃষ্টি হবে সব কিছুর** বর্ণনা তাকেই শিক্ষা দিয়েছেন। (ভূমিকা : বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৪৯)

উক্ত দুই অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বাংলা কানযুল ঈমানের ভূমিকায় রেজাখানীরা লিখেছে- "আলা হযরত ব্যতীত অন্যান্য অনুবাদকের অনুবাদগুলো খুব মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। অত:পর আলা হযরতের অনুবাদ গভীরভাবে পর্যালোচনা করুন। দ্বিতীয় আয়াতে عَلَّمَ (আল্লামা) ক্রিয়া ব্যবহৃত হয়েছে। এটা দ্বিকর্মক ক্রিয়া। প্রথমোক্ত সমস্ত অনুবাদে উল্লেখ করা হয়- رحمٰن نے سکھایا قرآن (পরম দয়াময় কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন)। ঐ সব অনুবাদক একটা মাত্র কর্ম উল্লেখ করেছেন (কুরআন)। এখন প্রশ্ন জাগে কুরআন কাকে শিক্ষা দিয়েছেন? এটা তারা উল্লেখ করেননি। কিন্তু আলা হযরত (রহ.) তা প্রকাশ করে দিয়েছেন- 'রাহমান আপন মাহবুবকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন'। তৃতীয় আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে- মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সে মানুষটি কে? অনুবাদকগণ শব্দগত অনুবাদ পেশ করে ক্ষান্ত হলেন। কোন কোন অনুবাদক আবার এখানে নিজ থেকেও শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। তবুও 'ইনসান' শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায়নি। (বাংলা কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৪৯-৫০)

উপরোল্লিখিত বক্তব্যে রেজাখানীরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) সহ অন্যান্য অনুবাদকগণের উপর তিনটি অভিযোগ উত্থাপন করেছেন।

(১) عَلَّمَ দ্বিকর্মক ক্রিয়ার একটি মাত্র কর্ম অর্থ্যাৎ কুরআন উল্লেখ করেছেন।

(২) তৃতীয় আয়াতের অনুবাদ হচ্ছে- মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। সে মানুষটি কে তা উল্লেখ করা হয়নি।

(৩) শাহ ছাহেব (র.) এর অনুবাদে ইনসান শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায়নি।

রেজাখানীদের উপরোল্লিখিত অভিযোগ থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, কুরআন শরীফের যে আয়াতে কর্তা, কর্ম, সর্বনাম, বা সম্বন্ধ পদ উহ্য থাকবে, সে সব আয়াতের অনুবাদে উক্ত কর্তা, কর্ম, সর্বনাম বা সম্বন্ধ পদকে উল্লেখ করতে হবে। অথচ উলুমুল কুরআন বিষয়ে অজ্ঞ রেজাখানীদের জেনে রাখা উচিৎ কুরআন শরীফের ফাসাহাত-বালাগাত বিষয়ে লিখিত কিতাবসমূহের মধ্যে কর্তা, কর্ম ইত্যাদি উহ্য রাখার বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের বর্ণনা রয়েছে। উক্ত ক্ষেত্রে

শব্দসমূহকে উহ্য রাখাই কুরআন শরীফের ভাষাগত বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্যতম কারণ। রেজাখানীরা শাব্দিক অনুবাদের সময় উহ্য শব্দকে উল্লেখ করে কুরআনে কারীমের ফাসাহাত ও বালাগাতকে অস্বীকার করেছে। আর কুরআনে কারীমের শব্দ ও অর্থ উভয়ই হচ্ছে কুরআনে কারীমের অন্তর্ভূক্ত। বিশিষ্ট উসূলবিদ নূরুল আনওয়ার প্রণেতা লেখেন : **وهو اسم للنظم والمعني جميعا** অর্থাৎ ইহা (কুরআন) হচ্ছে শব্দ ও অর্থ উভয়ের নাম।

কুরআনে কারীমের উহ্য বিষয়সমূহকে শাব্দিক অনুবাদে নয় বরং ব্যাখ্যার মাধ্যমে প্রকাশ করাই উলুমুল কুরআনের মূলনীতি। উহ্য শব্দের অনুবাদ করতে হলে এমনভাবে করতে হবে যেন বুঝা যায় যে এটা কুরআনের শাব্দিক অর্থ নয় বরং ব্যাখ্যা। কিন্তু উপরোল্লিখিত অনুবাদে আহমদ রেজা খান সাহেব অনেক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা আয়াতে নেই, কিন্তু এগুলো যে ব্যাখ্যা তাও বুঝা যাচ্ছে না বরং সংযোজিত শব্দগুলোকে আয়াতের অংশই মনে হচ্ছে। এটা আহমদ রেজা খানের পক্ষ থেকে কুরআন শরীফে নতুন শব্দ সংযোজনের নামান্তর। যেমন তার অনুবাদে রয়েছে-"পরম দয়ালু (রহমান); **আপন মাহবুবকে** কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। **মানবতার প্রাণ মুহাম্মদকে** সৃষ্টি করেছেন; **যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে** সব কিছুর বর্ণনা তাকেই শিক্ষা দিয়েছেন।" কিন্তু মূল আয়াতে **'আপন মাহবুবকে'** অংশটুকু নেই। **'মানবতার প্রাণ মুহাম্মদ'** এ অংশটুকুও নেই বরং এ স্থলে কেবল 'ইনসান' শব্দ রয়েছে। এমনিভাবে **'যা সৃষ্টি হয়েছে এবং যা সৃষ্টি হবে'** অংশও আয়াতে নেই। **এটা কুরআন শরীফের মধ্যে সংযোজন ও কুরআন বিকৃত করার নামান্তর।**

প্রকাশ থাকে যে, উল্লেখিত আয়াতসমূহের অনুবাদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) জমহুর মুফাসসিরীনদের অনুসরণেই করেছেন। আর আহমদ রেজা খান কৃত অনুবাদ কোনো অনুবাদ নয় বরং ব্যাখ্যা। তাছাড়া এ ব্যাখ্যাটাও জমহুর মুফাসসিরীনের খেলাফ।

নিজেদের ভুল অনুসন্ধান করুন

রেজাখানীরা ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের যে ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করেছে তা নিজেরাও সর্বক্ষেত্রে রক্ষা করতে পারেনি। এ বিষয়ে তাদের ইমাম আহমদ রেজা খানের লিখিত কানযুল ঈমান থেকে কয়েকটি আয়াতের অনুবাদ উল্লেখ করা যথেষ্ট মনে করছি।

১. এবং আল্লাহ শান্তির আবাসের দিকে আহবান করেন। (সূরা ইউনুস, আয়াত ২৫, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৩৮৯)

উক্ত আয়াতে **'সমস্ত সৃষ্টিকে'** কর্মটি উহ্য আছে। অথচ কানযুল ঈমানে উল্লেখ করা হয়নি।

২. নির্দেশ আল্লাহর; পূর্বে ও পরে। (সূরা রোম, আয়াত ৪, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৭৩০)

উক্ত আয়াতে **'রোম বিজয়ের' কথাটি উহ্য আছে। অর্থাৎ রোম বিজয়ের পূর্বে ও পরে।** অথচ কানযুল ঈমানের অনুবাদে এটি উল্লেখ করা হয়নি।

মোট কথা, রেজাখানীরা কখনো শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) সহ অন্যান্য অনুবাদককে ভুল প্রমাণ করার জন্য কুরআন শরীফের উহ্য শব্দাবলীকে কুরআন শরীফের আয়াত বানিয়ে অনুবাদ করে আবার কখনো তাদের অন্য প্রয়োজনে কিংবা নিজস্ব নীতিভ্রষ্ট হয়ে উহ্য শব্দকে প্রকাশ করা ছাড়াই শাব্দিক অনুবাদ করে। এটা কুরআন বিকৃত করার চক্রান্ত ছাড়া আর কি হতে পারে?

আহমদ রেজা খান সাহেবের অনুবাদও যথার্থ নয়

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদকে ভুল প্রমাণ করতে গিয়ে কান্যুল ঈমানের ভূমিকায় লেখা হয়েছে যে, তার অনুবাদে ইনসান শব্দের যথার্থ অর্থ প্রকাশ পায়নি। কিন্তু **আহমদ রেজা খান সাহেবও অনেক আয়াতে ইনসান শব্দের অর্থ স্পষ্ট করেননি।** যদি **الْإِنْسَان** (আল-ইনসান) শব্দ দ্বারা কোন ব্যক্তি অথবা সম্প্রদায় বুঝায় সেটা কুরআন শরীফের অনুবাদে প্রকাশ করতে হয় তাহলে কেন নিচের আয়াতগুলোতে আহমদ রেজা খান সাহেব **الْإِنْسَان** শব্দের অর্থ মানুষ লিখলেন? অথচ এসব আয়াতে **الْإِنْسَان** দ্বারা কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে। নিচে কানযুল ঈমান থেকে এসব আয়াতের অনুবাদ দেয়া হল :

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا এবং **মানুষ** বলবে 'সেটার কি হয়েছে?' (সূরা যিলযাল, আয়াত ৩, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১০৯২)

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

-হে মানুষ! তোমাদেরকে কোন জিনিষ ভুলিয়ে রেখেছে আপন করুণাময় প্রতিপালক থেকে । (সূরা ইনফিতার, আয়াত ৬, কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১০৬৩)

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ -**মানুষ নিহত হোক**! সে কেমন অকৃতজ্ঞ! (সূরা আবাসা, আয়াত ১৭, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১০৬০)

উপরোক্ত আয়াতসমূহে الْإِنْسَان **তথা মানুষ দ্বারা কাফিরদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথচ আহমদ রেজা খান সাহেব শুধু 'মানুষ' লিখেই ক্ষান্ত হলেন।** সুতরাং রেজাখানীদের মূলনীতি অনুযায়ী তাদের ইমাম আহমদ রেজাখানের এই অনুবাদও ভুল এবং ভ্রান্ত।

আরো কয়েকটি আয়াত যেখানে আহমদ রেজা খান সাহেব 'আল ইনসান' শব্দের মর্মার্থ না লিখে 'মানুষ'ই লিখেছেন :

أَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ -**কিন্তু মানুষ** তো যখন তাকে তার প্রতিপালক পরীক্ষা করবেন। (সূরা ফজর, আয়াত ১৫, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান পৃষ্ঠা ১০৭৭)

উক্ত আয়াতে 'ইনসান' শব্দের দ্বারা উমাইয়া ইবনে খালফকে বুঝানো হয়েছে।

هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ -নিশ্চয়ই **মানুষের উপর** এক সময় এমনও অতিবাহিত হয়েছে যে, কোথাও তার নাম পর্যন্ত ছিল না। (সূরা দহর, আয়াত ১, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান পৃষ্ঠা ১০৪৫)

وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ -কিন্তু **মানুষ** তা বহন করল। (সূরা আহযাব, আয়াত ৭২, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান পৃষ্ঠা ৭৭২)

উপরোক্ত দুই আয়াতে মানুষ দ্বারা হযরত আদম (আ.) কে বুঝানো হয়েছে। আহমদ রেজা খান সাহেব শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে মুবহাম বা অস্পষ্ট **'ইনসান'** শব্দের ফাসাহাত বালাগাতকে উপেক্ষা করে স্পষ্ট অনুবাদ লিখে তার চিন্তাধারা অনুযায়ী যথার্থ অর্থ বা শান প্রকাশ করলেন। পক্ষান্তরে **মানবজাতির পিতা, প্রথম নবী হযরত আদম (আ.) এর উদ্দেশ্যে যেখানে 'ইনসান' বলা হয়েছে তা স্পষ্ট না করে অস্পষ্ট রেখে তাঁর মর্যাদাকে কি গোপন রাখলেন ?**

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইয়াহুদী আলিমদের যে সতর্ক বাণী দিয়েছেন রেজাখানীদেরকে সে আয়াত পড়ে সতর্ক হওয়া উচিৎ-

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ،

অনুবাদ : তোমরা কি মানুষকে সৎকর্মের নির্দেশ দিচ্ছ এবং নিজেদের আত্মাগুলোকে ভুলে বসেছ? অথচ তোমরা কিতাব পড়ছ তবুও কি তোমাদের বিবেক নেই ? (সূরা বাকারা, আয়াত ৪৪)

রেজাখানীদের ভ্রান্ত মূলনীতির শিকার রেজাখানীরাই

কুরআনে কারীমে অনেক শব্দ ও বাক্য রয়েছে যেগুলো মুবহাম বা অস্পষ্ট। আর এ গুলোকে অস্পষ্টরূপে বর্ণনা করার অনেক কারণও রয়েছে যা 'আল-ইতকান ফি উলুমিল কুরআন'সহ অন্যান্য কিতাবসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। **সূরা আর-রাহমান-এ বর্ণিত আল ইনসান শব্দকে আহমদ রেজাখান সাহেব মুবহাম বা অস্পষ্ট ধরে নিয়েছেন। তিনি এর স্পষ্ট অর্থ লেখতে গিয়ে অনুবাদ করেন- 'মানবতার প্রাণপুরুষ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম'** আর কানযুল ঈমানের ভূমিকায় এ অনুবাদকে রেজাখানের একটি কৃতিত্ব বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

এখন আমাদের প্রশ্ন হল কুরআনে উল্লেখিত মুবহাম শব্দ অথবা বাক্যের অর্থ স্পষ্ট করে অনুবাদ করা যদি জরুরি হয় তাহলে নিম্নলিখিত আয়াতসমূহের অনুবাদ তারা স্পষ্ট করেননি কেন? উদাহরণ স্বরূপ কানযুল ঈমান থেকে কয়েকটি অনুবাদ উল্লেখ করা হল-

১. এবং যখন তোমরা একটা **খুন সংঘটিত করেছিলে** (কানযুল ঈমান, সূরা বাকারা, আয়াত ৭২)
২. এবং প্রেরণ করো তাদের মধ্যে **একজন রসূল** তাদেরই মধ্য থকে (কানযুল ঈমান, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৯)
৩. এবং সেই দ্বীন সম্পর্কে ওসীয়ত করেছিলো ইব্রাহীম **স্বীয় পুত্রদেরকে** এবং য়া'কুবও। (কানযুল ঈমান, সূরা বাকারা, আয়াত ১৩২)
৪. এবং কোন **মানুষ** এমনও আছে । (কানযুল ঈমান, সূরা বাকারা, আয়াত ২০৪)
৫. যখন (তারা) তাদের একজন **পয়গাম্বরকে** বলেছিল। (কানযুল ঈমান, সূরা বাকারা, আয়াত ২৪৬)
৬. যখন **আপন সঙ্গীকে** ফরমাচ্ছিলেন (কানযুল ঈমান, সূরা তাওবা, আয়াত ৪০)

এখানে প্রথম আয়াতে উল্লেখিত **নিহত ব্যক্তির নাম ছিল আ'মিল**। দ্বিতীয় আয়াতে **একজন রসূল বলতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বুঝানো**

হয়েছে। তৃতীয় আয়াতে **স্বীয় পুত্রদের দ্বারা বুঝানো হয়েছে ইসমাঈল, ইসহাক, মা'দিয়ান, যুমরান, কাইসান, নফশান প্রমুখ**। চতুর্থ আয়াতে **কোন মানুষ দ্বারা আখনশ বিন শরীককে বুঝানো হয়েছে**। পঞ্চম আয়াতে তাদের **একজন নবী দ্বারা শামাউন অথবা শামউন অথবা ইউশা (আ.)-কে বুঝানো হয়েছে**। ষষ্ঠ আয়াতে **আপন সঙ্গী দ্বারা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বুঝানো হয়েছে**।

রেজাখানীরা অন্যান্য অনুবাদকের ভুল ধরার উদ্দেশ্যে এক দুটি আয়াতের মুবহাম বা অস্পষ্ট শব্দের স্পষ্ট অনুবাদ করে কৃতিত্বের দাবি করে থাকলেও অগণিত আয়াতে অস্পষ্টতা দূর করা হয়নি। পূর্বোক্ত আয়াতসমূহ এর অন্যতম প্রমাণ। এরূপ অনুবাদ আরো অগণিত আয়াতে রয়েছে। সুতরাং তাদের মূলনীতি অনুযায়ী তাদের নিজেদের অনুবাদসমূহেও ভুল রয়েছে।

রেজাখানীরা কি বাতিল ফিরকার অনুরূপ আকীদা পোষণ করেন?

কানযুল ঈমানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় আল কুরআনুল করীমের অনুবাদ শব্দগত না তাফসীর সম্মত হওয়া চাই এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে- যদি কুরআনুল করীম নিছক শব্দগত অনুবাদ করা হয়, তবে তা থেকে বহু ধরণের অসুবিধা সৃষ্টি হয়। কখনো আল্লাহর শানে বেয়াদবী হয়, কখনো নবীগণের শানে, কখনো ইসলামের বুনিয়াদী আকীদা আহত হয়। অর্থ্যাৎ **তাদের দৃষ্টিতে শাব্দিক তরজমার দ্বারাই আকীদা নির্দিষ্ট হয়**। তাদের এ নীতি অনুসরণ করলে তাদের বাতিল ফিরকার অনুরূপ আকীদা পোষণ আবশ্যক হয়ে পড়ে।

প্রথমত : দেখুন দুটি আয়াতের অনুবাদ :

يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (فتح: ١٠)

অর্থ : তাদের হাতগুলোর উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। (সূরা ফাতহ, আয়াত ১০, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৯১৪)

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (القيامة : ٢٢–٢٣)

অর্থ : কিছু মুখমণ্ডল সেদিন তরুতাজা হবে। আপন প্রতিপালককে দেখবে। (সূরা কিয়ামাহ, আয়াত ২২-২৩, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১০৪৪)

সকল ঈমানদারের জানা আছে যে, আল্লাহ তাআলা চেহারা, হাত ইত্যাদি থেকে

পবিত্র। অথচ উপরে বর্ণিত কানযুল ঈমানের উল্লেখিত দুটি আয়াতের শব্দগত অনুবাদ দ্বারা আল্লাহর হাত ও চেহারার অস্তিত্ব প্রমাণিত হচ্ছে। এ ধরনের **আয়াতের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে বাতিলপন্থী মুজাস্‌সিমাগণ এ আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহর আকার রয়েছে।**

রেজাখানীরা নিছক শব্দগত অনুবাদের বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও কানযুল ঈমানে এরূপ শাব্দিক অনুবাদ করা হলো কেন? আর অনুবাদই যদি মূলকথা হয় তবে এর দ্বারা তাদের আকীদা কাদের অনুরূপ হলো?

দ্বিতীয়ত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে ইন্তেকাল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসলিম শরীফ)

অন্য হাদীসে আছে, যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। (মুসলিম)

এ রকম **হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে মুরজিয়া নামক বাতিল ফিরকার অনুসারীরা বলে থাকে যে, কেবল ঈমানই নাজাতের জন্য যথেষ্ট, আমলের প্রয়োজন নেই।**

তৃতীয়ত : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার অত্যাচার থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম)

অন্য হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ব্যভিচারী ব্যক্তি ব্যভিচারে লিপ্ত থাকা অবস্থায় মুমিন থাকে না, চুরি করার সময় চোরও ঈমানদার থাকে না। (মুসলিম)

অপর একটি হাদীসে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুটি স্বভাব মানুষের মধ্যে রয়েছে যা কুফর বলে গণ্য : (ক) বংশের প্রতি কটাক্ষ করা (খ) মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করা। (মুসলিম)

অন্য হাদীসে আছে, যে দাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেল সে কুফরী করল, যতক্ষণ না সে ফিরে আসে। (মুসলিম)

এ ধরনের **হাদীসসমূহের বাহ্যিক অর্থের উপর নির্ভর করে খারিজীরা বলে থাকে যে, কবীরা গুনাহগার ঈমানদার নয়।**

সারকথা হলো, **বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসের বাহ্যিক অর্থের উপর ভিত্তি করে খারিজী, রাফিজী, মু'তাযিলা, মুরজিয়াসহ বিভিন্ন বাতিল ফিরকা নানা বাতিল আকীদা পোষণ করে থাকে। তাহলে রেজাখানীদের অবস্থাও কি অনুরূপ?** তারা কি নিজেদের কৃত অনুবাদের অনুরূপ আকীদা পোষণ করে অর্থাৎ বাতিল ফিরকার মতো আকীদা পোষণ করে ?

কয়েকটি হাদীসের অনুবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন

কুরআন হল **وحى متلو** আর হাদীস হল **وحى غير متلو** তাই হাদীসের অনুবাদেও রেজাখানীদের উল্লেখিত মূলনীতি অনুসরন একান্ত আবশ্যক। অথচ দেখা যায় হাদীসের অনুবাদে তারা তা অনুসরণ করেননি। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসের মধ্যে রয়েছে যে, কুরাইশ বংশের লোকেরা তাদের এক সম্ভ্রান্ত মহিলার চুরির ব্যপারে সুপারিশের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে এসেছিল। জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ববর্তী উম্মতদের ধ্বংসের কারণ উল্লেখ করে বলেন, তারা দূর্বলদের শাস্তি দিত এবং সম্ভ্রান্তদের ছেড়ে দিত। শাস্তির ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ، (متفق عليه)

অর্থ্যাৎ যদি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর মেয়ে ফাতিমাও (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা) চুরি করে থাকতেন তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম।

রেজাখানীদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নইমী সাহেবের লিখিত মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ মিরআত কিতাবে উক্ত হাদীসের অনুবাদ এসেছে এভাবে-

اگر محمد مصطفیٰ کی دختر فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اسکی بھی ہاتھ کاٹ دیتا -(مرآت المناجیح شرح مشکوۃ المصابیح ـ جلد ۵ ـ صفحہ ۳۱۱)

অর্থ: যদি মুহাম্মদ মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেয়ে ফাতিমাও চুরি করে থাকতেন, তবুও আমি তার হাত কেটে দিতাম। (মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৩১১)

কোনো ইমানদার হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর ব্যপারে এ সন্দেহ পোষণ করেন না যে তাঁর কাছ থেকে এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। রাসূল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরও এরকম কোনো সন্দেহ ছিল না। শুধুমাত্র শাস্তির গুরুত্ব প্রদানের জন্য এ কথা বলেছেন। প্রকাশ থাকে যে, **কুরআন-হাদীসে যে শব্দ যেভাবে আছে তার অনুবাদও ঠিক সেভাবেই করতে হবে। রেজাখানীরা এটাকে বেয়াদবি মনে করেন। অথচ তাদের হাকীমুল উম্মত অনুবাদের খাতিরে 'চুরি', 'হাত কাটা' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করেছেন। এটা কি তাদের ব্যাখ্যাসম্মত অনুবাদ?**

উপরোক্ত হাদীস ছাড়াও আরো অসংখ্য হাদীসের অনুবাদে রেজাখানীরা শব্দগত অনুবাদ করেছে। তাদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেবের মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ مرأة المناجيح থেকে কয়েকটি হাদীসের অনুবাদ নিম্নে উল্লেখ করা হলো। সাথে সাথে অনুবাদের উপর কিছু প্রশ্নও উত্থাপন করা হলো। যেমন এক হাদীসের অনুবাদে আছে-

روایت ہے حضرت انس سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کی خدمت میں آیا بولا : اے خلقت سے بہتر! تو رسول ﷺ نے فرمایا : یہ ابراهیم ہیں۔(باب المفاخرة والعصبیۃ)

-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খিদমতে এসে বলল, **হে সৃষ্টির সেরা!** তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমালেন, **সৃষ্টির সেরা হলেন হযরত ইবরাহীম (আ.)।** (বাবুল মুফাখারাহ ওয়াল আসাবিয়্যাহ)

উক্ত হাদীসের অনুবাদে হযরত ইবরাহীম (আ.)-কে সৃষ্টির সেরা বলা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হলো **সৃষ্টির সেরা কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নন?** রেজাখানীরা এ বিষয়ে কি আকীদা পোষণ করেন?

অন্য হাদীসের অনুবাদে রয়েছে-

روایت ہے حضرت مطرف بن عبد اللہ بن شخیر سے فرماتے ہیں کہ میں بنی عامر کی وفد میں بنی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ ہمارے سید ہیں۔ فرمایا: سید تو اللہ ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ آپ ہم سے ہیں بڑی بزرگی والے اور بڑی عطاوالے ہیں۔ تو فرمایا کہ اپنی یہی بات یا بعض بات کہو اور تم کو شیطان بے باک نہ کردے۔(مرأۃ المناجیح۔ جلد٦۔ صفحہ۳۸۱)

-হযরত মুতার্‌রিফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শাখীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি

বলেন, আমি বনী আমির এর প্রতিনিধিদলের সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে হাযির হলাম। আমরা বললাম, **আপনি আমাদের সায়্যিদ। তখন তিনি বললেন, সায়্যিদ তো আল্লাহ**। আমরা বললাম, আপনি আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদান ও সবচেয়ে দানশীল। তখন তিনি বললেন, তোমরা একথা বলো অথবা এর মধ্যে কিছু কথা বলো। আর তোমাদেরকে শয়তান যেন বেবাক করে না দেয়। (মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৮১)

এখানে রয়েছে যে, **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে 'সায়্যিদ' না বলে আল্লাহকে 'সায়্যিদ' বলতে বলেছেন। তাহলে রাসূলের শানে আমরা যে 'সায়্যিদ' শব্দ ব্যবহার করি তা ব্যবহার করা কি সঠিক?** যদি সঠিক না হয় তাহলে দুরূদ শরীফে যে **اللّٰهم صلِّ علي سيدنا محمد** পড়া হয় এ ব্যাপারে কি কোনো সমাধান এ অনুবাদে আছে?

অন্য হাদীসে আছে, যখন **وانذر عشيرتك الاقربين** আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে বলেছিলেন-

اے فاطمہ اپنی جان کو آگ سے بچالو۔ کہ میں اللہ کے مقابل تمہارے لئے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ سواء اس کے کہ تم سے رشتہ داری ہے۔ جس کی تری کو میں تر رکھوں گا۔(مرآۃ المناجیح، جلد ۷، صفحہ ۱۸۱)

-হে ফাতিমা! নিজেকে আগুন থেকে বাঁচাও। কেননা আল্লাহর মোকাবিলায় তোমার জন্য কোনো কিছুর মালিক আমি নই। তবে তোমাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে যা আমি সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব। (মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১৮১)

উক্ত হাদীসের অনুবাদ থেকে বুঝা যায় যে **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (কিয়ামতের দিন) ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর কোনো উপকার করতে পারবেন না। প্রশ্ন হলো, এ অনুবাদ অনুযায়ীই কি রেজাখানীরা আকীদা পোষণ করেন?**

আরেকটি হাদীসের অনুবাদে রয়েছে-

روایت ہے انس سے ، فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ ﷺ نے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہ کہا سوائے تین جھوے کے۔(مرآۃ المناجیح، جلد ۷، صفحہ ۵۶۷)

-হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইবরাহীম (আ.) কখনো মিথ্যা বলেননি কেবল তিনটি মিথ্যা ছাড়া। (মিরআত শরহে মিশকাত, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৫৬৭)

এখানে ইবরাহীম (আ.) এর তিনটি মিথ্যা কথা বলার উল্লেখ রয়েছে। **এ অনুবাদের উপর ভিত্তি করেই ইবরাহীম (আ.) সম্পর্কে কি অনুরূপ আকীদাই রেজাখানীরা পোষণ করেন? তাদের দৃষ্টিতে ইবরাহীম (আ.) কি মা'সুম নন?**

এখানে কয়েকটি প্রশ্ন রাখা হলো মাত্র। এ থেকে রেজাখানীরা সিদ্ধান্ত নেবেন যে অনুবাদের উপর ভিত্তি করে কারো উপর ফতওয়া দেয়া যায় কি না?

শব্দ ব্যবহারে রেজাখানীদের সতর্কতার নমুনা

রেজাখানীরা মনে করে যে, **امی** শব্দের অর্থ নিরক্ষর লেখাটা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বেয়াদবিস্বরূপ। তাই কানযুল ঈমানের বঙ্গানুবাদে **امی** শব্দের অর্থ নিরক্ষর না লিখে তারা লিখেছেন, "পড়া বিহীন"। সংসদ অভিধানে নিরক্ষর শব্দের অর্থ- 'পড়িতে জানে না এমন'। পড়িতে জানে না এমন বা নিরক্ষর আর রেজাখানীদের কৃত "পড়া বিহীন"এর মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে তা বিজ্ঞ পাঠকগণ বিবেচনা করবেন।

امی শব্দের অনুবাদ এক শব্দের দ্বারা করতে রেজাখানীরা অপারগ হলে অথবা একে বেয়াদবি মনে করলে, 'পড়িতে পারেন না' এমন শব্দ দ্বারা অনুবাদ করলে হয়তো নিরাপদ হতো। কারণ, 'পড়া বিহীন' শব্দের অর্থ একাধিক হতে পারে। যেমন, একটি অর্থ হতে পারে- যা পাঠ করা হয়নি। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে (যেটি রেজাখানীরা মনে করেন) 'যিনি পাঠ করতে পারেন না।'

রেজাখানীদের এ ব্যাপারটা এক আহম্মক হিন্দু মহিলার ঘটনার সাথে তুলনা করা যায়। ঘটনাটি হলো- মহিলাটির স্বামীর নাম ছিল ছত্রিশ। মহিলাটি মনে করে স্বামীর নাম উচ্চারণ করলে শাস্ত্রের বিধানে মহাপাপ হবে। তাই কেউ তাকে তার স্বামীর নাম জিজ্ঞেস করলে সে পাপ মনে করে স্বামীর নাম হুবহু ছত্রিশ উচ্চারণ না করে উত্তরে বলত এক কুড়ি ষোল (২০+১৬ = ৩৬)।

জানা উচিত, স্থান কাল পাত্র ভেদে একই শব্দের অর্থ বা হুকুম ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমন, অহংকারী, দাম্ভিক, পথভ্রষ্টকারী ইত্যাদি শব্দ আশরাফুল মাখলুকাত মানুষের বেলায় দোষ বা ত্রুটিস্বরূপ। পক্ষান্তরে এ শব্দগুলো আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীনের গুণবাচক নাম। যেমন- সূরা হাশরের ২৩ নং আয়াতে আল্লাহ নিজেই নিজেকে মুতাকাব্বির (অহংকারী) বলেছেন। কানযুল ইমানে উক্ত আয়াতের অনুবাদে মুতাকাব্বির অর্থ দম্ভশীল লেখা হয়েছে। মূল কানযুল ইমানে লেখা হয়েছে تکبر والا । সূরা শূরার ৪৪ নং আয়াতে লেখা হয়েছে “এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন আল্লাহর মোকাবিলায় তার কোনো বন্ধু নেই”। (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৮৭২) । আল্লাহর ক্ষেত্রে এসকল শব্দের মূল মর্মার্থ কী তা তাফসীরের কিতাবগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সে আলোচনায় আমরা যাচ্ছি না।

একইভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানেও অনুরূপ কিছু শব্দ গুণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে দোষ বা ত্রুটিস্বরূপ। যেমন, উম্মী বা নিরক্ষর শব্দ। কেউ পড়া-লেখা না জনলে তাকে উম্মী বা নিরক্ষর বলা হয়ে থাকে। এটি ব্যক্তির কোনো সিফাত বা গুণ নয়। কিন্তু উম্মী বা নিরক্ষর হওয়া রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বিশেষ সিফত এবং মু’জিযা। হযরত শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু’জিযার আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, **“রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য উম্মী হওয়া একটি মু’জিযা।”** তিনি আরো বলেন, **“রাসূলে পাক (সা.) এর নবুয়াতের একটি প্রমাণ হলো, তিনি উম্মী ছিলেন। লেখা-পড়া জানতেন না।”** (মাদারিজুন নবুয়াত, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩১৬)

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল, উম্মী শব্দটি আরবি ভাষায়ও প্রশংসনীয় কোনো গুণ নয়। আরবী ভাষায় কাউকে উম্মী বললে সে মনক্ষুন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে উম্মী শব্দটি তার বিশেষ গুণ ও মু’জিযা। এমনকি আরব দেশীয় সুন্নী উলামাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে উম্মী নবী বলার দ্বারা মানহানি হয় এমন কোনো মন্তব্য করেননি। যদিও সর্বসাধারণের ক্ষেত্রে তা মানহানিকর। যেখানে উম্মী হওয়া রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু’জিযা সেখানে এ শব্দের অনুবাদ করতে

গিয়ে যদি মূল অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে করা হয়, তাহলে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি বিশেষ মু’জিযাকে অস্বীকার করা হল। অর্থাৎ **যারা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিরক্ষরতাকে অস্বীকার করল, তারা পরোক্ষভাবে তাঁর একটি মু’জিযাকে অস্বীকার করল।**

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কানযুল ঈমান এর বঙ্গানুবাদে উম্মী শব্দের অর্থ নিরক্ষর না লিখে “পড়া বিহীন” শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। আর যারা নিরক্ষর অর্থে অনুবাদ করেছেন তাদের কটাক্ষ করা হয়েছে। অথচ ‘নিরক্ষর’ ও ‘পড়া বিহীন’ শব্দের মধ্যে কি এমন পার্থক্য রয়েছে যে, তারা ‘পড়া বিহীন’ শব্দ ব্যবহারকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে মার্যাদাপূর্ণ মনে করে থাকেন। এ ব্যাপারটি আমাদের কাছে বোধ্যগম্য নয়। এছাড়া ‘পড়া বিহীন’ শব্দটি বাংলা ভাষায় আদৌ ব্যবহার হয় কিনা এবং তা ব্যাকরণগত দিক থেকে সিদ্ধ কিনা তাও বিবেচনার বিষয়। ভাষাবিদ ও মুহাক্কিক আলিমগণ তা বিবেচনা করবেন।

রেজাখানীদের নিজস্ব মূলনীতি অনুযায়ী পরস্পরবিরোধী কিছু অনুবাদ

বাংলাদেশী রেজাখানীদের ভাষ্যকার অধ্যক্ষ হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল জলিল সাহেবের লিখিত ‘হায়াত মউত কবর হাশর’ পুস্তকে শাফায়াতে কুবরা অধ্যায়ের একটি হাদীসাংশের অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হল:

فيأتون ابراهيم فيقول انى لست هناكم - ويذكر ثلث كذبات كذ بهن-

অনুবাদ: (হাশরের দিন) অত:পর লোকেরা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কাছে গমন করে সুপারিশের দরখাস্ত করবে। তিনি বলবেন আমি বর্তমানে ঐ পজিশনে নেই যে, তোমাদের জন্য সুপারিশ করব। **একথা বলে তিনি বাহ্যিক দৃষ্টিতে তিনটি অনুত্তম কাজের কথা স্মরণ করবেন।** (হায়াত মউত কবর হাশর, পৃষ্ঠা ২৮৩)

অথচ তাদেরই হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমী অনুরূপ একটি হাদীসের অনুবাদ করেছেন নিম্নরূপ:

الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب ابراهيم الا ثلث كذبات،

ترجمہ: فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراھیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہ کھا سواء تین جھوٹ۔

অনুবাদ : **রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ইবরাহীম (আ.) তিনটি মিথ্যা ব্যতিত কখনও মিথ্যা বলেননি।**

এখানে আব্দুল জলিল সাহেব كذبات **এর অর্থ করেছেন ‘অনুত্তম’ শব্দ দ্বারা। আর আহমদ ইয়ার খান নইমী অনুবাদ করেছেন ‘মিথ্যা’ শব্দ দ্বারা। আব্দুল জলীল সাহেবের দৃষ্টিতে তা কি বেয়াদবি নয়?**

রেজাখানীদের দৃষ্টিতে আহমদ ইয়ার খানের উক্ত অনুবাদ বেয়াদবিমূলক। আর হযরত ইবরাহীম (আ.) এর শানে এরূপ বেয়াদবিমূলক অনুবাদ জঘন্য অপরাধ। আব্দুল জলিল সাহেবসহ তাদের সকলের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমী যখন তাদের অনুবাদের নীতিমালার কাছে ধরাশায়ী, তখন তাদের অন্যান্য আলিমের অবস্থা কী হবে? এখন আমাদের প্রশ্ন হল, কার অনুবাদ সঠিক? **আব্দুল করিম গং রেজাখানীদের এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে হয়তো তারা জবাব দেবে, আমাদের তাফসীর মার্কা অনুবাদের মূলনীতি অন্যদেরকে ঠেকানোর জন্য, প্রয়োজনে মুলনীতি পরিবর্তন করে হাকীমুল উম্মতকে রক্ষা করবো।**

অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল পূর্বোক্ত হাদীসটিতে অনুবাদের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করে দিতে চাইলেও পরবর্তীতে তা পারেননি। তার ‘হায়াত মউত কবর হাশর’ পুস্তকে ‘ইছালে ছওয়াব’ অধ্যায়ে আয়াতুল কুরসী পাঠ করে কবরবাসীদের ইছালে ছওয়াব করার ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীস অনুবাদ করেছেন নিম্নরূপ-

واعطى الله القارئ ثواب ستين نبيا ،

অনুবাদ: আল্লাহ তিলাওয়াতকারীকে ৬০ জন নবীর সমান ছওয়াব দান করেন (হায়াত মউত কবর হাশর, পৃষ্ঠা ৩৯)

উক্ত পুস্তকে ‘হিসাব নিকাশ’ অধ্যায়ের আরো একটি হাদীছের অনুবাদ নিম্নে পেশ করা হলো:

وقد نقل: لوان رجلا له ثواب سبعين نبيا ، وله خصم بنصف دانق لم يدخل الجنة حتى يرضى خصمه ،

অনুবাদ : বর্ণিত আছে কোনো ব্যক্তির যদি সত্তর জন নবীর সমপরিমান সওয়াবও থাকে, আর তার প্রতিপক্ষের প্রতি যদি অর্ধ দানা পরিমান যুলুম করা হয়, তবে যে পর্যন্ত প্রতিপক্ষ রাজী না হবে, সে পর্যন্ত সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (হায়াত মউত কবর হাশর, পৃষ্ঠা ৩৩৫)

উপরোক্ত হাদীস শরীফ দুটির কোনো ব্যাখ্যামূলক অনুবাদই করা হয়নি। অথচ উভয় হাদীসেই এমন বর্ণনা রয়েছে যা অন্য হাদীস ও সঠিক আকীদার সাথে বিরোধপূর্ণ। আব্দুল জলিল গং রা বলে থাকেন যে, কুরআন হাদীসের অনুবাদ করতে হবে ব্যাখ্যামূলক, অথচ উক্ত হাদীস দুটির **একটিতে সাধারণ তিলাওয়াতকারীকে ৬০ জন নবীর সমান সওয়াব দেয়ার কথা বলা হয়েছে** এবং অপর হাদীসে ৭০ জন নবীর সমপরিমাণ সওয়াব থাকা সত্ত্বেও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না বলা হয়েছে। কিন্তু এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। যা বিভ্রান্তিকর। অথচ হাদীস শরীফে সাহাবায়ে কিরাম রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কে এসেছে-

لو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه ،

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি আল্লাহর রাস্তায় উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ দান করে তবে তা তাঁদের (সাহাবায়ে কিরামের) কোনো একজনের একমুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দানের সমানও হবে না।

উক্ত হাদীসে রয়েছে সাধারণ কোনো মুসলমান উহুদ পরিমাণ স্বর্ণ দান করলেও কোনো এক সাহাবীর এক মুদ বা অর্ধ মুদ পরিমাণ দানের সমান সওয়াব অর্জন করতে পারবে না। এ হাদীসটি পূর্বের হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক। অনুবাদের মাধ্যমে এর সমাধান করা হয়নি আবার কোনো ব্যাখ্যাওতো দেয়া হয়নি।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারের ভিন্নতা : একটি প্রশ্ন

রেজাখানীরা দাবি করেন যে কানযুল ঈমানের অনুবাদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ক্ষেত্রে যথাযথ সম্মান ও আদব বজায় রাখা হয়েছে। আবার তারা কোন শব্দ কোন স্থানে কি জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একথা বিবেচনা না করে অন্যান্য মাশায়িখগণকে ‘বেয়াদব’ বলার চেষ্টা করে। তারা নিশ্চয় জানে, বাংলা ভাষায় তুচ্ছার্থে ‘তুই’, সমমর্যাদার ক্ষেত্রে ‘তুমি’ এবং সম্মানিত ব্যক্তিকে ‘আপনি’ বলা হয়ে থাকে। অথচ **কানযুল ঈমানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ব্যাপারে লিখা হয়েছে-**

- **আপনি** কি দেখেননি? (সূরা মা’উন, আয়াত ১)
- আচ্ছা **দেখুন** তো (সূরা কাওছার, আয়াত ৩)

- নিশ্চই যে **আপনার** শত্রু (সূরা কাফীরুন, আয়াত ১)
- **আপনি** বলুন ইত্যাদি। (সূরা ইখলাস, আয়াত ১)

পক্ষান্তরে আল্লাহ তাআলার শানে লিখা হয়েছে-

- নিশ্চয়ই **তুমি** অত্যন্ত তাওবাহ কবুলকারী। (সূরা বাক্বারা, আয়াত ১২৮)
- **তুমি** আমাদের হেদায়ত প্রদান করেছ এবং আমাদেরকে তোমার নিকট থেকে রহমত দান কর। নিশ্চয়ই **তুমি** হলে মহান দাতা। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৪)
- আমাদেরকে প্রদান কর সেটা, যা **তুমি** আমাদেরকে প্রদান করার ওয়াদা করেছ রাসূলগণের মাধ্যমে এবং আমাদেরকে কিয়ামতের দিন অপমানিত কর না। নিঃসন্দেহে **তুমি** ওয়াদা ভঙ্গ কর না। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৪)

কানযুল ইমানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে অনুবাদক বলেছেন, এ অনুবাদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে শালীনতা যথাযথভাবে রক্ষা করা হয়েছে এবং অভিযোগ করা হয়েছে যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) সহ অন্যান্য অনেক অনুবাদক ‘বেয়াদবিপূর্ণ’ ও ‘ভুল’ অনুবাদ করেছেন। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, শব্দ ব্যবহারে এতই যত্নশীল হয়ে থাকলে বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহর শানে **“তুমি”** এবং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে **“আপনি”** ব্যবহার কতটুকু যুক্তিসংগত হল? এখানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে “আপনি” এবং আল্লাহর শানে “তুমি” ব্যবহার দ্বারা কি একথা প্রমাণিত হয় না যে, **আল্লাহ পাকের চেয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মর্যাদা বেশি?** (নাউযুবিল্লাহ)

শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) সম্পর্কে রেজাখানীদের পরস্পরবিরোধী কয়েকটি বক্তব্য

আব্দুল করিম সিরাজনগরী তার ‘খারেজীদের ইতিকথা’ পুস্তিকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) সম্পর্কে লিখেছেন, “আল্লাহ পাকের দ্বিতীয় রহমত যার আগমন দিল্লিতে। তিনি ছিলেন বিশ্ব মুসলিমের অমূল্য রত্ন, বিশ্ব বিখ্যাত মুহাদ্দিস শাহ ওলীউল্লাহ (র.), যিনি খাটি তরিকাভুক্ত একজন সুন্নী পীর ছাহেব।” (খারিজীদের ইতিকথা, পৃষ্ঠা ৩০) অথচ বাংলা ‘কানযুল ঈমান’ এর ভূমিকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর যে সমালোচনা করা হয়েছে তার স্বপক্ষে তিনিও মতামত প্রদান করেছেন। আবার তার গুরু অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল তার লিখিত “হায়াত মউত কবর হাশর” পুস্তকে ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) কে কটাক্ষ করে লিখেছেন, **ফাতেহা বিরোধীদের মান্যবর ইমাম শাহ ওলীউল্লাহ সাহেব** নিজেই প্রচলিত ফাতেহা অনুষ্ঠানকে জায়েয বলেছেন (হায়াত মউত কবর হাশর, পৃষ্ঠা ১৯৫)।

উল্লেখ্য **অধ্যক্ষ আব্দুল জলীল ‘হায়াত মউত কবর হাশর’ কিতাবে তার পছন্দনীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে সম্মানসূচক শব্দ যেমন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু, রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ইত্যাদি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র.) এর নামের সাথে কোথাও এরকম সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করেননি।** অথচ উক্ত বইয়ে একাধারে তার খলীফা, ছাত্র ও সন্তান শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) কে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন।

রেজাখানীদের প্রকৃত কাজই হল স্বার্থপরতা ও বেয়াদবি। যখন আহমদ রেজা খানের কোনো উচ্চস্তরের উস্তাদের উল্লেখের প্রয়োজন হল তখন ‘জীবন ও কারামত’ বইয়ে রেজাখানীরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) কে আহমদ রেজা খানের দাদা উস্তাদ প্রমান করলেন, আবার ‘কানযুল ঈমান’ এর ভূমিকায় শাহ ওলীউল্লা্হ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর সাথে চরম বেয়াদবি করলেন। এমনকি অভিযোগ করলেন যে, তিনি নাকি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে আদব রক্ষা করতে পারেননি, তিনি ইসলামী আকীদাকে আহত করেছেন এবং তিনি কুরআনের মাহাত্ম্য বুঝতে সক্ষম হননি। পূর্বের আলোচনায় এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে হলে বাংলা কানযুল ঈমান এর ভূমিকা দেখুন।

নিজেদের বক্তব্যে রেজাখানীরা ওহাবী

আহমদ রেজাখান তার ‘হায়াতুল মাওয়াত’ কিতাবের ১৭৬ পৃষ্ঠায় ফজলে রাসূল বাদায়ূনীকে ‘সাইফুল্লাহিল মাসলূল– আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারি’ বলে আখ্যায়িত করেছেন। **ফজলে রাসূলে বাদায়ূনী হলেন আলে রাসূল মারহারাভী এর খলীফা ও আহমদ রেজা খান সাহেবের পীর ভাই।** উক্ত ফজলে রাসূল বাদায়ূনী

লিখেছেন-

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہابیت کا بیج بونے والا اور شاہ عبد العزیز دہلوی وہابیت میں پانی دینے والا

اور محمد اسماعیل وہابیت پہیلانے والا ہے (بوارق محمدیۃ۔ ص ۴۲)

অর্থাৎ **শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ওহাবিয়্যাতের বীজ বপনকারী, শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী ওহাবিয়্যাতের মধ্যে পানি সেচ দানকারী আর মুহাম্মদ ইসমাইল ওয়াবিয়্যাতের প্রচারকারী।** (বাওয়ারিকে মুহাম্মদিয়া, পৃষ্ঠা ৪২)

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, আহমদ রেজাখান সাহেবের হাদীসের সিলসিলার মধ্যে শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) রয়েছেন। আবার আব্দুল করীম সিরাজনগরী তার হক সিলসিলায় আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর নাম উল্লেখ করেছেন। (ইজহারে হক্ব, পৃষ্ঠা ১৯৮)। অন্যদিকে আহমদ রেজাখান সাহেব যাকে 'আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারী' বলছেন সেই ফজলে রাসূল বাদায়ূনী শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভীকে ওহাবিয়্যাতের মধ্যে পানি সেচদানকারী বলেছেন। অর্থাৎ তার মতে তিনি ওহাবী। আর আব্দুল আযীয দেহলভী (র.) ওহাবী হলে আব্দুল করিম গং রেজাখানীরাও ওহাবী।

দ্বিতীয়ত : রেজাখানীরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (র.) এর ভুল ধরলেও তার সন্তান ও খলীফা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.)-কে তের শতকের মুজাদ্দিদ বলেছেন। আর **যিনি একজন মুজাদ্দিদকে ওহাবী বলেছেন তাকে 'আল্লাহর উন্মুক্ত তরবারী' বলে মূলত আহমদ রেজা খান সাহেব তার কথাকেই সমর্থন করেছেন। অর্থাৎ আহমদ রেজা খান সাহেবের মতেও শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) হলেন ওহাবী এবং তারা নিজেরা ওহাবীদের অনুসারী।** দেখুন রেজাখানীরা কী জগাখিচুড়ী অবস্থা সৃষ্টি করেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর কিতাব পরিবর্তন

হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) উপমহাদেশের একজন শীর্ষস্থানীয় বুযুর্গ প্রখ্যাত ওলী-আল্লাহ ছিলেন। বাংলা ও আসামে ইসলাম প্রচারে তার অবদান উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি অনেক কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, যখীরায়ে কারামতসহ তার কোনো কোনো কিতাবের মধ্যে চক্রান্তকারীরা তাহরীফ করেছে। এমনকি আহমদ রেজা খান সাহেবও এ বিষয়টি স্বীকার করেছেন। ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ এর মধ্যে বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত মাসআলাসমূহের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে। এর মধ্যে মালাবুদ্দা মিনহু, মিফতাহুল জান্নাত ও বেহেশতী জেওর সম্পর্কে একটি প্রশ্নের উত্তরে আহমদ রেজা খান সাহেব বলেছেন-

مالابد میں بھی زیادات ہیں اور مفتاح الجنۃ تو وہابیہ کے ہاتھ میں رہی جس میں بھت کچہ اصلاح ہوئی

(فتوی رضویہ۔ ج ۱۲ ص ۲۲۱)

অর্থ : মালাবুদ্দা মিনহুর মধ্যে অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং মিফতাহুল জান্নাত ওহাবীদের হাতে রয়েছে, যার মধ্যে অনেক সংশোধন (পরিবর্তন-পরিবর্ধন) হয়েছে। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ২২১)

প্রকাশ থাকে যে, 'মিফতাহুল জান্নাত' হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর লিখিত একটি কিতাব। আর পূর্বোক্ত ফতওয়া থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, এ কিতাবের মধ্যেও পরিবর্তন হয়েছে। স্বয়ং আহমদ রেজা খান সাহেব এটি স্বীকার করেন।

'মালফুযাতে মুহাদ্দিস আনওয়ার শাহ কাশিমীরী' এর মধ্যে রয়েছে- মাওলানা হুসাইন আহমদ মদনী বলেছেন যে, তাকবিয়াতুল ঈমান'-এর মধ্যেও পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। (মালফুযাতে কাশ্মিরী, পৃষ্ঠা ২০৬)

হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর বক্তব্য বিকৃতি ও অপব্যাখ্যা

আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং রেজাখানীদের অন্যতম মারাত্মক স্বভাব হচ্ছে যে, তারা বুযুর্গদের বইয়ে যা নেই তা প্রবিষ্ট করে কিংবা কোনোভাবে তাহরীফ করত: জঘন্য মিথ্যাচারের আশ্রয় নিয়ে বুযুর্গদের বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চালায়। যেমন তারা বিশ্ববিখ্যাত ‘খুতবায়ে ইবন নাবাতা’র মধ্যে নিজস্ব মনগড়া মতবাদ প্রচারের লক্ষে হাদীসকে বিকৃত করেছে (যার নমুনা পরবর্তীতে উল্লেখ করা হয়েছে, পৃষ্ঠা---)। হাদিয়ে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর যখীরায়ে কারামতের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা তেমনি।

নামাযে ওয়াসওয়ার স্তর নিয়ে হাদীয়ে বাঙ্গাল হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) তার যখীরায়ে কারামতের ‘যীনাতুল মুছল্লী’ অংশে দীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন। রেজাখানী আব্দুল করিম সিরাজনগরী তার রচিত ‘ইজহারে হক্ব’ গ্রন্থে এর কিছু অংশ তাহরীফ করত: অপব্যাখ্যা করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন।

নামাযে রাসূল (সা.) এর ধ্যান নিয়ে অপব্যাখ্যা

রেজাখানীরা ইহুদীদের নিকৃষ্ট চরিত্র ‘তাহরীফ’ এ সিদ্ধহস্ত। তারা বিভিন্ন কিতাবের ইবারত চুরি করতে অত্যন্ত পারদর্শী। এর ভুরি ভুরি প্রমাণ রয়েছে। যখীরায়ে কারামতের অনুবাদেও তারা তাহরীফ করেছে। নিম্নে ‘যখীরায়ে কারামত’ এর মূল বক্তব্য তুলে ধরা হলো। পাশাপাশি এর পাতাও স্ক্যান করে দেয়া হলো। পাঠক মিলিয়ে দেখুন যে তাদের কথার সাথে মূল ‘যখীরায়ে কারামত’ এর কতটুকু মিল রয়েছে।

যখীরায়ে কারামতের মূল বক্তব্য

“অন্ধকারের মধ্যেও যেমন কম বেশি পার্থক্য থাকে ওয়াসওয়াসায়ও অল্প খারাপ ও বেশি খারাপের পার্থক্য রয়েছে। যেমন ব্যভিচারের ওয়াসওয়াসা হতে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলনের ধ্যান কিছুটা ভাল। ইচ্ছা করে নামাযের মধ্যে নিজের পীরের ধ্যান করা এবং এমনি ধরনের কোনো বুযুর্গের খেয়াল করা ও নিজের অন্তরকে ঐ দিকে ধাবিত করা গরু-মহিষের কথা ভাবার চেয়েও বেশি খারাপ। এমনকি ঐ স্থানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধ্যান ও খেয়াল করাও কাজের কথা নয়।” (যখীরায়ে কারামত, পৃষ্ঠা ২৩১)

দেখুন যখীরায়ে কারামতের মূল ভাষ্য (উর্দু)

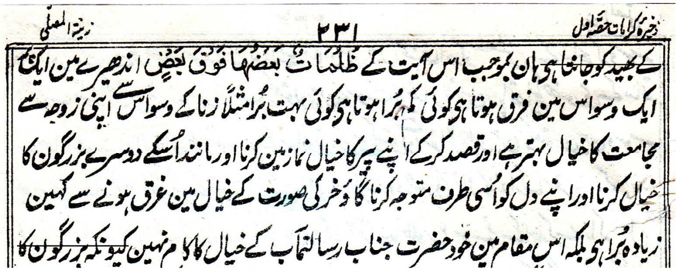

ذخیرۂ کرامات حصۂ اول ۲۳۱ زینۃ المصلی

کے بھید کو جانتا ہی ہان بموجب اس آیت کے ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اندھیرے مین ایک
ایک وسواس مین فرق ہوتا ہی کوئی کم بُرا ہوتا ہی کوئی بہت بُرا مثلاً زنا کے وسواس سے اپنی زوجہ سے
مجامعت کا خیال بہتر ہے اور قصد کر کے اپنے پیر کا خیال نماز مین کرنا اور مانند اُسکے دوسرے بزرگون کا
خیال کرنا اور اپنے دل کو اُسی طرف متوجہ کرنا گاؤ خر کی صورت کے خیال مین غرق ہونے سے کہین
زیادہ بُرا ہی بلکہ اس مقام مین خود حضرت جناب رسالتمآب کے خیال کا کام نہین کیونکہ بزرگون کا

যখীরায়ে কারামত (উর্দূ), প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা ২৩১

যখীরায়ে কারামত এর বাংলা অনুবাদ

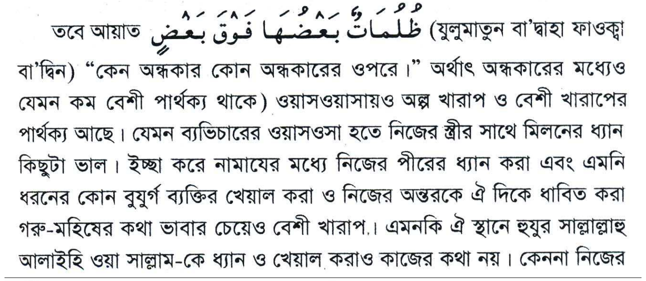

তবে আয়াত ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ (যুলুমাতুন বা’দ্বাহা ফাওক্বা বা’দ্বিন) “কেন অন্ধকার কোন অন্ধকারের ওপরে।” অর্থাৎ অন্ধকারের মধ্যেও যেমন কম বেশী পার্থক্য থাকে) ওয়াসওয়াসায়ও অল্প খারাপ ও বেশী খারাপের পার্থক্য আছে। যেমন ব্যভিচারের ওয়াসওসা হতে নিজের স্ত্রীর সাথে মিলনের ধ্যান কিছুটা ভাল। ইচ্ছা করে নামাযের মধ্যে নিজের পীরের ধ্যান করা এবং এমনি ধরনের কোন বুযুর্গ ব্যক্তির খেয়াল করা ও নিজের অন্তরকে ঐ দিকে ধাবিত করা গরু-মহিষের কথা ভাবার চেয়েও বেশী খারাপ.। এমনকি ঐ স্থানে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ধ্যান ও খেয়াল করাও কাজের কথা নয়। কেননা নিজের

যখীরায়ে কারামত, বাংলা অনুবাদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৯

আব্দুল করিম সিরাজনগরীর পরিবর্তন করা বক্তব্য (যা আসলে যখীরায়ে কারামতে নেই)

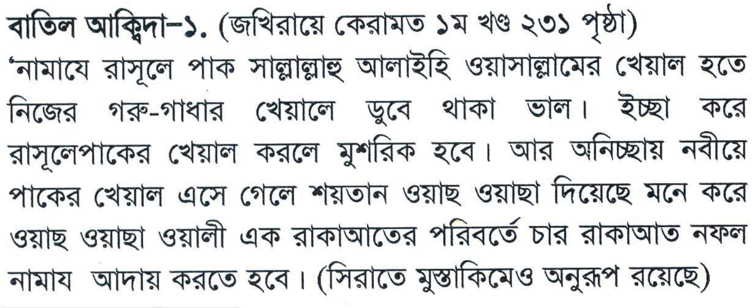

বাতিল আক্বিদা–১. (জখিরায়ে কেরামত ১ম খণ্ড ২৩১ পৃষ্ঠা)
‘নামাযে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেয়াল হতে নিজের গরু-গাধার খেয়ালে ডুবে থাকা ভাল। ইচ্ছা করে রাসূলেপাকের খেয়াল করলে মুশরিক হবে। আর অনিচ্ছায় নবীয়ে পাকের খেয়াল এসে গেলে শয়তান ওয়াছ ওয়াছা দিয়েছে মনে করে ওয়াছ ওয়াছা ওয়ালী এক রাকাআতের পরিবর্তে চার রাকাআত নফল নামায আদায় করতে হবে। (সিরাতে মুস্তাকিমেও অনুরূপ রয়েছে)

ইজহারে হক্ব, পৃষ্ঠা : ১৪৪

এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রেজাখানীরা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর ভাষ্যকে বিকৃত করে উপস্থাপন করেছে। মূল যখীরায়ে কারামত ও আব্দুল

করিম সিরাজনগরীর দেয়া উদ্ধৃতি তুলনা করে পাঠকগণই বিবেচনা করুন, হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) কী নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গরু গাধার সাথে (নাউযুবিল্লাহ) তুলনা করেছেন না আব্দুল করীমরা আল্লাহর ওলীকে বিতর্কিত করার জন্য নিজেরাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গরু গাধার সাথে তুলনা করেছে? (নাউযুবিল্লাহ)

কোনো কোনো আলিম দাবি করেন যে, যখীরায়ে কারামতের ভাষ্যের মধ্যে রেজাখানীরা তাহরীফ করেছে। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, যখীরায়ে কারামত রেজাখানীরা তাফরীফ করেনি, বরং কারামত আলী (র.) এর লেখাই হুবহু রয়েছে। তারপরও রেজাখানীরা যেরূপ বেযাদবিমূলক ভাষা প্রয়োগ করেছে তা এতে পাওয়া যায় না। কেননা তিনি যেটা বলেছেন তা হলো– ‘এক্ষেত্রে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধ্যানও কাজের কথা নয়।’

একই পৃষ্ঠায় পরবর্তীতে কেউ যাতে ফিতনা ছড়াতে না পারে বা ভুল না বুঝে সে লক্ষ্যে তিনি বলেছেন– **“মোট কথা এখানে ওয়াসওয়াসার শ্রেণীগুলোর পার্থক্য বর্ণনা করা হলো। আল্লাহর দরবারে খুব সতর্কতার সাথে দণ্ডায়মান হওয়া উচিত, যাতে মাঝ পথে কোনোরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকে। এসব কথায় কোনো পীর-মুর্শিদ অসন্তুষ্ট হবেন না এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কেউ বেয়াদবিও মনে করবেন না।”**

এরূপ বক্তব্যের পরও রেজাখানীরা যা বলে তা তাহরীফ ছাড়া আর কী? যদি তারা বলে যখীরায়ে কারামতের ভাষ্য তারা যেরূপ বলেছে সেরূপ, তাহলে হতে পারে যখীরায়ে কিরামতের কোনো সংস্করণে তারা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাহরীফ করে নিয়েছে। কেননা, **রেজাখানীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে যেরূপ বেয়াদবিমূলক ধৃষ্টতাপূর্ণ ঈমানহরণকারী বাক্য বানিয়ে লিখেছে তা বাজারে প্রচলিত যখীরায়ে কারামতের বাংলা ও উর্দু কোনো সংস্করণেই নেই।**

উল্লেখ্য, কারামত আলী জৌনপুরী (র.) যা লিখেছেন তা আদব রক্ষা করে লিখেছেন এবং যাতে কেউ ভুল না বুঝে এজন্য পরবর্তীতে ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। কিন্তু আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং রেজাখানীরা উদ্দেশ্যমূলকভাবে তার ভাষ্যকে আগ পিছ কর্তন করে, যা লিখেননি তা সংযোজন করে এ মহান ওলীর উপর অপবাদ দিয়েছে।

নামায হবে খালিসভাবে আল্লাহর জন্য

নামায সর্বোত্তম ইবাদত। বান্দার সকল ইবাদত হবে খালিসভাবে আল্লাহর জন্য। ইবাদতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম ইবাদত নামাযের স্বরূপ কেমন হবে এ বিষয়ে হাদীস শরীফে এসেছে–

أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فإنه يراك ،

‘তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, আর যদি তাঁকে দেখতে না পার (তাঁকে দেখছ এমন ধ্যান করতে না পার) তাহলে মনে কর তিনি তোমাকে দেখছেন।’ (বুখারী ও মুসলিম)

মুমিনের জিন্দেগীতে নামাযের অবস্থা অন্যান্য ইবাদত হতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইমাম গায্যালী (র.) নামাযে একাগ্রতার বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করার পর উল্লেখ করেছেন- “জেনে রাখো নামাযকে আপদ থেকে পাক করা, একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি করা এবং উল্লেখিত খুশু, তা’যীম, শরম ইত্যাদি শর্ত সহকারে পড়া অন্তরে নূর হাসিল হওয়ার প্রধান উপায়। এ নূর কাশ্‌ফ তথা দিব্যদৃষ্টিতে দেখার চাবি। আল্লাহর ওলীগণ কাশ্‌ফের মাধ্যমে যে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও প্রভূত্বের রহস্য জেনে নেন, তাও নামাযের মধ্যে বিশেষতঃ সিজদা অবস্থায় জেনে নেন।” (ইহইয়াউ-উলুমুদ্দিন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৮৭)

ইমাম গায্যালী (র.) এর বক্তব্য থেকে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে একমাত্র আল্লাহর জন্য নামাযকে খাঁটি করা এবং উল্লেখিত খুশু, তা’যীম, শরম ইত্যাদি শর্ত সহকারে পড়া অন্তরে নূর হাসিল হওয়ার প্রধান উপায়। এ নূর কাশ্‌ফ তথা দিব্যদৃষ্টিতে দেখার চাবি। নামাযের এই বিশেষ অবস্থা সবার পক্ষে সম্ভবও নয় বরং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বিশেষ বান্দা ও ওলীদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য। নামাযকে একমাত্র আল্লাহর জন্য খাঁটি বানানো তখনই সম্ভব হবে যখন আল্লাহর প্রতি ছরফে হিম্মত হবে অর্থাৎ তাঁর ধ্যানে এমনভাবে নিমগ্ন হবে যে দুনিয়ার আর কোনো কিছুর স্থান অন্তরে থাকবে না।

স্থান-কাল ও অবস্থা ভেদে হুকুমের পার্থক্য

স্থান, কাল ও অবস্থার দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কোনো জায়িয বিষয়ও না জায়িয হয়ে যায় আবার কোনো নাজায়িয বিষয়ও জায়িয হয়ে যায়। রেজাখানীরাও এ বিষয়ে একমত। উদাহরণ স্বরূপ- আহমদ রেজা খান সাহেবের জীবনী গ্রন্থ “জীবন ও কারামত” নামক বইয়ের তা’যীমী সিজদা অনুচ্ছেদে তা’যীমী সিজদা

জায়িয বা নাজায়িয হওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে গিয়ে আহমদ রেজা খান সাহেবের অভিমত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, **“আলা হযরত কেবলা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সিজদায়ে ইবাদত করাকে শিরক ও কুফরী এবং সিজদায়ে তাজিমী করাকে হারাম বলেছেন।”** (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ১৪৩)

আরো কিছু অগ্রসর হয়ে লিখা হয়েছে- “উল্লেখ্য যে, আলা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ঐ সব মানুষের জন্য সিজদা করাকে হারাম বলেছেন, যাদের হুশ ঠিক আছে। তবে হ্যাঁ যদি কোনো আশেক প্রিয় নবীর দরবারে গিয়ে অথবা অন্য কোনো ওলী বুযুর্গদের মাজারে গিয়ে ছাহেবে মাজারের সাথে দীদার লাভ করে হুশ হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ দুনিয়াবী কোনো খেয়াল না থাকে এমতাবস্থায় যদি সে সিজদা করে তাহলে তার জন্য ঐ সময় সিজদা করা শুধু জায়েয নয় বরং খুব উত্তম। যেমন আলা হযরত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

বে খোদী মে সিজদা দর ইয়া তাওয়াফ
জু কিয়া আচ্ছা কিয়া ফের তুজকো কিয়া।

অর্থাৎ বে খোদী অবস্থায় যে আশেক রওজা পাকে সিজদা অথবা তাওয়াফ করল যে করল সে খুব ভাল করল অতঃপর হে নিন্দুক বাতেল তোমার কী হল? এটা নিয়ে তুমি বাড়াবাড়ি করতেছ কেন?

আলা হযরতের উক্ত বাণী দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, বে খোদী অবস্থায় সিজদায়ে তাজিমী জায়েয। বে খোদী অবস্থা ব্যতীত আল্লাহ ছাড়া অন্য কোথাও সিজদা করা জায়েয নেই।” (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ১৪৩)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হল আহমদ রেজা খান সাহেব সিজদায়ে তা’যীমী এর মত জঘন্য হারাম কাজকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে হারাম এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে উত্তম কাজ বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন। (অর্থাৎ দুনিয়াবি খেয়াল না থাকলে সেজদায়ে তা’যীম জায়েয, অন্যথায় নয়।) **এখানে এ ফতওয়া নিয়ে আলোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কেননা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে সিজদায়ে তা’যীমী সর্বাবস্থায়ই হারাম**। আমাদের উদিষ্ট বিষয় হলো ক্ষেত্রভেদে একই বিষয়ের হুকুম ভিন্ন হওয়ার বিষয়ে রেজাখানীরাও যে একমত তা তুলে ধরা।

এ বিষয়ের আলোকে আমাদের বক্তব্য হলো, ফানা ফির রাসূল তরীকতের একটি উচ্চস্তর। কিন্তু নামাযের মধ্যে ফানা ফির রাসূল বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া আল্লাহর জন্য নামাযকে খালিস করার

ক্ষেত্রে অন্তরায় হতে পারে। কেননা নামাযের স্বরূপ কেমন এ বিষয়ে হাদীস শরীফে এসেছে–

أن تعبد الله كأنك تراه ، فان لم تكن تراه فإنه يراك ،

‘তুমি এমনভাবে ইবাদত করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছে আর যদি তাকে দেখতে না পার (তাঁকে দেখছ এমন ধ্যান করতে না পার) তাহলে মনে কর তিনি তোমাকে দেখছেন।’ (বুখারী ও মুসলিম)

এ হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, নামাযে ধ্যান হবে কেবল আল্লাহর। নামাযে ধ্যান যাতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো দিকে নিবিষ্ট না হয় সেজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) নামাযে ফারসী কিরাত পর্যন্ত জায়িয রেখেছিলেন। আহমদ বিন আবূ সাঈদ মোল্লা জিওন (র.) ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর আরবী কিরাতের পরিবর্তে ফার্সী কিরাতকে জায়েয রাখার কারণ লিখেছেন, আল্লাহর সম্মুখে তার হুযূরে কলব বা আন্তরিকতা পূর্ণ উপস্থিতি খালিস বা নির্ভেজাল রাখতে অপরাগ হওয়া। যেহেতু ইমাম আবূ হানিফা আল্লাহর তাআলার তাওহীদ ও মুশাহাদার সমুদ্রে নিমজ্জিত ছিলেন, এজন্য তিনি আল্লাহর সত্তা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না। পক্ষান্তরে, ফারসী কিরাতের মধ্যে এ ধরণের কোনো সমস্যা নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর এ বক্তব্যের জন্য কেউই তাকে দোষারোপ করেননি। অধিকন্তু উলামায়ে কিরাম এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপভাবে কোনো ওলী-আল্লাহ যদি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধ্যানমগ্ন হওয়ার কারণে এ ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়ে যদি বলে থাকেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধ্যানে মগ্ন হলে তাঁর মহব্বত ও তা’যিমের কারণে আল্লাহর ধ্যানে বিঘ্ন ঘটবে। তবে তার একাগ্রতাকে অপব্যাখ্যা দিয়ে শয়তানী ফতওয়া দেয়া উচিত নয়।

শয়তানী অপব্যাখ্যা থেকে বিরত থাকুন

রেজাখানীদের কাজই হলো অপব্যাখ্যার মাধ্যমে সমাজে ফিতনা ছড়ানো। ইতোপূর্বে পাঠকবৃন্দ দেখেছেন রেজাখানীরা কিভাবে কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর ‘যখীরায়ে কারামত’ এর ভাষ্য বিকৃত করে অপব্যাখ্যা করেছে। অনুরূপভাবে একই বিষয়ে সীরাতে মুস্তাকীমে উল্লেখিত বক্তব্য নিয়েও তারা বিভ্রান্তি ছড়ায় একটি শব্দের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে। শব্দটি হল ‘হিম্মত’।

রেজাখানীরা এর অর্থ লিখেছে নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেয়াল করা। অথচ তাসাউফের পরিভাষায় এর অর্থ অনেক ব্যাপক ও গভীর। যেমন শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) তার লিখিত ‘আল-কাউলুল জামীল’ কিতাবে এর অর্থ লিখেছেন, ইচ্ছা শক্তিকে এমনভাবে প্রবল করতে হবে যেন মনে অন্য কোনো কিছু স্থান না পায়। (আল-কাউলুল জামীল, পৃষ্ঠা ৫৫)

নামাযে রাসূলে পাক (সা.) এর ধ্যানকে যদি এমনভাবে অন্তরে স্থান দেয়া হয় যাতে রাসূলেপাকের ধ্যান ছাড়া অন্তরে অন্য কোনো কিছুই স্থান না পায় তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায় ? কারণ, নামায খালিসভাবে শুধু আল্লাহর জন্যই হতে হবে এবং এ ব্যাপারে সকল আলিম একমত।

উল্লেখ্য সীরাতে মুস্তাকীমে উক্ত ‘হিম্মত’ শব্দটি তাসাউফের পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এর অর্থও তাসাউফের পরিভাষা অনুযায়ী করতে হবে। অন্যথায় অর্থ গ্রহণে ভুল হবে। কেননা পরিভাষাভেদে একই শব্দের অর্থ ভিন্ন হয়। নিম্নে কয়েকটি শব্দের আভিধানিক অর্থের পাশাপাশি তাসাউফের পারিভাষিক অর্থ পেশ করা হল।

শব্দ	আভিধানিক অর্থ	তাসাউফের পারিভাষিক অর্থ
حال	অবস্থা	এমন একটা অবস্থা যা চেষ্টা ছাড়া মানুষের অন্তরে জাহির হয়
فنا	বিনষ্ট হওয়া	নিন্দনীয় স্বভাব দূর হয়ে যাওয়া
سکر	মদ ইত্যাদির নেশা	কোনো শক্তিশালী অবস্থা সৃষ্টির কারণে হুশ হারিয়ে ফেলা
ہمت	দৃঢ় সংকল্প, সাহস	ইচ্ছা শক্তিকে এমনভাবে প্রবল করতে হবে যেন মনে অন্য কোনো কিছু স্থান না পায়। (আল-কাউলুল জামীল, পৃষ্ঠা ৫৫)

রেজাখানীরা তাসাউফের পরিভাষাগত উক্ত ‘হিম্মত’ শব্দের অন্তর্নিহিত মূল উদ্দেশ্যকে পাশ কাটিয়ে যায় এবং এর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ায়।

প্রকাশ থাকে যে, উচ্চ স্তরের ওলী-আল্লাহদের তিনটি স্তর অতিক্রম করতে হয়।

প্রথমত: ফানা ফিশ-শায়খ (মুর্শিদের ভালবাসায় মগ্ন হওয়া)।

দ্বিতীয়ত: ফান ফির-রাসূল (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভালবাসায় নিমগ্ন হওয়া)।

তৃতীয়ত: ফানা ফিল্লাহ (আল্লাহর ভালবাসায় নিমগ্ন হওয়া)।

দুনিয়াবী সামগ্রীর প্রতি ওলী-আল্লাহগণের কোনো বিশেষ আকর্ষণ নেই। তাই সাধারণত নামাযে দুনিয়াবী কোনো বিষয়ের প্রতি তাদের খেয়াল যায় না। তবে তারা নিজের মুরশিদ অথবা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে যেতে পারেন। এমতাবস্থায় নিজের মুরশিদ অথবা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়ার ফলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া বাধাগ্রস্থ হতে পারে। কারণ, একজন ওলী-আল্লাহ যখন ফানা ফিশ-শায়খ ও ফানা ফির-রাসূল এই স্তর দুটি অর্জন করে নেন তখন তিনি নামাযে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুর্শিদের ধ্যানমগ্ন হলে তাতে অধিক মশগুল হয়ে পড়তে পারেন। অথচ নামায হলো আল্লাহর জন্য খাস ইবাদত। এর মূল কাজ হলো আল্লাহর ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়া। এ জন্যই নামাযের মধ্যে পার্থিব কোনো বিষয়, পীর-মুর্শিদ এমনকি প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধ্যানে নিমজ্জিত হয়ে যাওয়াকে বুযুর্গানে কিরাম সমর্থন করেননি। পক্ষান্তরে যেহেতু ওলী-আল্লাহগণ দুনিয়াবী কোনো কিছুর প্রতি আসক্ত নন সেহেতু তাদের নামাযে দুনিয়াবী বিষয়ের খেয়াল সাধারণত আসে না বা কখনো তা এসে থাকলে অসার বিষয় হিসেবে অন্তরে স্থায়ী হয় না। ফলে এটি নামাযের একাগ্রতায় তুলনামূলক কম বাধা সৃষ্টি করে। আবার দুনিয়াবী বিষয়ের ক্ষেত্রে তা’যীমের কোনো সম্পর্কও থাকে না। ফলে শিরকের আশঙ্কাও থাকে না। কেননা নামাযে গায়রুল্লাহর তা’যীম শিরকের দিকে নিয়ে যায়, যা রেজাখানীরাও স্বীকার করেন এবং ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর ফতওয়াও এটি।

প্রকাশ থাকে যে, সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর মালফুযাত বা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর যখীরায়ে কারামতের মধ্যে নামাযে খুশু খুযুর মধ্যে বাধা সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ আলোচনা করা হয়েছে এবং পীর-মুর্শিদের ধ্যান না পার্থিব বিষয়ের খেয়াল নামাযে আল্লাহর ধ্যানে নিমজ্জিত হওয়ার মধ্যে বেশি বাধা সৃষ্টি করতে পারে তা তুলে ধরা হয়েছে। পীর-মুর্শিদকে বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র সত্তাকে কোনো কিছুর সাথে তুলনা করা হয়নি। এটাকে অপব্যাখ্যা করা শয়তানী কাজ।

ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরামের রীতি

প্রকাশ থাকে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে কখনো কোনো কথা ও কাজ মন্দ বুঝা গেলে তার অর্ন্তনিহিত ভালো উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর একে ভালো বলে স্বীকৃতি দেয়া মুমিনের কাজ। উদাহরণস্বরূপ, সাহাবায়ে কিরাম সর্বদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে থাকাকে সৌভাগ্য মনে করতেন। এমনকি ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে শেষ নিদ্রায় শায়িত হওয়াকে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মনে করেছিলেন। অথচ মুসলিম শরীফে বর্ণিত একটি হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী দেখা যায়, একজন সাহাবী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাড়ির কাছে তার বাড়ি হওয়াকে অপছন্দ করেন। আর অপর একজন সাহাবী অপছন্দ করার কারণ না জানার কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিযুক্ত সাহাবীর কাছে এর কারণ জানতে চাইলে উক্ত সাহাবী বলেন- দূর থেকে হেটে আসার সওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে একথা বলেছি। এতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বলেন, তুমি যে আশা করেছ তা পাবে।

যদি রেজাখানীদের দ্বীনি খেদমতের সদিচ্ছা থাকে তবে ওলী-আউলিয়ার তাত্ত্বিক কথার অপব্যাখ্যা না দিয়ে উক্ত সাহাবীর কাছ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেভাবে ব্যাখ্যা চাওয়ার সুন্নত রেখে গেছেন তার অনুকরণ করা উচিত।

তাওহীদের আলোচনায় কেবল তাওহীদের কথাই থাকে

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তরীকতের ক্ষেত্রে উচ্চস্তরের ওলী-আল্লাহগণ তিনটি পর্যায় অতিক্রম করেন। যেমন- ফানা ফিশ-শায়খ, ফানা ফির-রাসূল ও ফানা ফিল্লাহ। এ তিনটি স্তরের প্রত্যেকটির আলাদা আলাদা অবস্থা রয়েছে। ফানা ফিল্লাহ'র অবস্থাকে ফানা ফির-রাসূলের সাথে কিংবা ফানা ফিশ-শায়খের সাথে একইরূপ মনে করা অজ্ঞতা। এমনিভাবে তাওহীদ ও রিসালত উভয়ের অবস্থা ভিন্ন। তাই যখন কোনো ওলী-বুযুর্গ তাওহীদের আলোচনা করেন তখন তাওহীদের মূল মর্মই তুলে ধরেন। আর রিসালতের আলোচনাকালে রিসালতের মর্ম, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষত্ব ও মর্যাদার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাওহীদের আলোচনাকালে সূফী-বুযুর্গ ও উলামায়ে কিরাম হিদায়াত, গুমরাহী, লাভ, ক্ষতি ইত্যাদি সকল বিষয়ের সম্পর্ক আল্লাহর দিকেই করে থাকেন। আল্লাহর ইযযত ও জালালতের মোকাবিলায় অন্য সবকিছু তুচ্ছ হিসেবে দেখান। এমননিভাবে আল্লাহর ধ্যানের প্রসঙ্গ এলে আল্লাহর ধ্যানকেই মূল হিসেবে তুলে ধরেন এবং এর মোকাবিলায় অন্য সর্বকিছু গৌণ হিসেবে উপস্থাপন করেন। হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ আহমদ বেরলভী (র.) ও কারামত আলী জৌনপুরী (র.) একইভাবে যখন নামাযে আল্লাহর ধ্যানের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন তখন এর মোকাবিলায় অন্য সবকিছু গৌণ হিসেবে দেখিয়েছেন এবং গায়রুল্লাহর ধ্যানকে শিরক বলেছেন। উদ্দেশ্যমূলকভাবে রেজাখানী এর অপব্যাখ্যা করেছে। অথচ দেখা যায় যে, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) যখন তাওহীদের আলোচনা করেছেন তখন তিনি দেখিয়েছেন যে, ওলী-আল্লাহগণ এক বিশেষ স্তরে পৌঁছলে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার উপর সমর্পন করে দেন। সে সময় তাদের কাছে আল্লাহ ছাড়া অন্য সব কিছুই তুচ্ছ মনে হয়। এমনকি আল্লাহর আলোচনা ছাড়া অন্য সকলের আলোচনাও তাদের কাছে অপ্রিয় হয়ে যায়। তিনি তার এক মাকালায় 'তাওহীদে শুহুদী'র আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন- "এ মাকামে পৌঁছার পর বান্দা আল্লাহর এমন এক মন্যিলে প্রবেশ করে যেমন ধাত্রীর হাতে শিশু অথবা গোসলদাতার হাতে মায়্যিত থাকে অথবা বল খেলোয়াড়ের সামনে বল থাকে, যার নড়াচড়া, পরিবর্তন, উলটপালট ও নিরবতা অবলম্বন তার নিজস্ব ক্ষমতায় হয় না। **এ অবস্থায় বান্দা তার মাওলার হুকুম-আহকাম ও কাজের মধ্যে এমনভাবে বিলীন হয়ে যায় যে সে আল্লাহ তাআলার জাত ছাড়া অন্য কিছু দেখে না। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কথা শুনেনা, কারো কথা বুঝেনা। ... আল্লাহর আলোচনা দ্বারাই সে পরিতৃপ্তি লাভ করে এবং অন্যের আলোচনাকে অপ্রিয় ও ঘৃনার বস্তু মনে করে।** (ফুতুহুল গায়ব, মাকালা ৩)

এ আলোচনা বুঝা যায় যে, 'তাওহীদে শুহুদী'র মাকামে যারা পৌঁছেন তাদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে,

১. উক্ত বান্দার নিজস্ব কোনো এখতিয়ার থাকে না।
২. আল্লাহর জাত ছাড়া সে অন্য কোনো কিছু দেখে না, আল্লাহ ছাড়া কারো কথা শুনেনা, কারো কথা বুঝে না।
৩. আল্লাহর আলোচনাই সে পছন্দ করে, অন্যের আলোচনা তার পছন্দ হয় না বরং অন্যের আলোচনা তার নিকট ঘৃণার বস্তু মনে হয়।

বড়পীর (র.) এর উপরোক্ত উক্তিসমূহের অপব্যাখার দুঃসাহস রেজাখানীরা হয়তো করবে না। তবে তারা অন্য কোনো বুযুর্গের লেখায় এরূপ বক্তব্য পেলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রসঙ্গ টেনে এনে বলতো যে এখানে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে বেয়াদবি করা হয়েছে। যেহেতু এখানে রয়েছে, উক্ত ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া কারো কথা শুনেনা এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যের আলোচনা তার নিকট ঘৃনার বস্তু মনে হয়।

আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর দৃষ্টিতে গায়রুল্লাহর খেয়াল করা শিরক

ইবাদতের মধ্যে গায়রুল্লাহর তা'যীম ও খেয়াল করা শিরক। বড়পীর দস্তগীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর অভিমতও এটি। যেমন হযরত বড়পীর (র.) বলেছেন, "আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে কোনো বিষয়কে তাঁর সাথে শরীক করো না। তোমার ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনা সবকিছু আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং তুমি (তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে) নিজের কোনো ইচ্ছা শরীক করো না, নিজস্ব প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না এবং নিজস্ব কামনা-বাসনা রেখো না, যাতে তুমি মুশরিক না হও। আল্লাহ তাআলা বলেছেন-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তাঁর রবের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে সে যেন নেক আমল করে এবং তার রবের ইবাদতের মধ্যে কাউকে শরীক না করে।' আর শিরক কেবলমাত্র মূর্তিপূজার নাম নয়। তোমার প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং তোমার রবের সাথে গায়রুল্লাহ তথা দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে বিরাজমান ও আখিরাতের কোনো বিষয়ের ইচ্ছা করাও শিরক। **আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু গায়রুল্লাহ। সুতরাং যখনই তুমি গায়রুল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করলে তখন গায়রুল্লাহকে আল্লাহর সাথে শরীক করলে।**"(ফতুহুল গায়ব, মাকালা ০৭)

এখানে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছুকে 'গায়রুল্লাহ' বলেছেন এবং ইবাদতে গায়রুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো দিকে মনোনিবেশ করাকে শিরক বলেছেন। তারই অনুসরণে হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.)ও এরূপ বলেছেন। রেজাখানীরা এখানে হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর ব্যাপারে কী ফতওয়া দিবে ?

রেজাখানীদের দৃষ্টিতেও নামাযে গায়রুল্লাহর তাযীম শিরক

রেজাখানীরা হিংসার বশবর্তী হয়ে যখন অন্ধ হয়ে যায় তখন তারা নামাযের ভিতরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ধ্যান ও ওলী আউলিয়া ও বুযুর্গগণকে সম্মানের সাথে স্মরণ করাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে তুলে ধরে। অপরদিকে তাদের বিভিন্ন ফতওয়ার কিতাবে নামাযে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে মাকরূহে তাহরীমী এমনকি শিরক বলে ফতওয়া প্রদান করেছে।

উদাহরণস্বরূপ কোনো সম্মানিত ব্যক্তির কারণে নামায দীর্ঘায়িত করলে নামাযের কি ক্ষতি হবে সে সম্পর্কে আলা হযরত আহমদ রেজা খান সাহেব লিখেছেন-

اگر کسی خاص شخص کی خاطر اپنے کسی علاقۂ خاصہ (خاص تعلق عقیدت) یا خوشامد (تعظیم) کے لیے منظور ہو تو ایک بار تسبیح کی قدر بھی پڑھانے کی اجازت نہیں بلکہ ہمارے امام اعظم نے فرمایا کہ **يخشىٰ عليه امر عظيم** یعنی اس میں شرک کا اندیشہ ہے کہ نماز میں اتنا عمل اس نے غیر خدا کے لیے کیا۔ اگر خاطر خوشامد (تعظیم) مقصود نہیں بلکہ عمل حسن پر مسلمان کی اعانت۔ اور یہ اس صورت میں واضح ہوتی ہے کہ یہ اس آنے والے کو نہ پہچانے یا پہچانے اور اس کو کوئی تعلق خاص اس سے نہ ہو نہ کوئی غرض اس سے اٹکی ہو تو رکوع میں دو ایک تسبیح کی قدر بڑھا دینا جائز (احکام شریعت۔ حصہ ۲ ص ۱۲۰)

অর্থাৎ নিজের বিশেষ কোনো সম্পর্কের জন্য (বিশেষ আকীদাগত সম্পর্কের জন্য) অথবা মনোতুষ্টি তথা সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য এক তাসবীহ পরিমাণ নামাযও বিলম্ব করা যাবে না। বরং আমাদের ইমাম আবূ হানীফা (র.) বলেছেন যে, **يخشىٰ عليه امر عظيم** অর্থাৎ এ ধরনের বিলম্ব করার মধ্যে শিরকের সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, নামাযের মধ্যে এতটুকু আমল গায়রুল্লাহর জন্য করা হয়েছে। আর যদি কারো মনোতুষ্টি বা তাযীম উদ্দেশ্য না হয় বরং মুসলমানকে ভাল কাজে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে আর এক্ষেত্রে এটি সুস্পষ্ট হয় যে, আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোনো পরিচয় নেই অথবা পরিচয় থাকলেও তার সাথে বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই আর কোনো বিষয় তার

জন্য আটকে আছে এমনও নয় (অর্থাৎ কোনোভাবে তার মুখাপেক্ষী নয়) এমতাবস্থায় রুকুর মধ্যে এক-দুই তাসবীহ বাড়ানো জায়িয আছে। (আহকামে শরীয়ত, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৬০)

আহমদ রেজা খান সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, বিশেষ কোনো সম্পর্ক বা তা'যীমের সম্পর্ক আছে এমন ব্যক্তির জন্য নামাযে এক তাসবীহ পরিমাণ বৃদ্ধি করাও জায়িয নয়, বরং এ ক্ষেত্রে শিরকের সম্ভাবনা রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এরূপ বলেছেন। পক্ষান্তরে যার সাথে তাযীম-সম্মানের সম্পর্ক বা বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই এমন সাধারণ মানুষের জন্য নামাযের মধ্যে দুই এক তাসবীহ পরিমাণ বৃদ্ধি করা জায়িয আছে। এখানে দ্বিতীয় সুরত অপেক্ষা প্রথম সুরত অধিক ক্ষতিকর। প্রথম সুরত শিরকের দিকে নিয়ে যায় অথচ দ্বিতীয় সুরতে সমস্যা হয় না। প্রথম সুরত ক্ষতিকর হওয়ার মূল কারণ হলো এতে তা'যীমের সম্পর্ক রয়েছে।

একই কারণে হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) নামাযে সম্মানিত কোনো বুযুর্গের ধ্যান করাকে অধিক ক্ষতিকর বলেছেন।

রেজাখানীদের সদরে শরীয়ত আমজদ আলী সাহেব এ প্রসঙ্গে বাহারে শরীয়ত কিতাবে লিখেছেন-

امام کو کسی آنے والے کی خاطر نماز کا طول دینا مکروہ تحریمی ہے اگر اس کو پہچانتا ہو اور اس کی خاطر مد نظر ہو۔

অর্থাৎ কোনো আগন্তুক ব্যক্তির জন্য নামাযকে দীর্ঘ করা ইমামের জন্য মাকরূহে তাহরীমী, যদি উক্ত ব্যক্তি পরিচিত হন এবং তার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয়। (বাহারে শরীয়ত)

অথচ নামাযে দুর্বল ও রোগাক্রান্ত মানুষের প্রতি খেয়াল রাখার নির্দেশ হাদীস শরীফে রয়েছে। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

إذا أم أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض ،

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মানুষের ইমামতি করে সে যেন নামাযকে হালকা (সংক্ষিপ্ত) করে, কেননা তাদের (মুসল্লিদের) মধ্যে শিশু, বৃদ্ধ, দুর্বল ও অসুস্থ ব্যক্তি রয়েছেন। (মুসলিম)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হল যে, সম্মানের সাথে আল্লাহর

ধ্যানে নিমগ্ন থাকাই নামাযের আসল উদ্দেশ্য। সম্মানের সাথে অন্য কোনো সম্মানিত ব্যক্তির খেয়াল করা বা তার ধ্যানে নিমগ্ন হওয়া নামাযের জন্য ক্ষতিকর।

ইমাম পরিচিত কোনো ব্যক্তির জন্য তার মনোতুষ্টির উদ্দেশ্যে নামায যদি এতটুকু দীর্ঘ করেন যাতে উক্ত ব্যক্তি ঐ রাকাআত পেতে পারেন -এ মাসআলার বিষয়ে ইমাম খাত্তাবী (র.) [ওফাত ৩৮৮ হিজরী] লিখেছেন :

كرهه بعضهم وقال اخاف ان يكون شركا وهو مذهب مالك ،

-কোনো কোনো ইমাম এটাকে মাকরূহ বলেছেন এবং বলেছেন এতে শিরকের আশঙ্কা রয়েছে। এটি ইমাম মালিক (র.) এর অভিমত।

আল্লামা কাসানী (র.) [ওফাত ৫৭৮ হিজরী] **البدائع والصنائع** এর মধ্যে ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি এ মাসআলার বিষয়ে ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও কাযী ইবনে আবি লায়লা (র.) কে জিজ্ঞেস করেছেন। তারা উভয়ে একে মাকরূহে তাহরীমী বলেছেন। ইমাম মুহাম্মদ (র.) এর ফতওয়াও অনুরূপ এবং ইমাম শাফিঈ (র.) এর শেষ সিদ্ধান্তও এটি।

আহমদ রেজা খানের দাবি তিনি রাসূলের বান্দা

আহমদ রেজাখান বেরলভী সাহেব 'হাদাইকে বখশিশ' কিতাবে নিজেকে রাসূলের বান্দাহ বলে দাবি করেছেন। সুতরাং রেজাখানীরা নামাযের মধ্যে যখন রাসূলের সম্মান প্রদর্শন করবেন তখন তাঁর ইবাদতের উদ্দেশ্যেই করবেন। আর এটা স্পষ্ট শিরক। এ প্রসঙ্গে 'হাদাইকে বখশিশ" কিতাবে আহমদ রেজাখান সাহেব যে কাব্য রচনা করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হলো-

یٰعبادی کہہ کے ہم کو شانے اپنے بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا
دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبد المصطفےٰ پھر تجھ کو کیا

অর্থ : রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে یٰعبادی (ইয়া ইবাদী) বলে তাঁর বান্দা করে নিয়েছেন। এতে তোমাদের কি হল। দেও এর উপাসক দিয়ে আমাদের কি প্রয়োজন? আমরা হলাম মোস্তফা এর বান্দা। এতে তোমাদের কি? (হাদাইকে বখশিশ, পৃষ্ঠা ১৮৬)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ প্রত্যেক নবী-রাসূল নিজ নিজ

সময়ে মানুষকে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির দিকে আহ্বান করেছেন। কোনো নবীই তাঁর উম্মতকে নিজের বান্দা বলে সম্বোধন করেননি। এখানে আহমদ রেজা খান সাহেব মনগড়া ব্যাখ্যার মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এমন বিষয়ের সম্পর্ক করেছেন যার বিপরীত নির্দেশনা পবিত্র কুরআন মজীদে রয়েছে। যেমন, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেছেন :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

(سورة آل عمران ٧٩ – ٨٠)

অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা কিতাব, হিকমত ও নবুওয়াত দান করার পর তিনি মানুষকে বলবেন ‘তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে আমার বান্দা হয়ে যাও’ এটা তার জন্য সঙ্গত নয়। বরং তিনি বলবেন, তোমরা আল্লাহওয়ালা হয়ে যাও, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষা দান কর এবং কিতাব অধ্যয়ন কর। আর ফিরিশতাগণ ও নবীগণকে প্রতিপালকরূপে গ্রহণ করতে তিনি তোমাদের নির্দেশ দিতে পারেন না। তোমাদের মুসলমান হওয়ার পর তিনি কি তোমাদেরকে কুফরীর নির্দেশ দিবেন? (সূরা আলে ইমরান, আয়াত ৭৯-৮০)

এ আয়াতদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, মানুষদেরকে তাঁর নিজের বান্দা হবার জন্য আহ্বান করা কোনো নবীর পক্ষে সঙ্গত নয় এবং এটি সম্ভবও নয়। যদি কেউ বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতকে তাঁর নিজের বান্দার হবার আহ্বান করেছেন কিংবা তাদেরকে নিজের বান্দা বলে সম্বোধন করেছেন তাহলে এটি নিঃসন্দেহে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অপবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। আহমদ রেজা খান সাহেবের ‘কানযুল ঈমান’ এর হাশিয়া লেখক সদরুল আফাযিল সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদী পর্যন্ত লিখেছেন- “এটা (উম্মতকে নিজের বান্দা হবার আহ্বান করা) নবীগণ (আ.) দ্বারা অসম্ভব এবং তাঁদের প্রতি এমন ধরনের কোন সম্বন্ধ রচনা তাঁদের প্রতি অপবাদের শামিল।” (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান ও খাযাইনুল ইরফান, পৃষ্ঠা ১২৫)

সুতরাং আহমদ রেজা খান সাহেব যে বলেছেন- “রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে يٰعِبَادِي (ইয়া ইবাদী) বলে তাঁর বান্দা করে নিয়েছেন” এটা নিঃসন্দেহে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর অপবাদ। রেজাখানীদের সদরুল আফাযিল সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দিন মুরাদাবাদীও এরূপ বলেছেন। আর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অপবাদ দিলে এর পরিণতি কি হয় তা পাঠকগণই বিবেচনা করবেন।

রেজাখানীগণ কর্তৃক রাসূল (সা.)-কে জড় পদার্থের সাথে তুলনা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে কোনো কিছুর সমকক্ষ বুঝানোর উদ্দেশ্যে তুলনা করা বেয়াদবি। তবে একটি বিষয়কে অপর কোনো বিষয়ের সাথে তুলনা করা হলে উভয়টিকে একই সমান মনে করা মূর্খতার পরিচায়ক। কারণ আল্লাহ তায়াল স্বীয় নূরকে প্রদীপের সাথে তুলনা দিয়ে বলেছেন, “কোনো একটি দ্বীপদ্বার যার মধ্যে আছে একটি প্রদীপ” (আল কুরআন)। অনুরূপ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উম্মতের আলিমগণকে বনী ইসরাঈলের নবীদের সাথে তুলনা করেছেন। **রেজাখানীরা তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে এ ধরণের তুলনা দেয়ার কারণে তাদের উপর হারাম, কুফরী ফতওয়া দিয়ে থাকে। অথচ তাদের প্রয়োজন হলে তারা নবীগণকে অন্য কোনো জিনিসের সাথে তুলনা করে থাকে।** উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রেজাখানীদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমী মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ ‘মিরআত’ কিতাবে হাদীসে জিবরাঈলের ব্যাখ্যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মধ্যে একই সাথে বাশারিয়াত ও নূরানিয়াতের সহাবস্থান বুঝাতে গিয়ে তাঁকে হযরত মুসা (আ.) এর লাঠির সাথে তুলনা করেছেন। তিনি লিখেছেন :

عصا موسوی سانپ کی شکل میں سب کچھ نگل گیا تھا ایسے ہی ہمارے حضور نوری بشر ہیں۔ کھانا، پینا، نکاح اس بشاریت کے احکام تھے۔ روزہ وصال میں نورانیت کی جلوہ گری ہوتی تھی بغیر کھانے پینے عرصہ دراز گزار لیتے تھے (مرآۃ المناجیح۔ جلد ا ، صفحہ ٣٦)

অর্থাৎ মূসা (আ.) এর লাঠি সাপের আকৃতি ধারণ করে যেমন সবকিছু গিলে ফেলেছিল, ঠিক তদ্রুপ আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের সৃষ্টি বশর ছিলেন। খাওয়া দাওয়া, বিবাহ-শাদী তাঁর মানবীয় রীতি ছিলো। আর

সাওমে ওয়াসাল এর মাধ্যমে নূরানিয়াত প্রকাশিত হতো যে, তিনি একাধারে না খেয়ে দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিতেন। (মিরআত, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণ হচ্ছে যে, **নঈমী সাহেব নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বাশারিয়াতকে মুসা (আ.) এর লাঠি (ব্যবহারযোগ্য জড়পদার্থ) এর সাথে এবং তাঁর নূরানী অবস্থাকে লাঠির অজগর সাপে রুপান্তরিত হয়ে যাওয়ার অবস্থার সাথে তুলনা দিয়েছেন।** যদি এ ধরণের কোনো তুলনা তাদের বিরোধী কোনো আলিম দিতেন তবে রেজাখানী গরম সুন্নি আলিমরা শৃগালের মত নবীর সাথে বেয়াদবি হয়েছে বলে প্রচার করতো।

ওয়াসওয়াসা থেকে অন্তরকে মুক্ত করার উপায় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) তদীয় যখীরায়ে কারামতে অন্তরকে ওয়াসওয়া থেকে মুক্ত করার একটি উপায় নির্দেশ করেছেন। তার এ বর্ণনাকে রেজাখানীরা বিকৃত করেছে। রেজাখানীরা এ বিষয়ে কারামত আলী (র.) এর ভাষ্য হিসেবে যা লিখেছে তা হলো-“নামাযে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেয়াল হতে নিজের গরু-গাধার খেয়ালে ডুবে থাকা ভাল। ইচ্ছা করে রাসূলে পাকের খেয়াল করলে মুশরিক হবে। আর অনিচ্ছায় নবীয়ে পাকের খেয়াল এসে গেলে শয়তান ওয়াছওয়াছা দিয়েছে মনে করে ওয়াছওয়াছাওয়ালী এক রাকাআতের পরিবর্তে চার রাকআত নফল নামায আদায় করতে হবে।” (ইজহারে হক্ব, পৃষ্ঠা ১৪৪)

প্রকাশ থাকে যে, কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর লেখার সাথে রেজাখানীদের বানানো উক্ত বক্তব্যের কোনো মিল নেই। কারামত আলী জৌনপুরী (র.) লিখেছেন-

“আল্লাহ তা’আলা বলেছেন- **فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** ،অর্থাৎ, কারো যদি আল্লাহর সাথে মোলাকাতের আশা থাকে সে যেন নেক কাজ করে এবং কোনো বান্দাহকে যেন আল্লাহর ইবাদতের সাথে শরীক না বানায়। (সূরা কাহাফ)

এ ধরনের শিরিকী ওয়াসওয়াসা যদি কারো হয়, সে যেন আল্লাহর কাছে অনুনয় বিনয় করে মোনাজাত করে, আল্লাহয় স্বীয় অনুগ্রহে তাকে রক্ষা করবেন। প্রতিটি

বিষয়ই আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল। কতক ব্যাপারে বাহ্যিক উপায় উপকরণ দ্বারা কোনোই ফল হয় না। আল্লাহ পাকের মেহেরবানিই আসল কথা। সুতরাং এ ধরনের ওয়াসওয়াসা দূরিভূত হওয়ার জন্য এ পথই অবলম্বন করতে হবে। এজন্য আল্লাহর নিকট দুআ করবে এবং স্বীয় শায়খের নিকট নিবেদন করবে। কেননা, মুর্শিদ তার নিজের চেয়ে অনেক বেশি জ্ঞানী। হয়তো তিনি এজন্য উপকারী কোনো পদ্ধতি বলে দিবেন এবং আল্লাহর দরবারে দুআ করবেন। আর এ ওয়াসওয়াসা উপরোল্লিখিত শ্রেণির না হয়ে বরং নফসের দ্বারা সৃষ্টি হলে তার চিকিৎসা হল, যে রাকআতে, ওয়াসওয়াসা হয়েছে সে রাকআতের বদলে চার রাকআত করে নফল নামায আদায় করে। যেমন যুহরের চার রাকআতে ওয়াসওয়াসা হয়ে থাকলে, ফরয ও সুন্নত নামায শেষ করে খুব মনোযোগের সাথে ষোল রাকআত নফল নামায পড়বে, যাতে কোনো ওয়াসওয়াসা না আসে। ... এমনি ধরনের চিকিৎসা খুব কষ্টকর বিধায় নফস নিশ্চয়ই এ ধরনের ওয়াসওয়াসা হতে বিরত থাকবে, আর কোনরূপ খারাপ চিন্তা সৃষ্টি করবে না। আবার অনর্থক নিজের নফসকে কষ্ট দিবে না। এমনিভাবে নফস নিয়ন্ত্রিত হলে আল্লাহর শোকর আদায় করবে। (যখীরায়ে কারামত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৩১-২৩২)

এখানে কারামত আলী জৌনপুরী (র) নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার একটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন, যা হাদীসসম্মত। এটি ফতওয়া নয় বরং তাযকিয়ায়ে নাফসের জন্য কঠোরতা অবলম্বন মাত্র। এরূপ কঠোরতা অনেক বুযুর্গানে কিরাম অবলম্বন করতেন, যার বর্ণনা সামনে আসছে। এছাড়া এখানে হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ফরযের কাযা বা কাফফারা হিসেবে এক রাকাআতের পরিবর্তে চার রাকাআত পড়ার কথা বলেননি বরং নফল হিসেবে পড়ার কথা বলেছেন। এটি তার পূর্বোক্ত বর্ণনা থেকে সুস্পষ্ট। আর এরূপ আমলের মূল কারণ তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন যে, নফসকে নিয়ন্ত্রণ করা। এমনকি নফস নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেলে তাকে কষ্ট না দেয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার কথাও তিনি বলেছেন। উপরন্তু নফলের দ্বারা ফরযের ক্ষতিপূরণ হয়, যা হাদীস শরীফেই রয়েছে। সুতরাং তার এ বক্তব্যের অপব্যাখ্যা করা চক্রান্ত ছাড়া আর কি হতে পারে ?

নফলের দ্বারা ফরযের ক্ষতিপূরণ হয়

ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য আউলিয়ায়ে কিরাম নানা পন্থা অবলম্বন করে থাকেন। নামাযে কোনো ওয়াফওয়াসা আসলে এর চিকিৎসার জন্য কারামত আলী জৌনপুরী (র.) প্রতি রাকাআতের পরিবর্তে চার রাকাআত নফল নামায পড়ার কথা বলেছেন। হাদীসে নববীর দৃষ্টিতে তার একথার মধ্যে কোনো ত্রুটি নেই। কেননা নফলের মাধ্যমে ফরযের ক্ষতিপূরণ হয়। তিরমিযী শরীফে আছে, হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন,

سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز و جل انظروا هل لعبدي من تطوع ؟ فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك ،

অর্থাৎ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমল থেকে নামায সম্পর্কে সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে। যদি নামায ভাল হয় তাহলে সে অবশ্যই সফলকাম ও কামিয়াব হয়ে যাবে। আর যদি নামায বিনষ্ট হয় তবে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। **যদি তার ফরয নামাযে কোনো ত্রুটি থাকে তবে প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা বলবেন, তোমরা দেখ, আমার বান্দার কোনো নফল আছে কি না? তখন এর দ্বারা তার ফরযের ত্রুটি পূর্ণ করবেন। অতঃপর অন্যান্য আমলও অনুরূপ হবে।** (তিরমিযী)

হযরত আবূ হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর বর্ণিত এ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করে কোনো কোনো আলিম বলেছেন, পরকালে ফরযগুলোর ক্ষতিপূরণ নফল দ্বারা হতে পারে। কাযী আবূ বকর ইবনুল আরাবী (র.) এর উক্তিও এটাই। কিন্তু অন্যান্য আলিম যেমন ইমাম বায়হাকী (র.) এর মত হলো, ফরযগুলোতে যদি পরিমাণগত ত্রুটি থেকে যায় অর্থাৎ ফরযগুলো যদি ছুটে যায় তবে এগুলোর ক্ষতিপূরণ হাজার হাজার নফলও করতে পারে না। হ্যাঁ, যদি ধরনগত ত্রুটি থেকে যায় তবে নফলগুলো দ্বারা এর ক্ষতিপূরণ হতে পারে। আর আলোচ্য অনুচ্ছেদের হাদীসটিতে ধরনগত ত্রুটি উদ্দেশ্য।

মাজমাউয্ যাওয়ায়িদ, বাবু ফরদ্বিস্ সালাত এর মধ্যেও অনুরূপ একটি হাদীস রয়েছে। ইমাম তাবারানী (র.) এর আল মুজামুল কবীর সূত্রে হযরত আব্দুল্লাহ ইবন কুরাত রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে মারফূ’ সূত্রে বর্ণিত আছে-

من صلى صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحاته حتى تتم

অর্থাৎ কেউ যদি কোনো নামায অপূর্ণাঙ্গভাবে আদায় করে তবে তার নফল থেকে তাতে বৃদ্ধি করা হবে। আল্লামা হায়ছামী (র.) এ হাদীসের বর্ণনাকারীগণকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

ফতওয়া ও তাকওয়া

প্রকাশ থাকে যে, কোনো কোনো বিষয়ে ফতওয়ার মধ্যে রুখসত (ছাড়) থাকলেও সূফীয়ায়ে কিরাম সেক্ষেত্রে আমলের ক্ষেত্রে আযীমত তথা কঠোরতা অবলম্বন করতেন।

সুফী বুযুর্গগণ নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে অনেক হালাল বস্তু খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। ইবাদত বন্দেগীর একাগ্রতায় বিঘ্ন সৃষ্টি হলে নফসকে শায়েস্তা করার উদ্দেশ্যেও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। যেমন- পূর্ববর্তী অনেক বুযুর্গ নামাযের কোনো সূক্ষ্ম আদবের মধ্যে শিথিলতা দেখা দিলে উক্ত নামায বার বার পড়তেন অথবা ক্ষতিপূরণের উদ্দেশ্যে নফল নামায ও সদকা ইত্যাদি আদায় করতেন। ফতওয়া নয়, বরং তাকওয়ার বিবেচনায় তারা এরূপ করতেন। উদাহরন স্বরূপ, মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) এর লিখিত **‘তাযকিরাতুল আউলিয়া’** নামক কিতাবে বায়েজীদ বোস্তামী (র.) সম্পর্কে বর্ণিত একটি ঘটনা নিম্নে পেশ করা হলো।

একবার এশার নামায শেষ করে বায়েজীদ বোস্তামী (র.) এর মনে হলো, নামায ঠিক কবুলের উপযোগী হল না। কাজেই তিনি আবার নামায পড়লেন। কিন্তু এবারেও সে একই অবস্থা। যথাযথভাবে নামায আদায়ের জন্য তিনি সারা রাত ধরে এশার নামায পড়লেন। কিন্তু তবুও তার আত্মতুষ্টি এল না। হতাশ হয়ে তিনি ভাবলেন, যেমন তিনি, তেমনি তার নামাযও। এটা কি করে ভালো হবে? তখন তিনি আল্লাহর উদ্দেশ্যে বললেন, নামাযনিষ্ঠ দাস হবার বহু চেষ্টা করলাম। কিন্তু সব বৃথা গেল। এখন আমি আর কী করতে পারি? আপনি আমাকে আপনার বেনামাযী বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করে দিন। (তাযকিরাতুল আউলিয়া)

বায়েজীদ বোস্তামী (র.) পূর্বোক্ত যে কারণে নামায বার বার পড়েছেন ফিকহের

ফতওয়া অনুযায়ী উক্ত কারণে নামায দোহরাতে হয় না। কিন্তু তিনি তাসাওউফের উচ্চ মাকাম ও তাকওয়ার দিক বিবেচনায় নামায বার বার পড়েছেন। হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.)ও নামাযে ওয়াসওয়াসা হলে এক রাকাত ফরযের পরিবর্তে চার রাকাত নফল নামায পড়ার কথা তাকওয়া ও তাসাউফের বিবেচনায়ই বলেছেন। এটা ফতওয়া নয়। সূতরাং এ নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

সুফিয়ান সাওরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি খুশু সহকারে নামায পড়ে না তার নামায ফাসিদ। এক রেওয়ায়েতে হযরত হাসান বসরী (র.) এর উক্তি বর্ণিত আছে যে, যে নামাযে অন্তর উপস্থিত নয় সে নামায দ্রুত আযাবের দিকে নিয়ে যায়। হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন, যে ব্যক্তি নামাযে ইচ্ছাপূর্বক ডান ও বামের ব্যক্তিকে চিনতে পারে তার নামায হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বান্দা নামায পড়ে অথচ তার জন্যে ছয় ভাগের এক এবং দশ ভাগের এক অংশও লিখিত হয় না। কেবল ততটুকুই লিখা হয় যতটুকু সে বুঝে শুনে পড়ে। আব্দুল ওয়াহিদ ইবনে যায়দ বলেন, আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, বান্দা তার নামাযের ততটুকু অংশ পায় যতটুকু সে অন্তর উপস্থিত রেখে পড়ে। পরহেযগার ফিকাহবিদ ও আখিরাতের আলেমগণের পক্ষ থেকে এ ধরনের অসংখ্য উক্তি বর্ণিত আছে। (ইহ্ইয়াউ উলুমুদ্দীন, বঙ্গানুবাদ প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৮)

এখন প্রশ্ন হলো, যদি আব্দুল করিম সিরাজনগরী কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর বিষয়ে আপত্তি করেন তাহলে উল্লেখিত বুযুর্গানের বক্তব্যের ব্যাপারে কি ফতওয়া প্রদান করবেন?

তাকওয়ার বিচারে নিজ ফতওয়ার বিপরীতে ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর আমল

শরীয়তের একটি উচ্চ স্তর হলো তাকওয়া। ইমাম আবূ হানিফা (র.) তাকওয়ার বিবেচনায় নিজ ফতওয়ার বিপরীতে আমল করেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর এরূপ একটি ঘটনা সুফী সম্রাট মাওলানা ফরিদ উদ্দিন আত্তার (র.) (জন্ম ৫১৩ হিজরী, মৃত্যু ৬২৯ হিজরী) তার লিখিত **'তাযকিরাতুল আউলিয়া'** কিতাবে উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ-

نقل است که در بازار می گشت مقدار ناخنی گل بر جامه او۔ چکید به اب دجله رفت و می شست گفتند: ای امام! تو مقدار معین نجاست بر جامه خصت می دہی قدر گل را می شویی ؟ گفت اری ان فتوی است وایں تقوی است۔ چنانکه رسول علیه السلام نیم گرده بلال را اجازت نداد که مدخر کند و یک ساله زنان را قوت نهاد (تذکرة الاولیاء)

অনুবাদ : বর্ণিত আছে- একদিন বাজারে তাঁর (আবূ হানীফা র. এর) কাপড়ে কিছু কাদামাটি লেগে গেল। তিনি তখনই নদীতে গিয়ে তা ধুয়ে ফেললেন। কেউ তাকে বললেন, আপনি যে পরিমাণ ময়লা জায়িয রেখেছেন, এতো তার চেয়ে কম, না ধুইলেও চলত। তিনি বললেন, আমি যা বলেছি, ওটা ফতওয়ার কথা। আর যা করলাম তা তাকওয়া-পরহেযগারী। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে বলেন, কোনো সময় আধখানা রুটি জমা করে রাখবে না। অথচ কোনো এক সময় তিনি তাঁর পত্নীদের জন্য প্রায় এক বছরের খাবার জমা করে রেখেছিলেন।

উক্ত ঘটনা থেকে প্রমাণিত হলো যে, উচ্চ স্তরের ওলী আল্লাহগণ তাদের মর্যাদা অনুযায়ী সতর্কতা অবলম্বন করতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কাজ করে থাকেন। এটা হযরত আবূ লুবাবা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর নিজেকে উস্তনে হান্নানার সাথে বেধে রাখার মাধ্যমে তাওবা কবুল হওয়ার একটা পদ্ধতি অবলম্বনের সাথে তুলনা করা যায়।

হাদীসের অনুবাদ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) তদীয় যখিরায়ে কারামতের 'তাযকিয়াতুন নিসওয়ান' কিতাবে একটি হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছেন। আর আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং উক্ত হাদীসের প্রথমাংশ উল্লেখ না করে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পাঠকদের বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করেছেন। যখীরায়ে কারামতে উল্লেখিত হাদীসের অনুবাদ নিম্নরূপ :

হযরত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাজিরীন ও আনসারদের জামাতে ছিলেন। ইত্যবসরে একটি উট সেখানে এসে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সিজদা করল। অতঃপর হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাহাবীগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনাকে চতুষ্পদ জানোয়ার এবং বৃক্ষাদি

সিজদা করে; কিন্তু আমরা আপনাকে সিজদা করার পক্ষে বেশি হকদার। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন **তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং নিজের ভাইকে (অর্থাৎ তোমাদের নবীকে) সম্মান কর এবং ভালবাস।** যদি কাউকে সিজদা করার আদেশ থাকত, তবে স্ত্রীদের প্রতি নির্দেশ দিতাম তাদের স্বামীকে সিজদা করার।

এখানে আব্দুল করিম সিরাজনগরী এ বর্ণনাকে হযরত কারামত আলী জৌনপুরীর ভ্রান্ত আকীদা বলেছেন। অথচ তিনি হাদীসের অনুবাদ উল্লেখ করেছেন মাত্র।

উরোক্ত হাদীস শরীফটির মূল মতন নিম্নরূপ :

মিশকাত শরীফে আছে-

عَنْ عَائِشَةَ أَنّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ ، فَجَاءَ بَعِيرٌ فَسَجَدَ لَهُ ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ : يَا رَسُولَ اللّٰهِ ، تَسْجُدُ لَكَ الْبَهَائِمُ وَالشَّجَرُ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ . قَالَ : " اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ ، فَإِنَّهُ لا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

উক্ত হাদীসের শব্দ أَخَاكُمْ এর বঙ্গানুবাদ হচ্ছে– তোমাদের ভাই। অনুবাদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম করার সুযোগ নেই। মূলত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনয় প্রকাশার্থে এখানে নিজেকে ভাই বলে উল্লেখ করেছেন। যা মিশকাত শরীফের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার আল্লামা মোল্লা আলী কারী রচিত মিরকাত গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে উল্লেখিত রয়েছে। রেজাখানীদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমীও তার কিতাবে উক্ত হাদীসের অনুবাদে أَخَاكُمْ এর অনুবাদ করেছেন "তোমাদের ভাই"।

আহমদ রেজা খানও তার খুতবায় আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাই উল্লেখ করেছেন।

পাঠক লক্ষ্য করুন, আব্দুল করিম সিরাজনগরীর কথা অনুযায়ী যদি কারামত আলী জৌনপুরী (র.) ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী হন তাহলে আহমদ ইয়ার খান নঈমী ও আহমদ রেজা খানও ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী।

প্রকাশ থাকে যে, আরবী ভাষায় أَخَاكُمْ শব্দের অর্থ তোমাদের ভাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে উক্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন। সিরাজনগরীর বক্তব্য অনুযায়ী যদি أَخَاكُمْ শব্দের বাংলায় "তোমাদের ভাই" বলা বেয়াদবি হয় তাহলে আরবীতে তার প্রতিশব্দ ব্যবহার করার কারণে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আব্দুল করীম সিরাজনগরী কি কোনো মন্তব্য করার দুঃসাহস দেখাবেন? কত বড় বেয়াদব হলে সিরাজনগরী এমন চিন্তাধারা লালন করতে পারেন?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনা সাহাবীর ভাই, চাচা ইত্যাদি বলা

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক সময় সাহাবায়ে কিরামের নিকট নিজেকে ভাই হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। এটা ছিল তাঁর চরম বিনয়। তবে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) সাধারণত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাই বলে সম্বোধন করতেন না। কিন্তু আহমদ ইয়ার খান নঈমী লিখেছেন, কখনো সাহাবায়ে কিরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাই বলে সম্বোধন করেননি (মিরআত,খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩০০)। তার এ বক্তব্য মূলত অজ্ঞতাপ্রসূত। কেননা বিভিন্ন হাদীসে দেখা যায় বিভিন্ন সাহাবী বিভিন্ন সময়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাই, চাচা ইত্যাদি বলেছেন। যেমন-

যখন আবূ বকর (রা.)-এর নিকট হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়িশা (রা.)-এর বিবাহের পয়গাম পাঠালেন তখন আবূ বকর (রা.) জবাব দিলেন-

أو تصلح له وهي ابنة أخيه

অর্থাৎ সে (আয়িশা) কি তাঁর জন্য বৈধ হবে ? কেননা সে তো তাঁর ভাইয়ের মেয়ে। (সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ১২৯)

যুরকানীর বর্ণনায় আছে, এর জবাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

انت اخي وانا اخوك في الاسلام

অর্থাৎ ইসলামের বিবেচনায় তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই। (যুরকানী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩০)

এ বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আবূ বকর (রা.) নিজেকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাই বলেছেন। আবার রাসূলে পাক (সা.)ও ইসলামের বিবেচনায় আবূ বকর (রা.)-কে তাঁর ভাই এবং নিজেকে আবূ বকর (রা.)-এর ভাই বলেছেন।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর একটি চিঠির জবাবে নিজের গৌরবগাঁথা বর্ণনা করে হযরত আলী (রা.) যে পংক্তিমালা রচনা করেছিলেন তার মধ্যে রয়েছে :

محمد النبي أخي وصهري – وحمزة سيد الشهداء عمي

অনুবাদ : নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ভাই ও শশুর এবং শহীদগণের সরদার হযরত হামযা আমার চাচা। (কানযুল উম্মাল, খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১১২)

ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর 'জামিউল আহাদীস' ও যুরকানীর মধ্যেও এ বর্ণনা রয়েছে।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী তার 'মিরআত' গ্রন্থে মিশকাত শরীফের **باب بلوغ الصغير وحضانته في الصغر** (শিশুদের প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ও শৈশবে তাদের লালন পালন) অধ্যায়ের ১ম পরিচ্ছেদে বুখারী-মুসলিম থেকে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন। উক্ত হাদীসে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হুদাইবিয়ার সন্ধি পরবতীর্তে মক্কা গমন এবং তিন দিন তাঁর অবস্থানের পর মদীনায় প্রত্যাবর্তন প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেন- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় তাশরীফ নিলেন, সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি প্রত্যাবর্তনের জন্য রওয়ানা হলেন। তখন হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মেয়ে পিছু পিছু চাচা জান চাচা জান বলে ডাকতে থাকলেন। (বুখারী, মুসলিম)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আহমদ ইয়ার খান নঈমী তার 'মিরআতুল মানাজীহ' কিতাবে লিখেছেন "যদিও হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা ছিলেন, এ দিক থেকে ঐ মেয়েটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ চাচাত বোন ছিলেন। কিন্তু যেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ও যায়েদ বিন হারিসাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তিনজনই সুয়াইবিয়ার দুধপান করে ছিলেন এ কারণে **হামযা**

রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ভাই ছিলেন। তাছাড়া আরবের লোকেরা বুযুর্গদেরকে চাচা বলে সম্বোধন করতেন। (মিরআতুল মানাজীহ ৫ম খণ্ড, ২০৪ পৃষ্ঠা)।

আহমদ ইয়ার খান নঈমীর বক্তব্য থেকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো প্রমাণিত হয়–

১. হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মেয়ে আম্মারাহ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচাত বোন।
২. হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চাচা।
৩. অন্য এক সূত্রে হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দুধ ভাই।
৪. হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর মেয়ে কর্তৃক রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে চাচা বলে সম্বোধন করা বৈধ।

রেজাখানীরা বিভিন্ন ফতওয়ায় বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ভাই, চাচা, মামা, স্বামী ইত্যাদি বলা জঘন্য পাপ। অথচ আহমদ ইয়ার খান নঈমী সাহেব রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আম্মারা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর চাচা, হামযা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ভাই ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করে তাদের ফতওয়া অনুযায়ী কী পরিমাণ পাপের ভাগীদার হয়েছেন এ প্রশ্ন তাদের কাছে রইল।

নবীজিকে ভাই বলল রেজাখানীরা

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো কোনো হাদীসে বিনয় প্রকাশার্থে সাহাবায়ে কিরামের নিকট নিজেকে ভাই হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এসব হাদীসের اخ শব্দের অনুবাদে 'ভাই' লিখলে যদি নবীজীকে ভাই বলা হয়ে যায় তাহলে রেজাখানীরাও নবীজিকে ভাই বলেছেন। যেমন– রেজাখানীদের 'হাকীমুল উম্মত' খ্যাত আহমদ ইয়ার খান নঈমী অনেক হাদীসের অনুবাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে ভাই বলেছেন। যেমন :

'মিরআতুল মানাহিয' এর ৫ম খণ্ডের ১৩৯ পৃষ্ঠায় اعبدوا ربكم واكرموا اخاكم এর অনুবাদ লিখেছেন এভাবে,

اپنے رب کی عبادت کرو اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو۔ (مرآۃ المناجیح۔ جلد ۵ صفحہ ۱۲۹)

অর্থ: তোমাদের রবের ইবাদত কর এবং তোমাদের ভাইকে সম্মান কর।

এমনকি একই আলোচনায় তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিরেট মানুষও বলেছেন। যেমন তিনি লিখেছেন–

مطلب یہ ہے کہ میں تمھاری طرف خالص بشر اولاد ادم ہوں–نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا–

অর্থ: মোটকথা, আমি তোমাদের কাছে নিরেট মানুষ, আদম সন্তান, না আল্লাহ, না আল্লাহর পুত্র।

উক্ত কিতাবের ২০৩ পৃষ্ঠায় অন্য একটি হাদীস–

وقال لزيد انت اخونا و مولانا

এর অনুবাদে লিখেছেন,

اور حضرت زید سے فرمایا تم ہماری بھائی ہماری پیار ہو۔(مر آۃ المناجیح۔ جلد ۵ صفحہ ۲۰۳)

অর্থ: তিনি হযরত যায়দ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, তুমি আমার ভাই এবং প্রিয়।

মুহাম্মদী কুতুবখানা কর্তৃক ছাপানো **খুতবাতে রেজভিয়ার জুমআর দ্বিতীয় খুতবায় আহমদ রেজা খান সাহেব তার নিজের ভাষায় আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর অনেক প্রশংসা করেছেন, যাতে হযরত আলী (রা.) কে 'রাসূল (সা.) এর ভাই' বলেছেন**। উক্ত খুতবায় আলী (রা.) সম্পর্কে তিনি লিখেছেন-

دفاع المعضلات و المصائب اخی الرسول وزوج البتول (خطبات رضويه)

অর্থ: সংকট ও মুসীবত দূরকারী, রাসূলের ভাই, ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর স্বামী।

দারুল উলুম মাজহারুল ইসলাম বেরেলভী শরীফ এর শায়খুল হাদীস মৌলভী হেকিম গোলাম ইজদানী এর অনুবাদ করেছেন-

ترجمہ: سختیوں اور پریشانیوں کے دفع فرمانے والے، برادر رسول اور شوہر بتول۔

অর্থ: সংকট ও মুসীবত দূরকারী, রাসূলের ভাই, ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর স্বামী।

উপরোক্ত ইবারতসমূহের অনুবাদ ও ব্যাখ্যায় যে কয়েকটি বিষয় বের হয়ে আসে সেগুলো হলো-

১. হাদীস শরীফে কোনো মুসলমানকে 'ভাই' বললে এর অনুবাদের সময় ঠিক যেভাবে বলেছেন সেভাবেই করতে হবে। অথচ শেখ আব্দুল করিমের চিন্তাধারা অনুযায়ী এটা বেয়াদবি।

২. রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিরেট বশর ও আদম (আ.) এর সন্তান। এটা আহমদ ইয়ার খান নঈমী এর উক্তি। তবে শেখ আব্দুল করিম এটাকে চরম বেয়াদবি মনে করেন।

৩. আহমদ রেজা খান সাহেব তার বক্তব্যে আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ভাই বলে আখ্যায়িত করেছেন।

৪. রেজাখানীরা কানযুল ঈমানের বঙ্গানুবাদের ভূমিকায় রেজা খান সাহেবের অনুবাদকে তাফসীরসম্মত অনুবাদ দাবি করলেও বিভিন্ন হাদীসের অনুবাদে রেজাখানী নঈমী সাহেব প্রথমে শাব্দিক অনুবাদ করেছেন, সাথে সাথে অনেক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। যদি শাব্দিক অনুবাদই যথেষ্ট হতো তাহলে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হতো না।

প্রকাশ থাকে যে, কোনো মুসলমানকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ভাই বলা তাঁর চরম বিনয়ের বহি:প্রকাশ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মুসলমানের নিকট সর্বোচ্চ সম্মানের পাত্র, তথাপি হাদীসের অনুবাদে তাঁর বাণীকেই ঠিক রাখা বাঞ্ছনীয়। প্রয়োজনে পরবর্তীতে ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। যেমন আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র.) ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অনুরূপ আহমদ ইয়ার খান নঈমীও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। **ব্যাখ্যা না খুঁজে কেবল অনুবাদের উপর ফতওয়া দিলে আহমদ ইয়ার খান নঈমী ও আহমদ রেজাখান সাহেবের অনুবাদও বাতিল আকীদার তালিকায় সংযুক্ত হয়ে যাবে**। এ হিসেবে দেখা যাবে রেজাখানীরাও নবীজীকে ভাই বলেছেন।

রেজাখানীদের দৃষ্টিতে সাহাবায়ে কিরাম কি রাসূল (সা.) এর ভ্রাতৃতুল্য?

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন হাদীসে বিভিন্ন সাহাবীকে ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। রেজাখানীরাও এর শাব্দিক অনুবাদ করেছেন। তাহলে তাদের দৃষ্টিতে কি সাহাবায়ে কিরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম এর ভ্রাতৃতুল্য? যেমন দেখুন আহমদ ইয়ার খান নঈমীর কয়েকটি অনুবাদ:

روایت ہے حضرت عمر بن خطاب سے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم ﷺ سے عمرہ کے لئے جانے کی اجازت مانگی۔ فرمایا اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاء میں یاد رکھنا۔ ہمیں بھول نہ جانا۔ (مرآۃ، شرح مشکوۃ۔ جلد:۳ ص۲۹۹)

অনুবাদ : হযরত ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ওমরা গমনের অনুমতি প্রার্থনা করলাম। তিনি তখন বললেন, হে আমার ভাই, আমাদেরকেও তোমার দুআর মধ্যে স্মরণ রাখবে, আমাদেরকে ভুলে যাবে না।

উক্ত হাদীসের অনুবাদে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভাই বলেছেন। নঈমী সাহেবের অনুবাদেও ভাই শব্দ উল্লেখ রয়েছে। এরকম অনুবাদের কারণে তার ব্যাপারে রেজাখানীদের ফতওয়া কি?

روایت ہے انہیں سے فرمایا تم کہتے ہوں کہ ابو ہریرہ نبی ﷺ سے روایت زیادہ کرتے ہیں۔ اور اللہ وعدہ والا ہے میرے مھاجر بھائیوں کو بازار میں چیخ پکار مشغول رکھتی تھی اور میرے انصاری بھائیوں کو ان کے مالوں میں کام کاج مشغول رکھتا تھا۔ (مرآۃ، شرح مشکوۃ۔ جلد۔:۸ ص۲۰۳)

উক্ত হাদীসের অনুবাদে মুহাজির ও আনসারদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক ভাই বলার কথা উল্লেখ রয়েছে।

রেজাখানীরা তাদের মূলনীতিতে কুরআন-হাদীসের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের দাবি করলেও আহমদ ইয়ার খান নঈমী উপরোক্ত হাদীসসমূহের শাব্দিক অনুবাদ করেছেন। আর শাব্দিক অনুবাদের ভিত্তিতে কারো আকীদা নির্ধারণ করা হলে রেজাখানীদের আকীদা এখানে কী হবে?

রেজাখানীদের অনুবাদে অমুসলিমদের সাথে নবীগণের ভ্রাতৃসম্পর্ক

রেজাখানীরা নবী-রাসূলগণের সাথে কারো কোনো ধরনের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ককে কুফরী মনে করে থাকে, সে সম্পর্ক যে বিবেচনাই হোক না কেন। অথচ দেখা

যায় পবিত্র কুরআনে হুদ (আ.), সামুদ (আ.) ও শুয়াইব (আ.) এর প্রসঙ্গে বর্ণিত আয়াতসমূহের অনুবাদ লিখতে গিয়ে **আহমদ রেজা খান সাহেব কানযুল ঈমানে উল্লেখিত নবীগণের সাথে তাদের অমুসলিম সম্প্রদায়ের ভাতৃসম্পর্কের কথা উল্লেখ করেছেন।** যেমন :

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ، (سورة الاعراف : ٦٥)

ترجمہ: اور عاد کی طرف انکی برادری سے ہود کو بھیجا۔ (کنز الایمان۔ صفحہ۲۳۰)

অনুবাদ : এবং ‘আদ’-এর প্রতি তাদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে হূদকে প্রেরণ করেছি। (বাংলা কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ২৯২)

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ، (سورة الاعراف : ٧٣)

ترجمہ: اور ثمود کی طرف انکی برادری سے صالح کو بھیجا۔ (کنز الایمان۔ صفحہ۲۳۱)

অনুবাদ : এবং ‘সামুদ’(সম্প্রদায়)-এর প্রতি তাদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে ‘সালিহ’-কে প্রেরণ করেছি। (বাংলা কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ২৯৫)

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ، (سورة الاعراف : ٨٥)

ترجمہ: اور مدین کی طرف انکی برادری سے شعیب کو بھیجا۔ (کنز الایمان۔ صفحہ۲۳۲)

অনুবাদ : মাদয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভ্রাতৃ-সম্পর্ক থেকে শো‘আয়বকে প্রেরণ করেছি। (বাংলা কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ২৯৭)

আদ ও সামুদ সম্প্রদায় এবং মাদয়ানবাসীদের অধিকাংশ মানুষ কাফির ছিল এবং তাদের কুফরীর কারণে তাদের উপর আযাব পর্যন্ত নাযিল হয়েছিল। উক্ত আয়াতে স্বদেশী হিসেবে নবীগণকে তাদের সম্প্রদায়ের ভাই হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আহমদ রেজাখান সাহেব এখানে ব্যাখ্যা না দিয়ে অনুবাদে ভাতৃসম্পর্ক (برادری) লিখেছেন। তাহলে তাদের ব্যাখ্যাসম্মত অনুবাদ দ্বারা তারা কি এটা মনে করে যে, উক্ত নবীগণের সাথে তাদের কাফির সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃসম্পর্ক ছিল অর্থাৎ নবীগণ তাদের কাফির সম্প্রদায়ের ভাই ছিলেন ?

আহমদ রেজা খান সাহেব উপরোক্ত আয়াতসমূহে উল্লেখিত اَخ শব্দের অর্থ ‘ভাই’ না লিখে ভ্রাতৃসম্পর্ক লিখেছেন। ‘ভাই’ এবং ‘ভ্রাতৃসম্পর্ক’-এর মধ্যে ব্যবধান কতটুকু আর এ অনুবাদ কতটুকু যথার্থ তা বিজ্ঞজনই বিবেচনা করবেন।

রেজাখানীরা নবী-রাসূলগণের বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত আরবী (اخ) শব্দের অর্থ ভাই লিখা হলে এ নিয়ে অপব্যাখ্যা শুরু করে। রেজাখানীরা সম্ভবত ভাই বলতে শুধু রক্তের সম্পর্ক বুঝে থাকে। অথচ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছাড়াও বিভিন্ন দিক থেকে ভ্রাতৃত্ব হতে পারে, যা এ আয়াত থেকে বুঝা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য ভ্রাতৃত্ব বিভিন্ন দিক থেকে হতে পারে। যেমন-

প্রথমত: নসবী বা বংশীয় সম্পর্কের দিক থেকে। যেমন দুই সহোদরের মধ্যে সম্পর্ক বা অন্যান্য রক্ত সম্পর্কীয় ভ্রাতৃত্ব। যেমন আলী (রা.) রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর ভাই বলেছেন।

দ্বিতীয়ত: একই দেশ ও একই সম্প্রদায়ের দিক থেকে ভ্রাতৃত্ব। যেমন- পূর্বোক্ত আয়াত সমূহে উল্লেখিত হয়েছে।

তৃতীয়ত: দ্বীনী দৃষ্টিকোণ থেকে ভ্রাতৃত্ব। যেমন পবিত্র কুরআনে রয়েছে - **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** -নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। (সূরা হুজুরাত, আয়াত ১০)

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবূ বকর (রা.)-কে বলেছেন-

انت اخي وانا اخوك في الاسلام

অনুবাদ : ইসলামের বিবেচনায় তুমি আমার ভাই এবং আমি তোমার ভাই। (যুরকানী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৩০)

চতুর্থত: জাতিগত দিক থেকে ভ্রাতৃত্ব। যেমন আদম (আ.) এর সন্তান হিসেবে মানবজাতির পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব। হযরত আলী (রা.)-এর একটি কবিতায় রয়েছে-

النّاس من جهة التمثال أكفاء

ابــوهم ادم وامهـــمحواء

অনুবাদ : আকৃতির দিক থেকে সকল মানুষ সমান। তাদের সকলের পিতা আদম (আ.) এবং মাতা হাওয়া (আ.)।

হযরত ইবনে ওমর (রা.) ও ইমাম বুখারী (র.) এর রেজাখানীদের অভিযোগ

হযরত ইবনে ওমর (রা.) এর মতো বিশিষ্ট সাহাবী, ইমাম বুখারী (র.) ও ইমাম নববী (র.) সহ বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কিরামের উপর হারাম কাজ সম্পাদনের অভিযোগ রেজাখানীদের লেখায় পাওয়া যায়। তাদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমী ‘শানে হাবীবুর রহমান’ কিতাবে সূরা নূহ এর ৫৩ নং আয়াত **(রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আহবানকে তোমরা তোমাদিগের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করো না)** এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন : “এ আয়াতখানার দু’টি অর্থ রয়েছে- **دعاء الرسول** অর্থাৎ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে ডাকা, অথবা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এরই ডাক (রূহুল বায়ান)। সুতরাং প্রথমটির অর্থ দাঁড়ালো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে এভাবে ডেকো না যেভাবে তোমরা একে অন্যকে ডাকাডাকি কর। তদ্দারা প্রমাণিত হল যে শুধু **ইয়া মুহাম্মদ, ইয়া আহমদ, ইয়া ইবনু আবদিল্লাহ, অথবা হে ভাই, হে পিতা এ সমস্ত পদ্ধতিতে আহবান করা সম্পূর্ণ হারাম।** বরঞ্চ ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম), ইয়া হাবিবাল্লাহ, ইয়া শাফিয়াল মুযনিবিন ইত্যাদি উপাধি সম্বলিত শব্দ দ্বারা আহ্বান করো। এতে একথাও বুঝা গেল, হুজুর পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে যে কোন সময় যে কোন স্থান হতে ডাকা জায়েয। কিন্তু অবশ্যই তা সম্মান সূচক শব্দাবলী দ্বারা হতে হবে। অবশ্য কবিগণ কবিতার তাল ঠিক রাখার জন্য প্রয়োজনে শুধু মুহাম্মদ লিখে থাকেন। কিন্তু পাঠকগণকে উক্ত নাম মুবারক পড়ার সময় দরুদ শরীফসহ পড়তে হবে।” (শানে হাবিবুর রহমান, পৃষ্ঠা ১৭৪)

একই প্রসঙ্গে লেখক তার মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ মিরআতুল মানাজীহ কিতাবের ৩৭ ও ২৫৪ নং পৃষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামকে নাম ধরে সম্বোধন করা হারাম বলেছেন। (মিরআত, খণ্ড ১)

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, কবিতা ছাড়া ইয়া মুহাম্মাদু বলা সম্পূর্ণ হারাম। অথচ ইমাম বুখারী (র.) ‘আদাবুল মুফরাদ’ কিতাবে “ **باب ما يقول من خدرت رجله** (যার পা ঝিন ঝিন করবে সে কি বলবে)” শীর্ষক অধ্যায়ে পা ঝিন ঝিন করলে তা নিরসনের উপায় সম্পর্কে একটি হাদীস উল্লেখ করেন। হাদীসটি

নিম্নরূপ :

عن عبد الرحمن بن سعد قال خدرت رجل إبن عمر فقال له رجل اذكر احب الناس إليك فقال يا محمد ،

অনুবাদ : হযরত আব্দুর রহমান বিন সাদ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন হযরত ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর পা ঝিন ঝিন করল। এক ব্যক্তি বললেন, আপনি আপনার কাছে সর্বাধিক প্রিয় লোকের কথা স্মরণ করুন। **ইবনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন- يا محمد - ইয়া মুহাম্মদ (সা.)**। (আল আদাবুল মুফরাদ, পৃষ্ঠা ২০৭)

আহমদ ইয়ার খান নঈমীর বক্তব্য অনুযায়ী হযরত ইবনে ওমর (রা.) এখানে হারাম কাজ করেছেন।

এ হাদীস ইমাম বুখারী (র.) ছাড়াও ইমাম নববী (র.) ‘আল আযকার’ কিতাবে, ইমাম সাখাবী (র.) ‘আল কাউলুল বাদী’ কিতাবে, ইমাম মুনযিরী ‘আত তারগীব ওয়াত তারহীব’ কিতাবে উক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা যায় যে, **ইমাম বুখারী, ইমাম নববী (র.) সহ উপরোক্ত মুহাদ্দিসীনে কিরামের দৃষ্টিতে يا محمد বলা জায়িয। আবার ইবনে ওমর (রা.)ও এটাকে জায়িয মনে করেন। অথচ আহমদ ইয়ার খান নঈমী এটাকে হারাম বলেছেন।**

আহমদ রেজা খান সাহেবের বিরুদ্ধে আহমদ ইয়ার খান নঈমীর ফতওয়া

আহমদ ইয়ার খান নঈমীর উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় কবিতা ছাড়া রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করতে ইয়া আহমাদু, ইয়া মুহাম্মাদু বলা সম্পূর্ণ হারাম। অথচ **আহমদ রেজা খান বেরলভী সাহেব তার লিখিত ফতোয়ায়ে রেজবিয়্যাহ ১২নং খণ্ডে ‘আনওয়ারুল ইন্তিবাহ ফি হিল্লে নেদায়ে ইয়া রাসুলাল্লাহ’ নামক একখানা রিসালাহ সংযোজন করেছেন। উক্ত রিসালায় তিনি ইয়া আহমাদু, ইয়া মুহাম্মাদু, ইয়া রাসূলাল্লাহ ইত্যাদি বলার বৈধতার পক্ষে অনেক দলীল প্রদান করেছেন**। তন্মধ্যে ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী শরীফে বর্ণিত সালাতুল হাজতের হাদীসে বর্ণিত দুআটিও উল্লেখ করেছেন। উক্ত দুআয় ‘ইয়া মুহাম্মাদু’ বলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর

ওসীলা গ্রহণের পদ্ধতির উল্লেখ আছে। মুসলিম শরীফের ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহ) এর ‘আল আযকার’ কিতাবের হাওয়ালা উল্লেখ করে তিনি এ হাদীসও উল্লেখ করেছেন যে, কারো পা ঝিন ঝিন করলে ইয়া মুহাম্মাদু বললে তা প্রশমিত হবে। তাছাড়া তিনি শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর লিখিত ‘আখবারুল আখইয়ার’ কিতাবে বাহাউদ্দিন সাতাবী এর বর্ণিত কাশফে রূহের বর্ণনা পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে রয়েছে- ইয়া আহমাদু, ইয়া মুহাম্মাদু বলে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্বোধন করে যিকির করার বিভিন্ন পদ্ধতি। উক্ত আলোচনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়, **আহমদ ইয়ার খান নঈমী কবিতা ছাড়া আর কোথাও ইয়া আহমাদু, ইয়া মুহাম্মাদু বলা হারাম ফতওয়া দিয়েছেন। পক্ষান্তরে আহমদ রেজা খান সাহেব সর্বাবস্থায় ইয়া আহমাদু, ইয়া মুহাম্মাদু বলার স্বপক্ষে অনেক দলীল, প্রমাণ পেশ করে তা উত্তম কাজ প্রমাণ করেছেন**। রেজাখানীরা এখন কোনটি গ্রহণ করবেন? না বিরোধিতার কারণে যখন যা মনে আসে তাই হারাম ও কুফরী বলে ফতওয়া দিবেন ?

কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর উপর আরেকটি জঘন্য মিথ্যাচার

আব্দুল করিম সিরাজনগরী তার রচিত ‘ইজহারে হক্ব’ গ্রন্থে হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর প্রতি আরেকটি জঘন্য মিথ্যাচার করেছেন। হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর কিতাবে যা নেই তিনি তার নামে তা প্রচার করে যাচ্ছেন অবলীলায় এবং এর মাধ্যমে তার আকীদাকেও বাতিল বলছেন। আব্দুল করিম সিরাজনগরীর ইজহারে হক্ব-এ কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর যখীরায়ে কারামত নামক গ্রন্থের বাতিল আকীদাসমূহের মধ্যে যখীরায়ে কারামত বাংলা পৃষ্ঠা ৮৭ এর উদ্ধৃতি দিয়ে যা লিখা হয়েছে তা চরম মিথ্যাচার। কেননা ছারছীনা লাইব্রেরি ৩৮/৩, বাংলাবাজার, ঢাকা থেকে প্রকাশিত যখীরায়ে কারামত প্রথম খণ্ডের এ অংশ কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর লেখা নয়। বরং এটি প্রকাশক কর্তৃক সংযোজিত। এ বিষয়টিও বইটিতেও পরিষ্কার উল্লেখ আছে। তদুপরি কেন সিরাজনগরী তার সুপুত্র (!)-এর বরাতে এ বিষয়ে কারামত আলী জৌনপুরী (র.) কে দায়ী করলেন?

ইজহারে হক্ব গ্রন্থে কারামত আলী জৌনপুরী (র.) এর যখীরায়ে কারামত নামক

গ্রন্থের বাতিল আকীদার মধ্যে সূরা দোহার একটি আয়াতের অনুবাদকে সূত্রসহ উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে-

“তিনি আপনায় বিভ্রান্ত পেয়ে আপনাকে পথ দেখিয়েছেন।” (যখীরায়ে কারামত বাংলা পৃষ্ঠা ৮৭)”

অথচ যখীরায়ে কারামত **১**ম খণ্ডের ৭৬ থেকে ৯২ নং পৃষ্ঠা পর্যন্ত পরিশিষ্ট শিরোনামে প্রকাশক কর্তৃক সংযোজিত, যা অনুবাদ গ্রন্থটিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। এর নমুনা নিম্নে দেয়া হলো।

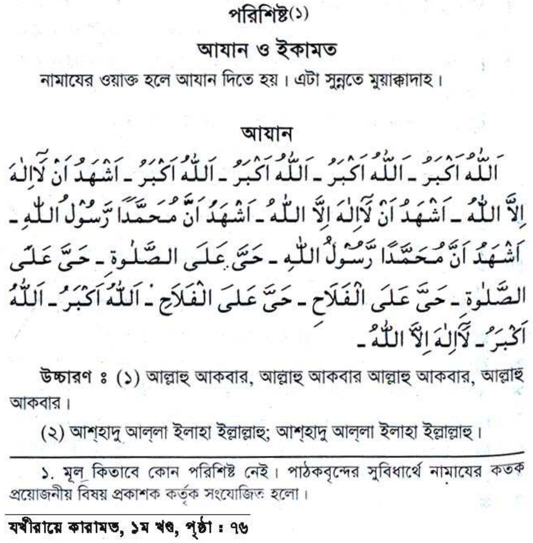

পরিশিষ্ট(১)

আযান ও ইকামত

নামাযের ওয়াক্ত হলে আযান দিতে হয়। এটা সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ।

আযান

اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ
اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ - اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ -
اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ - حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى
الصَّلٰوةِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - اَللّٰهُ اَكْبَرُ - اَللّٰهُ
اَكْبَرُ - لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -

উচ্চারণ ঃ (১) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার।

(২) আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু; আশ্‌হাদু আল্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।

---

১. মূল কিতাবে কোন পরিশিষ্ট নেই। পাঠকবৃন্দের সুবিধার্থে নামাযের কতক প্রয়োজনীয় বিষয় প্রকাশক কর্তৃক সংযোজিত হলো।

যখীরায়ে কারামত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৭৬

পাঠকগণ লক্ষ্য করুন, কারামত আলী জৌনপুরী (র.) যখীরায়ে কারামত কিতাবে যা লিখেননি এমনকি তার ইন্তেকালের বহু যুগ (**১৩১** বছর) পর ঢাকার বাংলা বাজার থেকে প্রকাশিত বঙ্গানুবাদে প্রকাশক কর্তৃক সংযোজিত বিষয়কে জানা সত্ত্বেও “মাওলানা কেরামত আলী জৌনপুরীর লিখিত যখীরায়ে কেরামত নামক গ্রন্থের বাতিল আক্বীদাসমূহ” শিরোনামের অন্তর্ভুক্ত করে তারা কিভাবে উল্লেখ করলেন? এটা কি জঘন্য মিথ্যাচার ও জালিয়াতি নয় ? এরূপ জঘন্যতম মিথ্যাচারের নজীর পৃথিবীতে আছে কিনা আমাদের জানা নেই। এ থেকে বুঝা গেল আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং রেজাখানীরা হক্কানী ওলী-বুযুর্গদের খিদমতকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে কিতাব জালিয়াতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। ইয়াহুদীদের মারাত্মক বদগুণ তাহরীফে তারা অত্যন্ত সিদ্ধহস্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

মাজাযে আকলী এর ব্যবহার সম্পর্কে শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং এর অজ্ঞতা

কোনো শব্দের অর্থ বক্তার প্রকাশ্য ধারণা মতে যার জন্য গঠন করা হয়েছে বিশেষ সম্পর্কের কারণে তা ব্যতীত অন্যদিকে সম্পৃক্ত হলে তাকে **مجاز عقلى** বলে। কুরআন হাদীসে মাজাযে আকলীর অনেক ব্যবহার রয়েছে। যেমন- আল্লাহ তাআলার বাণী–

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (الانفال : ٢)

অর্থ: আর যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয় কালাম তখন তাদের ঈমান বেড়ে যায়। (সূরা আনফাল, আয়াত ০২)

এখানে আয়াত তিলাওয়াতের প্রতি ঈমান বৃদ্ধির সম্বন্ধ **مجاز عقلى** হিসেবে করা হয়েছে। কারণ প্রকৃতপক্ষে ঈমান বৃদ্ধিকারী হচ্ছেন আল্লাহ। আর আয়াত হচ্ছে ঈমান বৃদ্ধির কারণ।

অনুরূপভাবে আল্লাহর বাণী,

يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (مزمل :١٧)

অর্থ: যে দিন বালককে বৃদ্ধ করে দিবে। (সূরা মুয্‌যাম্মিল, আয়াত ১৭)

এখানে দিনকে বার্ধক্যদানকারী বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে বার্ধক্যদানকারী হলেন আল্লাহ। আর দিন হচ্ছে তার মহল বা কারণ।

আল্লাহর বাণী-

وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (نوح : ٢٣)

অর্থ: আর তারা বলেছে, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ কর না এবং ত্যাগ কর না ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়ায়ুক ও নছরকে, অথচ এগুলো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। (সূরা নূহ, আয়াত ২৩)

এখানে মুর্তির প্রতি পথভ্রষ্ট করার সম্বন্ধ মাজাযে আকলী হিসেবে করা হয়েছে।

কারণ, এগুলো হচ্ছে পথভ্রষ্টতার উপলক্ষ মাত্র। হেদায়াত ও গুমরাহীর প্রকৃত মালিক হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ।

ফেরাউনের কাহিনী বর্ণনায় আল্লাহ বলেন,

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا (غافر : ٣٦)

অর্থ: এবং ফেরাউন বলল, হে হামান তুমি আমার জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ কর (সূরা গাফির, আয়াত: ৩৬)

উক্ত আয়াতে হামানের প্রতি দালান তৈরীর সম্বন্ধ মাজাযে আকলী হিসেবে করা হয়েছে। কারণ, সে হচ্ছে নির্দেশদাতা। সে নিজে নিজে তৈরী করেনি। নির্মাতা হচ্ছে তার কর্মচারী।

নিসবতের ভিন্নতার কারণে অর্থের ভিন্নতা

নিসবতের ভিন্নতার কারণে অর্থের ভিন্নতা হয়ে থাকে। **'রাজা অমুককে হত্যা করেছেন' বা জল্লাদ অমুককে হত্যা করেছে' এ ক্ষেত্রে রাজা ও জল্লাদের প্রতি হত্যার সম্পর্ক ভিন্ন ভিন্ন অর্থে হয়েছে।** ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ করেছেন এর হবে অর্থ হবে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ করেছেন, আর যখন বলা হয় বান্দা করেছে তখন তার অর্থ হবে– বান্দার ইচ্ছা ও জ্ঞানের পর তার মধ্যে আল্লাহ কাজের শক্তি সৃষ্টি করেছেন। এখানে আল্লাহর সাথে কাজকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে এক অর্থে এবং বান্দার সাথে কাজের সম্পর্ক করা হয়েছে অন্য অর্থে। যেমনিভাবে হত্যার সাথে রাজা ও জল্লাদ ভিন্ন ভিন্নভাবে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে দুজনকেই হত্যাকারী বলা হয়েছে।

এ রকম অর্থের ভিন্নতার দলীল পবিত্র কুরআনে অনেক রয়েছে। একই কাজের সম্পর্ক কখনো ফেরেস্তার সাথে, কখনো আল্লাহর সাথে করা হয়েছে।

যেমন, আল্লাহর বাণী-

قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ (السجدة: ١١)

অর্থ: বলুন, তোমাদের প্রাণ হরণের দায়িত্বে থাকা ফেরেস্তা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। (সূরা সিজদাহ, আয়াত : ১১)

অন্য আয়াতে আছে,

اللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا (زمر: ٤٢)

অর্থ: আল্লাহ মৃত্যুর সময় মানুষের প্রাণ হরণ করেন। (সূরা যুমার, আয়াত: ৪২)

উক্ত দুই আয়াতে মানুষের মৃত্যুদানকারী একবার আল্লাহ ও অন্যবার ফেরেস্তা বলা হয়েছে।

অন্য আয়াতে এসেছে–

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (واقعة: ٦٣)

তোমরা যে বীজ বপন করেছ তা ভেবে দেখেছ কি? (সূরা ওয়াকিআহ, আয়াত : ৬৩)

ঠিক অন্য আয়াতে ফসল উৎপাদনের বিষয়ে বলা হয়েছে,

أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (عبس: ٢٥–٢٧)

অর্থ : আমি পর্যাপ্ত পানি বর্ষন করেছি। অতপর পৃথিবীকে বিদীর্ণ করেছি; এরপর তাতে উৎপন্ন করেছি শষ্য। (সূরা আবাসা, আয়াত: ২৫-২৭)

এখানে শষ্য উৎপাদনের সম্পর্ক প্রথম আয়াতে মানুষের সাথে ও শেষ আয়াতসমূহে আল্লাহর সাথে করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে এক আয়াতে বলা হয়েছে,

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (مريم : ١٧)

অর্থ : অতঃপর আমি তার কাছে আমার রূহ প্রেরণ করলাম। যে তার নিকট পূর্ণ মানব আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করল। (সূরা মরিয়ম, আয়াত ১৭)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে,

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا (الانبياء: ٩١)

অর্থ : অতঃপর আমি তার মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৯১)

এখানে ফুৎকারকারী হলেন জিব্রাঈল (আ.)। কিন্তু আল্লাহ নিজের দিকে ফুৎকারের সম্বন্ধ করেছেন।

অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার বাণী,

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (القيامة:١٨)

অর্থ : অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি আপনি তখন সেই পাঠের অনুরূপ করুন। (সূরা কিয়ামাহ আয়াত : ১৮)

প্রকাশ থাকে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যিনি

তিলাওয়াত করেছিলেন তিনি হলেন জিবরাঈল (আ.)। কিন্তু আল্লাহ তিলাওয়াতের সম্পর্ক নিজের দিকে করেছেন।

অন্য আয়াতে আছে,

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ رَمَى (الانفال: ١٧)

অর্থ : সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি যখন নিক্ষেপ করেছিলে তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, আল্লাহই করেছিলেন। (সূরা আনফাল আয়াত : ১৭)

উপরোক্ত আয়াতে হত্যার সম্বন্ধ আল্লাহ তাআলা মুজাহিদদের প্রতি না করে নিজের প্রতি করেছেন। অনুরূপভাবে কঙ্কর নিক্ষেপের সম্পর্ক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি না করে তাঁর নিজের দিকে করেছেন। এ কথার অর্থ এই নয় যে, মুজাহিদগণ হত্যা করেননি বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কঙ্কর নিক্ষেপ করেননি। বরং কাজের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ নিজের দিকে একে সম্পর্কিত করেছেন।

হাকীকত ও মাজায এর ব্যবহার এবং নিসবতের ভিন্নতার কারণে অর্থের উপরোক্তরূপ ভিন্নতা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে লা-মাযহাবী, সালাফী, ওহাবীরা কয়েকটি উপাধি যেমন সায়্যিদ, মাওলানা, গাউস, কিবলাহ ইত্যাদির ব্যবহারকে শিরক মনে করে থাকে। আর সিরাজনগরী গং তাদের অনুসরণ করে আউলিয়ায়ে কিরাম সম্পর্কে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়।

علمه شديد القوى আয়াতের
অনুবাদ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি

আব্দুল করিম সিরাজনগরী 'আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া' এর মধ্যে সূরা নজমের একটি আয়াতের অনুবাদ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। সূরা নজমের এ আয়াত হলো :

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى

অর্থ : তাকে শিক্ষা দান করেন এক শক্তিশালী ফিরিস্তা। (মাআরিফুল কুরআন)

এ আয়াতের অনুবাদের সমালোচনা করতে গিয়ে আব্দুল করিম সিরাজনগরী যে আলোচনা করেছেন তার সারকথা হলো– شديد القوى এর দ্বারা জিবরীলে আমীন

(আ.) উদ্দেশ্য নেয়া বিদআতী, মু'তাজিলী ও ভ্রান্ত দার্শনিক সম্প্রদায়ের আকীদা, সুন্নী আকীদা নয়। (ইজহারে হক্ব, পৃষ্ঠা ১৮০)

প্রকাশ থাকে যে, **রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষক হলেন আল্লাহ তাআলা নিজেই।** অথচ এক আয়াতে বলা হয়েছে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শিক্ষা দেয়েছেন আল্লাহ এবং অন্য আয়াতে বলা হয়েছে জিবরাঈল (আ.)। প্রথমোক্ত আয়াতে আল্লাহপাককে প্রকৃত অর্থে শিক্ষক বলা হয়েছে। অন্য আয়াতে জিব্রাইল (আ.)-কে শিক্ষক বলা হয়েছে বার্তাবাহক হিসেবে মাজাযী তথা রূপক অর্থে। এ ব্যাপারে হকপন্থী আলিমগণের মধ্যে কোনো দ্বিমত নেই। এমনকি ফতওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দের মধ্যেও এ ব্যাপারে দীর্ঘ আলোচনা করে প্রমাণ করা হয়েছে যে, **আল্লাহই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রকৃত শিক্ষক।**

কিন্তু **আব্দুল করিম সিরাজনগরীর মতো এক শ্রেণীর আলিম নামধারী মুর্খ পূর্বে আলোচিত হাকীকত ও মাজাযের পার্থক্য সম্পর্কে জানে না এবং নিসবতের ভিন্নতার কারণে অর্থের ভিন্নতার ব্যাপারেও জ্ঞান রাখে না। এ অজ্ঞতার দরুন সূরা নজমে বর্ণিত شديد القوى এর অর্থ জিবরীলে আমীন (আ.) বললে মু'তাজিলা হয়ে যাবে বলে তারা মন্তব্য করেছে।**

অথচ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর আদ দুরুল মানসুর, ইমাম আলুসী এর রুহুল মাআ'নী, ইমাম বাগাভী এর মাআলিমুত তানযীল, তাফসীরে তাবারী, তাফসীরে নিশাপুরী, তাফসীরে ইবনে আব্বাস, তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীরে কবীর, তাফসীরে বায়দ্বাভীসহ প্রায় সকল তাফসীরে شديد القوى দ্বারা জিবরীলে আমীন উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। সুতরাং এ অর্থ গ্রহণের কারণে যদি কাউকে বিদআতী মু'তাজিলা বলা হয়, তবে উল্লেখিত সকল ইমামগণকে বিদআতী ও মু'তাজিলা বলতে হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

উল্লেখ্য যে, আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়ার মধ্যে **عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى** আয়াতের অনুবাদ করা হয়েছে- তাঁকে (নবী সা. কে) সুঠামদেহী শক্তিশালী (জিব্রাঈল) তা (কুরআন) শিক্ষা দিয়েছেন।

এ অনুবাদ জমহুর মুফাসসিরীনে কিরামের মত অনুযায়ী করা হয়েছে। যেমন-

তাফসীরে কুরতুবীতে রয়েছে :

قوله تعالى: (عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى) يعني جبريل عليه السلام في قول سائر المفسرين سوى الحسن (تفسير القرطبي ، ج١٧ ص ٨٥)

অর্থ : **আল্লাহ তাআলার বাণী তাকে শিক্ষা দিয়েছেন শাদীদুল কুওয়া (شديد القوى) অর্থাৎ জিবরীল আলাইহিস সালাম, হাসান বসরী (র.) ছাড়া সকল মুফাসসিরের মত এটি।** (তাফসীরে কুরতুবী, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ৮৫)

আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়ার উক্ত অনুবাদ দ্বারা যদি জিব্রাঈল (আ.)-কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিক্ষক সাব্যস্থ করা হয়ে যায় তাহলে জমহুর মুফাসসিরের মত অনুযায়ীও জিব্রাঈল (আ.) কে শিক্ষক সাব্যস্থ করা হয়।

আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, শুধু অনুবাদের মাধ্যমে কারো উপর ফতওয়া দেয়া বাতিলপন্থিদের কাজ। আব্দুল করিম সিরাজনগরী বাতিল ফিরকার অনুসরণে এরূপ কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি লিখেছেন, "মুদ্দাকথা হলো- হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন বলে, বাংলা ভাষায় লিখে যারা প্রচার করেছেন, তারা মারাত্মক ভুলের মধ্যে রয়েছেন। কারণ ইহা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বিদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বিদআতী, মু'তাজিলী ও বাতিল দার্শনিকদের ভ্রান্ত আক্বিদা।" (ইজহারে হক্ব, পৃষ্ঠা ১৮৭)

এখন প্রশ্ন হলো, জমহুর মুফাসসিরীন তো 'শাদীদুল কুওয়া' দ্বারা জিবরাঈল (আ.) উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তাহলে **আব্দুল করিম সিরাজনগরী জমহুর মুফাসসিরীনকে কি বিদআতী, মু'তাযিলা ও বাতিল দার্শনিকদের ভ্রান্ত আকীদার অনুসারী মনে করেন?**

তাফসীরে জালালাইন এর মধ্যেও 'শাদীদুল কুওয়া' এর দ্বারা জিব্রাঈল (আ.) উদ্দেশ্যে নেয়া হয়েছে। কিন্তু আব্দুল করিম সিরাজনগরী ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর ব্যাখ্যা না নিয়ে জালালাইনের হাশিয়া থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) এর প্রতি তার আস্থা নেই কিংবা তাকেও তিনি বাতিল মনে করেন।

আহমদ রেজা খান সাহেব কুরআন শরীফের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে যে মত

গ্রহণ করেছেন সে মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে আব্দুল করিম সিরাজনগরী অন্য সব মুফাসসিরীনে কিরামকে বিদআতী, মুতাজিলা ও বাতিল দার্শনিকদের ভ্রান্ত আক্বীদার অনুসারী বানাতে দ্বিধাবোধ করেননি। **আহমদ রেজা খান সাহেব তার দীন ও মাযহাবের বিধানকে সব ফরযের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয বলেছেন এবং এগুলোকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে বলেছেন। পক্ষান্তরে শরীয়তের ব্যাপারে যথাসম্ভব অনুসরণ করার কথা বলেছেন। এজন্যই হয়তো সিরাজনগরী গং রেজাখানীরা অনেক ক্ষেত্রে শরীআতের সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে রেজাখান সাহেবের রায়কে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন।** আহমদ রেজা খান সাহেব তার দীন ও মাযহাবের বিধান সব ফরযের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয হওয়ার ব্যাপারে যে ওসীয়তনামা লিখেছেন তা তার জীবনী গ্রন্থ 'জীবন ও কারামত' বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এ ওসীয়তনামার ১৩নং ওসীয়তে রয়েছে "যতটুকু সম্ভব শরীয়তের অনুসরণ পরিত্যাগ করবেন না। আর আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতাবাদী হাতে প্রকাশিত উহার উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।" (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ১৫৩)

নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে ক্ষমা শব্দ ব্যবহার

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো নবী-রাসূলগণ কবীরা, সগীরাহ সহ সকল ধরনের গুনাহ থেকে মা'সুম তথা নিষ্পাপ। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে নববীতে বিভিন্ন নবী-রাসূল (আ.) সম্পর্কিত আলোচনায় 'ইসয়ান' (অবাধ্যতা), 'গুফরান' (ক্ষমা), 'ইস্তিগ্ফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) এ ধরনের যে সকল শব্দ এসেছে সেগুলোর বাহ্যিক অর্থের উপর ভিত্তি করে আম্বিয়ায়ে কিরামকে দোষী সাব্যস্থ করা যাবে না। যে সকল আয়াত ও হাদীসে নবীগণ নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে সে সমস্ত আয়াতের শুধুমাত্র শাব্দিক অনুবাদের উপর নির্ভর না করে এগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী মুফাস্সিরীন ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম এ খিদমাতও যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন।

তবে এ ধরণের আয়াত বা হাদীসের বিষয়বস্তু ও তার শাব্দিক অনুবাদ বর্ণনার ক্ষেত্রে অনুবাদের সততা রক্ষায় হুবহু অনুবাদই করতে হবে। কেননা শব্দকে তার মূল বা উদ্দিষ্ট অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থে অনুবাদ করলে কুরআন হাদীসের মধ্যে অতিরিক্ত সংযোজন বা বিয়োজন আবশ্যক হয়ে পড়বে। তাইতো দেখা যায়,

মুফাসসিরীনে কিরাম, মুহাদ্দিসীনে ইযাম তথা সর্বস্তরের উলামায়ে আহলে সুন্নাত নবী-রাসূল (আ.) সম্পর্কিত আলোচনায় 'ইসয়ান' (অবাধ্যতা), 'গুফরান' (ক্ষমা), 'ইস্‌তিগ্‌ফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) বা এ ধরণের যে সকল শব্দ কুরআন-হাদীসে এসেছে সেগুলো যেমন হুবহু বর্ণনা করেছেন তেমনি এগুলোর শাব্দিক অনুবাদেও ব্যবহার করেছেন সরাসরি আভিধানিক অর্থ।

রেজাখানীরা এ ধরনের অর্থ গ্রহণ করলে ইসমতে আম্বিয়া অস্বীকার করা হয় বলে মন্তব্য করে থাকে। 'আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া' এর মধ্যে এ রকম একটি হাদীসের অনুবাদে غفران (غفر) শব্দের অর্থ 'ক্ষমা' লেখা হয়েছে। আব্দুল করিম সিরাজনগরী এর উপর আপত্তি তুলেছেন যে, এর দ্বারা নাকি নবী রাসূলগণের নিষ্পাপ হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, রেজাখানীরা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর উপরও অনুরূপ অভিযোগ তুলেছে।

আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর বক্তব্য ও তার একটি ব্যাখ্যা

হযরত আদম (আ.) এর বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বড়পীর হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) বলেছেন, 'যখন আদম (আ.)-কে সতর্ক করা হলো এবং স্মরণ করিয়ে দেয়া হলো তখন তিনি গুনাহ ও ভুল স্বীকারের বিষয়ে অবগত হলেন। আর তাঁকে অপরাধ ও ত্রুটি স্বীকারের পদ্ধতিও শিখিয়ে দেয়া হলো। তখন তিনি ফরিয়াদ করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক, আমি নিজের জীবনের উপর অত্যাচার করেছি, যদি আপনি আমাকে ক্ষমা করে না দেন এবং দয়া না করেন তাহলে নিঃসন্দেহে আমি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।" (ফুতুহুল গায়ব, মাকালা ৭)

তাওবা ও ইস্তিগফারের ক্ষেত্রে হযরত রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত আদম (আ.) কে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "তোমার জন্য ভুল-ত্রুটির স্বীকারোক্তি, আল্লাহর দরবারে সর্বাবস্থায় ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা এবং নিজেকে নগণ্য ও মুখাপেক্ষী হিসেবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহর হাবীব হযরত মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আদি পিতা হযরত আদম সাফিউল্লাহ (আ.) হলেন আদর্শ।" (প্রাগুক্ত)

প্রকাশ থাকে যে, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) নবী-রাসূলগণের, বিশেষ

করে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাওবা ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনার কারণও উক্ত মাকালায় ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন- "রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অবস্থা এমন ছিল যে তাঁকে এক হাল থেকে অন্য হালের দিকে নিয়ে যাওয়া হতো। অতঃপর সে হালকে অন্য হালের দ্বারা পরিবর্তন করা হতো এবং এর মাধ্যমে নৈকট্যের মনজিলসমূহে ও গায়বের ময়দানে তাঁকে ভ্রমণ করানো হতো। আর তার নূরানী অবস্থাও পরিবর্তন করা হতো। তখন প্রথম অবস্থা তাঁর নিকট পরবর্তী অবস্থাসমূহের বিবেচনায় অন্ধকার ও ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে প্রকাশিত হতো এবং সীমা রক্ষার ব্যাপারে ত্রুটি হয়েছে বলেও তাঁর নিকট অনুভূত হতো। একারণেই তাঁকে ইস্তিগফারের তথা ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা এটা অর্থাৎ ইস্তিগফার করা এবং (অনুরূপভাবে) সর্বাবস্থায় তাওবা করা বান্দার সর্বোত্তম অবস্থা। কেননা এতে তার গুনাহ ও ত্রুটির স্বীকারোক্তি রয়েছে। আর তাওবা ও ইস্তিগফার সর্বাবস্থায়ই বান্দার দুটি বৈশিষ্ট্য, যা মানব জাতির পিতা আদম (আ.) থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত।" (প্রাগুক্ত)

হযরত বড়পীর (র.) এর এ আলোচনায় হযরত আদম (আ.) প্রসঙ্গে গুনাহ, ভুল-ত্রুটি ইত্যাদি শব্দ এসেছে। আবার পরোক্ষভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিষয়েও শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। রেজাখানীরা মনে করে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ দ্বারা ইসমতে আম্বিয়া অস্বীকার করা হয়। রেজানীরা কি এখানে বড়পীর (র.) এর উপর ইসমতে আম্বিয়া অস্বীকারের অভিযোগ করবে?

উল্লেখ্য, নবী-রাসূলগণ সকলেই যে মাসুম তথা নিষ্পাপ এ বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে বাহ্যত উল্লেখিত ধরনের কোনো শব্দ প্রয়োগ হলে তা নিঃসন্দেহে ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.)ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাই শুধু বাহ্যিক বর্ণনার উপর ভিত্তি করে করো উপর ইসমতে আম্বিয়া অস্বীকারের ফতওয়া প্রদান করা যাবে না, যদিও রেজাখানীরা এরূপ করে থাকে।

কানযুল ঈমানে নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে ত্রুটি, ক্ষমা ইত্যাদি শব্দ রয়েছে

রেজাখানীরা কুরআন-হাদীসের অনুবাদে নবী রাসূলের ক্ষেত্রে ক্ষমা, ত্রুটি বা এ ধরনের শব্দ ব্যবহারকে দোষণীয় মনে করে এবং এরূপ অনুবাদ দ্বারা ইসলামী আকীদা আহত হয় বলে মন্তব্য করে। অথচ তারা তাদের যে অনুবাদকে তাফসীরসম্মত, নবী-রাসূলগণের শান প্রকাশে যথাযথ ও ইসলামী আকীদার রক্ষাকবচ মনে করে সেই কানযুল ঈমানেও নবী-রাসূলগণের ক্ষেত্রে ক্ষমা, ত্রুটি বা এ ধরনের অর্থবোধক শব্দ রয়েছে। পাঠকগণ এর কিছু নমুনা লক্ষ্য করুন :

১. হযরত আদম (আ.) সম্পর্কে সূরা ত্বোয়াহা এর **১২১** নং আয়াতের অনুবাদে রয়েছে- "এবং আদম থেকে আপন প্রতিপালকের নির্দেশের ক্ষেত্রে **ত্রুটি সংঘটিত হলো;** তখন যেই উদ্দেশ্য চেয়েছিল সেটার পথ পায়নি।" (সূরা তো'হা, আয়াত **১২১**, বাংলা কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৫৮৫)

২. সূরা জ্বীন এর ২৮নং আয়াতে উল্লেখিত নূহ (আ.) এর দুআর অনুবাদে রয়েছে- "হে আমার প্রতিপালক, **আমাকে ক্ষমা করো** এবং আমার মাতা-পিতাকে।" (বাংলা কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১০৩২)

৩. হযরত সুলায়মান (আ.) প্রসঙ্গে সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৩৫ এর অনুবাদে রয়েছে- "আরয করলো, হে আমার প্রতিপালক! **আমাকে ক্ষমা করো**।" (বাংলা কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৮২২)

৪. হযরত মুসা (আ.) প্রসঙ্গে সূরা আ'রাফ, আয়াত **১৫১** এর অনুবাদে রয়েছে- "(হযরত মুসা) আরয করলো, হে আমার প্রতিপালক! **আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো**।" (বাংলা কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৩১০)

'কানযুল ঈমান' এর বঙ্গানুবাদ থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত আয়াতসমূহসহ আরো অনেক আয়াতে নবী-রাসূল (আ.) প্রসঙ্গে 'ক্ষমা' শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। **যদি শাহওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর তরজমা ও আল-খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া বা অন্যান্য তাফসীরে 'ক্ষমা' শব্দ উল্লেখ করার ফলে এর দ্বারা নবীগণের ইসমত অস্বীকার করার আশঙ্কা হয় তাহলে 'কানযুল ঈমান' এ উল্লেখিত 'ক্ষমা' শব্দ দ্বারা কী নবীগণের ইসমত অস্বীকার করার আশঙ্কা হয় নি? রেজাখানীরা এর জবাব কী দিবেন?**

কুরআন শরীফ অনুবাদে রেজাখানীদের মূলনীতি অনুযায়ী সকল নবী নিষ্পাপ নন

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো নবী-রাসূলগণ কবীরা, সগীরাহ সহ সকল ধরনের গুনাহ থেকে মা'সুম তথা নিষ্পাপ। তাই যে সকল আয়াত ও হাদীসে নবীগণ নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টির অবকাশ রয়েছে সে সমস্ত আয়াতের শুধুমাত্র শাব্দিক অনুবাদের উপর নির্ভর না করে এগুলোর ব্যাখ্যা খুঁজতে হবে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী মুফাস্‌সিরীন ও মুহাদ্দিসীনে কিরাম তাফসীর বা ব্যাখ্যার এ খিদমাতও যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছেন।

কিন্তু রেজাখানীরা অনুবাদের মধ্যেই এ বিষয়টি সমাধান করতে চায়। তাদের ইমাম আহমদ রেজাখান সাহেবের কুরআনের অনুবাদের ব্যাপারে রেজাখানীরা দাবি করে থাকে যে, এটা তাফসীর সম্মত অনুবাদ। তাদের নিজস্ব মূলনীতির আলোকে তারা কানযুল ঈমানের ভূমিকায় শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) সহ আরও কতিপয় অনুবাদকের অনুবাদ উল্লেখ করে কঠোর সমালোচনা করেছে। আহমদ রেজা খান সাহেব ও শাহওয় উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদ উল্লেখ করত তুলনামূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে তারা এ অভিযোগ করেছে যে, শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর অনুবাদ দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'মা'সুম হওয়ার' বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

রেজাখানীগণ কর্তৃক সূরা বাকারা, আয়াত ২০-এর অনুবাদের তুলনা নিম্নরূপঃ

"যদি তুমি পায়রবী করো এদের মিথ্যা কামনাদির এর পরে যে, তোমার নিকট এসেছে জ্ঞান থেকে, তবে থাকবে না তোমার জন্য খোদার শাস্তি থেকে রক্ষা করার জন্য কোনো বন্ধু এবং না কোনো সাহায্যকারী।" - শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্

"এবং (হে শ্রোতা! যেই হও!) যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো, তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে আল্লাহ্ থেকে কেউ না তোমার রক্ষাকারী হবে এবং না সাহায্যকারী।" কানযুল ঈমান, কৃত আ'লা হযরত

উপরোক্ত দুই অনুবাদের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে রেজাখানীরা লিখেছে : "আলা হযরত রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আলায়হি ব্যতিত উপরোক্ত অন্য অনুবাদগুলোতে আলোচ্য আয়াতে সম্বোধন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা

আলায়হি ওয়া সাল্লামের প্রতি দেখানো হয়েছে। ফলে, তাদের অনুবাদে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া সাল্লাম 'মা'সুম হওয়ার' প্রতি সন্দেহের উদ্রেক হয়। নাউযুবিল্লাহ!" (বাংলা কানযুল ঈমানের ভূমিকা পৃষ্ঠা ৩৮)

অথচ কানযুল ঈমানের বিভিন্ন স্থানে এমন অনুবাদও রয়েছে যার দ্বারা তাদের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য নবীগণ মা'সুম হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। এখন আমাদের প্রশ্ন হল অন্যান্য নবী নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে রেজাখানীরা কি আকিদা পোষণ করে থাকেন?

রেজাখানীদের মূলনীতি অনুযায়ী তাদের নিজেদের অনুবাদে নবীগণের নিষ্পাপ হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহযুক্ত কয়েকটি অনুবাদ নমুনা স্বরূপ কানযুল ঈমান থেকে উল্লেখ করা হল।

১. এবং আদম থেকে আপন প্রতিপালকের নির্দেশের ক্ষেত্রে ত্রুটি সংঘটিত হলো; তখন যেই উদ্দেশ্য চেয়েছিল সেটার পথ পায়নি। (সূরা তোয়াহা, আয়াত ১২১; বাংলা কানযুল ঈমান পৃষ্ঠা ৫৮৫)
২. হে দাউদ! নিশ্চয় আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। সুতরাং তুমি লোকদের মধ্যে সঠিক ফয়সালা করো এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না। যা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায় তাদের জন্য কঠিন শাস্তি রয়েছে এজন্য যে, তারা হিসাব নিকাশের দিনকে বিস্মৃত হয়ে আছে। (সূরা সোয়াদ, আয়াত ২৬, বাংলা কানযুল ঈমান পৃষ্ঠা ৮২১)
৩. এরশাদ করলেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, নিঃসন্দেহে তার কর্ম বড়ই অনুপযোক্ত। তুমি আমার নিকট ঐ কথা বলোনা যার সম্পর্কে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও। (সূরা হুদ, আয়াত ৪৬, বাংলা কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ৪১৪)
৪. এবং যুন্ নূনকে (স্মরণ করুন) যখন চললো ক্রোধভরে, তখন মনে করেছিল যে, আমি তার উপর বিপদ-প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবো না। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৩৮৭, বাংলা কানযুল ঈমান পৃষ্ঠা ৬০১)

রেজাখানীদের দাবি অনুযায়ী তাদের অনুবাদ যদি তাফসীরসম্মত হয় তাহলে উপরেল্লিখিত অনুবাদের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যান্য নবীগণ দোষ ত্রুটির উর্ধ্বে নন (নাউযুবিল্লাহ)।

তাছাড়া আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের তাফসীরসম্মত অনুবাদের দ্বারা নিষ্পাপ হওয়ার সন্দেহ দূর করা আর অন্যান্য নবীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সন্দেহযুক্ত অনুবাদ করা কোনো মুমিনের কাজ নয়। কারণ মুমিনগণ নবীদের ব্যাপারে কি ধরনের আকীদা বা বিশ্বাস রাখতে হবে তা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে। আল্লাহ তাআলা বলেন :

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

(তারা বলে) আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোনো তারতম্য করিনা। (সূরা বাকারা, আয়াত ২৮৫)

উল্লেখ্য, **রেজাখানীরা তাফসীর ও তরজমার মূলনীতিকে পাশ কাটিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শানে বর্ণিত আয়াতসমূহের অর্থ অন্যান্য মুফাস্সিরগণ থেকে ব্যতিক্রম করে বড়ত্ব জাহিরের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাদের অহংকারী মনোভাবের কারণে নিজেদের চক্রান্তের জালে নিজেরাই আটকা পড়েছে।** তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াতে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদের আশ্রয় নিলেও সূরা নসর এর তৃতীয় আয়াতের অনুবাদে লিখেছে :

"এবং তার থেকে **ক্ষমা** চান।" (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১১০১)

অনুরূপভাবে সূরা নিসা, আয়াত ১০৫-১০৬ এর অনুবাদে রয়েছে-

"হে মাহবুব! নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি লোকদের মধ্যে ফয়সালা করেন যেভাবে আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন এবং **প্রতারণাকারীদের পক্ষ থেকে ঝগড়া করো না এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাও**। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।" (বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান, পৃষ্ঠা ১৮৮)

রেজাখানীদের রীতি অনুযায়ী তাদের কাছে প্রশ্ন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন ক্ষমা চাইবেন? তিনি কি গুনাহ করেছেন ? তাহলে রেজাখানীদের দৃষ্টিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মা'সুম নন? কেননা তাদের নিজস্ব নীতিমালার আলোকে এ অনুবাদ দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মা'সুম হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হয়।

বড়পীর (র.) এর উপর রেজাখানীরা কী ফতওয়া দিবে?

নফসের অনুসরণ পরিত্যাগের বিষয়ে আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ (আ.)-কে যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সে বিষয়টি হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) তার নিজের ভাষায় নিম্নরূপ লিখেছেন-

يا داود اهجر هواك فانه لا منازع ينازعني في ملكي غير الهوي (فتوح الغيب ، المقالة الخامسة والستون)

অনুবাদ : হে দাউদ, তোমার প্রবৃত্তির চাহিদাকে পরিত্যাগ কর। কেননা প্রবৃত্তি ছাড়া আমার রাজত্বে আমার সাথে ঝগড়াকারী আর কিছু নেই। (ফতুহুল গায়ব, মাকালা ৬৫)

হযরত বড়পীর (র.) এর এ উক্তি দাউদ (আ.) সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতের ভাবানুবাদ ও এর প্রাসঙ্গিক আলোচনা। রেজাখানীরা মনে করে এ ধরনের অনুবাদ দ্বারা নবীগণের মা'সুম হওয়ার বিষয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। তাহলে তারা কি বলবে যে, বড়পীর (র.) বলেছেন, নবীগণ মা'সুম নন? এমতাবস্থায় তারা হযরত বড়পীর (র.) এর উপর কী ফতওয়া দিবে?

আহমদ ইয়ার খান নঈমী কর্তৃক একটি হাদীসের ব্যাখ্যা

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর ইয্যতের মুকাবিলায় নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য মনে করতেন। মুসলিম শরীফে রয়েছে-

عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انى اعوذبك من شر ما عملت ومن شر ما لم اعلم (رواه مسلم)

অনুবাদ : হযরত আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, হে আল্লাহ আমি আমার কৃত সকল মন্দ কাজ থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি আর যে সকল মন্দ কাজ করিনি তা থেকেও আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (মুসলিম শরীফ)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় রেজাখানীদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমী লিখেছেন-

یعنی جو برائ میں کر چکا ہوں ان کی شر سے بچالے کہ ان کی معافی دیدی اور جو برائ ابہی نہیں کی ہیں آئندہ کرنے والا ہو ان کی شر سے بچالے کہ ان کے نہ کرنے کی توفیق دے (مرآۃ المناجیح۔ جلد ۴ صفحہ ۷۲)

অর্থাৎ আমি যে সকল মন্দ কাজ করেছি এগুলোর মন্দ থেকে আমাকে বাঁচান অর্থাৎ ক্ষমা করে দিন। আর যে সকল মন্দ কাজ এখনও করিনি, ভবিষ্যতে করব এগুলোর মন্দ থেকে আমাকে ক্ষমা করুন অর্থাৎ তা না করার তাওফীক দিন। (মিরআতুল মানাজীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭২)

রেজাখানীদের মনগড়া নীতির উপর নির্ভর করে এ ব্যাখ্যা থেকেও বলা যায় যে, রেজাখানীরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিষ্পাপ মনে করে না।

এ ধরনের ব্যাখ্যা রেজাখানী আলিম ছাড়া অন্য কেউ দিয়ে থাকলে তার সম্পর্কে তারা দাজ্জালি ফতওয়া দিত যে তিনি যেন বলেছেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতীতেও গুনাহ করছেন, ভবিষ্যতেও গুনাহ করবেন (নাউযুবিল্লাহ)। কারণ, দাজ্জালী ফতওয়া প্রদান তাদের চিরাচরিত অভ্যাস। রেজাখানীরা তাদের হাকীমুল উম্মতের ক্ষেত্রে এ ধরণের ফতওয়া কি প্রদান করবে?

ওলীআল্লাহগণের বিরোধিতায় ইবনুল জাওযীর আশ্রয় গ্রহণ

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী ওলী আল্লাহগনের প্রতি অতি ভক্তির দাবি করে থাকেন। অথচ **হাফিয ইবনুল জাওযী ওলী-আল্লাহগণের চরমবিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। যে কারণে তিনি তাঁর 'ইজহারে হক্ব' বইয়ে আল্লাহর ওলীদের সমালোচনা করতে গিয়ে ইবনুল জাওযীর আশ্রয় নিয়েছেন। এমনকি তিনি ইবনুল জাওযীর নামের সাথে 'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' পর্যন্ত যুক্ত করেছেন।**

সূফীগণের প্রতি হাফিয ইবনুল জাওযীর বিদ্বেষ

হফিয আবুল ফারজ আব্দুর রহমান ইবনুল জাওযী (৫১০-৫৭৯ হি:) সূফীদের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ পোষন করতেন। তিনি তার "তালবীসে ইবলিস" নামক কিতাবে "সুফীদের প্রতি শয়তানের ধোকা" নামক অনুচ্ছেদে সূফীদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ অধ্যায়ে সর্বপ্রথম সূফী শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার পর তিনি সূফীদের কর্মকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে যুগশ্রেষ্ঠ সূফীদের রীতিনীতি, আমল, আখলাক, ওযীফা, আকীদা ইত্যাদির উপর মারাত্মক আক্রমণ করেছেন। তাছাড়া তাসাউফ বিষয়ক উঁচুস্তরের অনেক কিতাবেরও তিনি সমালোচনা করেছেন।

আবূ তালিব মক্কী ও আবূল কাশিম কুশাইরী (র.) এর সমালোচনা

আবূ তালিব মক্কী (র.) এর “কুতুল কুলুব” নামক কিতাব সম্পর্কে ইবনুল জাওযী লিখেছেন- “এ কিতাবে তিনি (আবূ তালিব মক্কী) ভিত্তিহীন হাদীসসমূহ সংকলন করেছেন”।

আবূল কাশিম কুশাইরী (র.) (৩৭৬-৪৩৫হি:) নকশবন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকার উর্ধ্বতন একজন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে তিনি লিখেন, “আবূল কাশিম কুশাইরী সূফীদের জন্য কিতাবুর রিসালা লিখেছেন, যাতে তিনি বাকা-ফানা বশত: কবজ, ওয়াজদসহ বহু পারিভাষিক শব্দ উল্লেখ করেছেন যেগুলো ভিত্তিহীন, শরীয়তে এগুলোর কোনো ভিত্তি নেই। (তালবীসে ইবলিস)

ইমাম গায্যালী (র.) এর ‘ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্দীন’ এর সমালোচনা

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্যালী (র.) সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, “আবূ হামিদ গায্যালী আসলেন, অত:পর তাদের (সূফীদের) জন্য কিতাবুল ইহ্ইয়া লিখলেন, আর এ কিতাবকে বাতিল হাদীস দিয়ে ভরপুর করে রাখলেন। ” (তালবীসে ইবলিস)

আবূ হামজা খাযরাজীর সমালোচনা

সূফী সম্প্রদায়ের ইমামগণের সমালোচনা করতে গিয়ে আবূ হামজা খাযরাজী (ওফাত ২৯০হি:) সম্পর্কে তিনি বলেন, আবূ হামজা একদা তুরতুসের জামে মসজিদে ওয়াজ করছিলেন। হঠাৎ জামে মসজিদের ছাদে একটি কাক “কা...” করে উঠল। তৎক্ষণাৎ তিনি বলে উঠলেন লাব্বাইকা! লাব্বাইকা! এর দরুন তাকে যিন্দিক আখ্যায়িত করা হয়। (তালবীসে ইবলিস)

আবূল হাসান নূরীর সমালোচনা

আবূল হাসান নুরী যাকে “রিসালায়ে কুশাইরী” কিতাবে ৩০০ হিজরীর শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, তার একটি উক্তি- “আমি আল্লাহর প্রতি আশিক আর আল্লাহ আমার প্রতি আশিক” এর সমালোচনা করতে গিয়ে ইবনুল জাওযী বলেন- ‘আবূল হাসান অজ্ঞতার কারণে এ কথা বলেছেন যে, আল্লাহ আমার প্রতি আশিক।’ (তালবীসে ইবলিস)

সূফীদের অর্থ-সম্পদ ত্যাগ করার সমালোচনা

ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করার নীতি অবলম্বন করার কারণেও তিনি সূফীদের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেন- সূফীরা বলে যে সম্পদ রাখা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী। তাই তারা সম্পদ থেকে পৃথক হয়ে যান। আসলে তারা তাওয়াক্কুলের অর্থই বুঝে না। সাহাবায়ে কিরাম সম্পদ অর্জন করেছেন। একথা কি বলা যাবে যে, তাদের তাওয়াক্কুল কম ছিল। তাদের যদি তাওয়াক্কুল না থাকে তবে আর কার তাওয়াক্কুল থাকবে। (তালবীসে ইবলিস)

উচ্চ স্তরের সূফীগণের পানাহার পরিত্যাগের সমালোচনা

উচ্চ স্তরের সূফীগণ পানাহার পরিত্যাগ করে যে রিয়াযত-মেহনত (সাধনা) করেছেন তারও সমালোচনা করতে গিয়ে ইবনুল জাওযী কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। যাদের ঘটনা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে আবূ তুরাব বকশী (ওফাত : ২৪৫ হি:) সাহল বিন আব্দুল্লাহ তসতুরী, (ওফাত: ২৭৩/২৮৩ হি:), বায়েযিদ বোস্তামী, (ওফাত : ২৩৪ হি:), ইব্রাহীম খাওয়াম (ওফাত: ২৯১ হি:) প্রমূখ অন্যতম। এদের কৃচ্ছতা সাধনের ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, উপরোক্ত সূফীদের যে সকল ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলো শরীআতও সমর্থন করে না, বিবেকও সমর্থন করে না। নফসকে এভাবে কষ্ট দেয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই। কারো যদি খাওয়ার কিছুই না থাকে তবে সে অপারগ। কিন্তু খাবার থাকা অবস্থায় সম্পূর্ণ বর্জন করা বা উত্তম খাবার বর্জন করা শরীয়তের সীমালঙ্গন করার শামিল। (তালবীসে ইবলিস)

সূফীগণের কাজকে মন্দ আখ্যায়িত করা

সূফীগণের কাজকে মন্দ আখ্যায়িত করে তিনি আরো একটি অধ্যায় সংকলন করেছেন। আবূ বকর শিবলী (র.) হযরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর তরীকার একজন উর্ধ্বতন শায়খ (মৃত্যু : ৩৩৪ হি:) ছিলেন। তিনি (শিবলী) তার পিতার রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত বন্দেগী করার একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। সেই ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়ে এর সমালোচনা করতে গিয়ে ইবনুল জাওযী বলেন, অনিদ্রা থেকে এভাবে নফসকে কষ্ট দেয়া শরীআত বহি:র্ভূত এবং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরীকা বিরোধী কাজ। (তালবীছে ইবলিছ)

উল্লেখ্য, হাফিয ইবনুল জাওযী ওলী-আউলিয়া সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করার পিছনে অনেক কারণ রয়েছে। হাফিয ইমাম যাহাবী তার “তাযকিরাতুল হুফফায” কিতাবে লিখেছেন-

ولا ينفك من جارية حسناء قرأت بخط الموقانى ان ابن الجوزى شرب البلاذر فسقطت لحيته فكانت قصيرة جدا وكان يخضبها بالسواد الى أن مات ، وكان كثير الغلط فيما يصنفه فانه كان يفرغ من الكتاب ولا يعتبر، (تذكرة الحفاظ جلد: ۴ صفحه: ۱۳۴۷)

অর্থাৎ তিনি সুন্দরী দাসীদের পিছনে লেগে থাকতেন। আমি মাওকানী এর লেখায় পড়েছি যে, ইবনুল জাওযী বালাযুর (শক্তিবর্ধক) সেবন করতেন। ফলে তার দাঁড়ি পড়ে গিয়েছিল। তিনি খুব খাটো ছিলেন। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত কালো খেজাব ব্যবহার করতেন। তার রচনায় অনেক ভুল রয়েছে। তিনি কিতাব শেষ করতেন কিন্তু তার গভীরে পৌঁছতেন না। (তাযকিরাতুল হুফফায, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৩৪৭)

আল্লাহর ওলীদের বিরোধিতায় ইবনুল জাওযীর সাথে আব্দুল করিম সিরাজনগরীর বিস্ময়কর মিল দেখে জনমনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, ইবনুল জাওযীর চারিত্রিক অন্যান্য বদভ্যাসগুলো আব্দুল করিম সিরাজনগরীর মাঝেও কি বিদ্যমান ?

ওলী-আল্লাহদের সাথে ইবনুল জাওযীর বিরোধিতার জবাব

ওলী আল্লাহদের সাথে ইবনুল জাওযীর বিরোধিতার বিষয়ে শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) 'আশিআতুল লুমআত' কিতাবে লিখেছেন– "ইবনুল জাওযী এর এক প্রসিদ্ধ কিতাব 'তালবীসে ইবলিস'। এ কিতাবে তিনি সে সকল রাস্তা চিহ্নিত করেছেন, যেসব রাস্তা দিয়ে শয়তান এসে মানুষকে পথভ্রষ্ট করে এবং বিদ'আত ও খেলাফে সুন্নত কাজে লিপ্ত করে। উক্ত কিতাবে তিনি বিশেষভাবে সূফীদের কঠোর সামালোচনা করেছেন। তাদের ইশকের বিশেষ অবস্থা (غلبة حال وسكر) এর বিবরণ সামনে রেখে তাদেরকে কঠোরভাবে প্রত্যাখান করেছেন। আর এ মহান দলের বুযুর্গানে কিরামকে মূর্খ, পাগল, নির্বোধ ইত্যাদি বলেছেন।" (আশিআতুল লুমআত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২)

শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ইবনুল জাওযীর এ বিরোধিতার জবাবও দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, **"প্রকৃত কথা হল ইবনুল জাওযীর এ সমালোচনা শয়তানের প্ররোচনারই ফসল। শয়তান ইবনুল জাওযীকে তার পথের শিকার বানিয়েছে এবং তাকে অহমিকা ও অহংকারের মধ্যে নিপতিত করেছে।"** (আশিআতুল লুমআত, ১ম খণ্ড)

তিনি আরো লিখেন, কুতবুল আউলিয়া তাজুল মাফাখির শায়খ আব্দুল কাদির (রা.) ও অন্যান্য আহলে মাআরিফ মাশায়িখগণকে অস্বীকার, তাদের প্রত্যাখান এবং তাদের সমালোচনা করার কারণে পাঁচ বছর তিনি (ইবনুল জাওযী) বন্দী ছিলেন। অতঃপর ওয়াসিতের জেলখানা থেকে মুক্ত হন। ইবনুল জাওযীর লাঞ্ছনা এবং ধোঁকা ও অহংকার-অহমিকার মধ্যে পতিত হওয়া সায়্যিদুনা হুযূর গাউসে পাক (রা.) ও অন্যান্য আউলিয়া কিরামকে অস্বীকার করার কারণেই হয়েছে। (আশিআতুল লুমআত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬)

আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর বর্ণনা ও ইবনুল জাওযীর পক্ষে রেজাখান সাহেবের ওকালতী

আহমদ রেজা খান সাহেব ফতওয়ায়ে রেজভীয়ার ১২ নং খণ্ডের ১২৮ নং পৃষ্ঠায় বড়পীর (র.) এর বিরোধিতাকারীদের সম্পর্কে লিখেছেন–

عبدالقادر کا انکار قادر مطلق عز جلالہ کے انکار کی طرف کیونکر نہ لیجائیگا۔ (فتاوی رضویۃ)

অর্থ: বড়পীর দস্তগীর আব্দুল কাদীর জিলানী (র.) এর বিরোধিতা মহান আল্লাহকে অস্বীকার করার দিকে কেন নিয়ে যাবে না ? (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ)

এ ফতওয়ার মাধ্যমে তিনি বুঝাতে চেয়েছেন যে, আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-কে অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করার পর্যায়ে নিয়ে যায়। অথচ যে ইবনুল জাওযী আব্দুল কাদির জিলানী (র.) সহ মকবূল ওলীদের সমালোচনা করেছেন তার পক্ষে তিনি আবার ওকালতি করেছেন।

আব্দুল করিম সিরাজনগরী বড়পীর দস্তগীর (র.) এর অনুসারী দাবি করলেও হাফিজ ইবনুল জাওযীর প্রতি চরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছেন। তিনি তার লিখিত ইজহারে হক্ব, এর ১৬৮ পৃষ্ঠায় হাফিজ ইবনুল জাওযীর নাম এভাবে লিখেছেন, **হাদীস বিশারদ আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনে আল জাওযী আল কুরাশী রাদিয়াল্লাহু আনহু।** (ইজহারে হক্ব, পৃষ্ঠা ১৬৮)

রেজাখানীদের একটি ভ্রান্ত নীতি হলো যে, তারা এ উপমহাদেশে বৃটিশের বিরোধিতাকারী বুযুর্গগানে কিরামের তাত্ত্বিক কথাবার্তার অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা করেন অথবা তাদের উপর মনগড়া অভিযোগ আরোপ করেন। পক্ষান্তরে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ভিনদেশী চরমপন্থী ওলী-আল্লাহগণের বিরোধিতাকারী আলিমদের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তার পক্ষে সাফাইমূলক ব্যাখ্যা দিয়ে মানুষদের নিকট তাদের সাধুপুরুষে রূপান্তরিত

করার অপচেষ্টা চালান। উদাহরণ স্বরূপ- **হাফিয ইবনুল জাওযী কর্তৃক হযরত বড়পীর (র.) সহ অন্যান্য বুযুর্গানে কিরামের সমালোচনা সত্ত্বেও আব্দুল করিম সিরাজনগরীর ইমাম আহমদ রেজা খান সাহেব তার পক্ষে ওকালতি করার চেষ্টা করেছেন।**

ইবনুল জাওযী কর্তৃক বড়পীর দস্তগীর আব্দুল কাদীর জিলানী (র.) এর সমালোচনার পক্ষে আহমদ রেজা খান সাহেব ওকালতি করতে গিয়ে লিখেছেন–

نہ ان حضرات سے بوجہ خطائی الفہم معترض ہوے۔ البتہ ہم جانتے ہیں کہ انکا منشاء اعتراض نفسانیت نہ تھا۔ (رادع التعسف عن الامام ابی یوسف)

অর্থাৎ **এ সকল ব্যক্তিবর্গ তাদের বোধগম্যতার ত্রুটির কারণে যে সকল আপত্তি করেছেন তাতে আমরা তর্কে লিপ্ত হব না। কেননা আমরা জানি, তাদের এ সকল আপত্তির পিছনে প্রবৃত্তির (নফসানিয়াত) অনুসরণ উদ্দেশ্য ছিল না।** (রাদিউত তাআসসুফ)

অথচ শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিছে দেহলভী (র.) হাফিজ ইবনুল জাওযীর লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ হিসেবে বড়পীর দস্তগীর (র.) সহ অন্যান্য ওলীআল্লাহগণের বিরোধিতা করার কথা উল্লেখ করে “আশিআতুল লুমআত” কিতাবে লিখেছেন- কুতবুল আউলিয়া, তাজুল মাফাখির শায়খ আব্দুল কাদীর (র.) ও অন্যান্য আহলে মাআরিফ মাশায়িখগণকে অস্বীকার, তাদেরকে প্রত্যাখান এবং তাদের সমালোচনা করার কারণে পাঁচ বছর তিনি বন্দী ছিলেন। অতঃপর ওয়াসিতের জেলখানা থেকে মুক্ত হন। ইবনুল জাওযীর লাঞ্ছনা এবং ধোঁকা ও অহংকার-অহমিকার মধ্যে পতিত হওয়া সায়্যিদুনা হুযূর গাউসে পাক (র.) ও অন্যান্য আউলিয়া কিরামকে অস্বীকার করার কারণেই হয়েছে। (আশিআতুল লুমআত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬)

তিনি আরো লিখেছেন-

وتحقیقت ایں از تلبیس ابلیس است کہ بروے ازیں راہ درآمدہ ومغرور ساخت۔ (اشعۃ اللمعات، ص:۲۰)

অর্থাৎ প্রকৃত কথা হলো **ইবনুল জাওযীর এ সমালোচনা শয়তানের প্ররোচনারই ফসল।** শয়তান ইবনুল জাওযীকে তার পথের শিকার বানিয়েছে এবং তাকে অহমিকা ও অহংকারের মধ্যে নিপতিত করেছে। (আশিআতুল লুমআত, ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ২০)

দেখা যাচ্ছে হযরত আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) যেখানে ইবনুল জওযী কর্তৃক বড়পীর দস্তগীর আব্দুল কাদীর জিলানী (র.) এর সমালোচনাকে ‘শয়তানের প্ররোচনার ফসল’ আখ্যায়িত করেছেন, সেখানে রেজাখান সাহেব তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন।

রেজাখানীরা বড় পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর নাম ব্যবহার করে টাকা-পয়সা, মান-সম্মান তথা দুনিয়াবী সকল স্বার্থ হাসিলের জন্য। প্রকৃতপক্ষে তাদের একক ইমাম হচ্ছেন আহমদ রেজা খান সাহেব। আহমদ রেজা খান সাহেবের শ্রেষ্ঠত্ব টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজনে তারা বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.)-কে ত্যাগ করতেও প্রস্তুত।

হাফিয ইবনুল জাওযী কতৃক বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর সমালোচনার পক্ষে আহমদ রেজাখান সাহেবের ওকালতিকে সঠিক প্রমাণ করার স্বার্থে আব্দুল করিম সিরাজনগরীও ইবনুল জাওযী এর নাম এভাবে লিখেছেন **“হাদীস বিশারদ আল্লামা ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে আলী ইবনে আল জাওযী আল কুরাইশী রাদিয়াল্লাহু আনহু।”** (ইজহারে হক্ব ১৬৮ পৃষ্টা)

বড় পীর দস্তগীর (র.) সহ সকল আউলিয়ায়ে কিরামের বিরোধিতাকারী ইবনুল জাওযী শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীর নিকট একধারে ‘ইমাম’ ও ‘রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’ উপাধি পাওয়ার উপযুক্ত ! সুফী কবি মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন-

آں گدا گوید خدا از بہر ناں
متقی گوید خدا از عین جاں
আঁ গাদা গোইয়াদ খোদা আয বাহরে আঁ
মুত্তাকী গোইয়াদ খোদা আয আইনে জাঁ।

অনুবাদঃ ভিক্ষুক রুটির জন্য আল্লাহর নাম নেয়। খোদাভীরু বান্দাহ অন্তরের অন্তস্থল থেকে আল্লাহর নাম নেয়।

اللہ اللہ میزنی از بہر ناں
بے طمع پیش آو اللہ را بخواں
আল্লাহ আল্লাহ মী যানী আয বাহরে নাঁ
বে তমা পেশ আও আল্লাহ রা বেখাঁ।

অনুবাদঃ তুমি রুটি রোজগার করার জন্য আল্লাহ আল্লাহ করছ। লোভ ছেড়ে সামনে অগ্রসর হও আর আল্লাহকে ডাকতে থাক।

আব্দুল করিম সিরাজনগরী কর্তৃক ইবনুল জাওযী এর অত্যধিক প্রশংসা ও অযৌক্তিক উপাধি উল্লেখের একটি অন্যতম কারণ হলো- আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়ায় উল্লেখিত ‘আশুরা’ সম্পর্কিত একটি হাদীসকে মওযূ সাব্যস্ত করতে তিনি ইবনুল জাওযীর সহযোগিতা নিয়েছেন।

উল্লেখ্য যে, **কোনো হাদীসকে মওযু সাব্যস্ত করতে ইবনুল জাওযী মুহাদ্দিসীনে কিরামের নিকট চরমপন্থী হিসেবে পরিচিত। তিনি মুসলিম শরীফের একটি হাদীস ও তিরমিযী শরীফের ২৩টি হাদীসকে পর্যন্ত মওযূ বলেছেন।**

আব্দুল করিম সিরাজনগরী কর্তৃক ইবনুল জাওযী এর অত্যধিক প্রশংসার অন্য একটি কারণ এও হতে পারে যে, ইবনুল জাওযী তার যুগে তার লেখনীর মাধ্যমে যেভাবে বিশ্ববরেণ্য আউলিয়ায়ে কিরামের সমালোচনায় সচেষ্ট ছিলেন, যা ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে আব্দুল করিম সিরাজনগরীও উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ ওলী-আউলিয়াদের কুৎসা রটনা ও সমালোচনায় ব্যস্ত। **আউলিয়ায়ে কিরামের সমালোচনার দিক থেকে উভয়ের মিল থাকায় হয়তো তিনি ইবনুল জাওযীর প্রতি এত ভক্তি প্রদর্শন করেছেন।**

ফতওয়ায়ে রেজভীয়াতেও অগণিত মাওযূ হাদীস আছে

আব্দুল করিম সিরাজনগরী হাদীস যাচাইয়ে সর্ব ক্ষেত্রে ইবনুল জওযীর সহযোগিতা গ্রহণ করলে দেখা যাবে ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যার অধিকাংশ হাদীসই ইবনুল জাওযীর দৃষ্টিতে মওযু। উদাহরণস্বরূপ- **‘হযরত ফাতিমা যুহরা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা এর হায়িয-নিফাস থেকে পবিত্র থাকা প্রসঙ্গে আহমদ রেজা খানকে প্রশ্ন করা হলে তিনি ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যায় এর জবাবে লিখেছেন- ‘‘হাদীসে উল্লেখিত আছে** ان ابنتي فاطمة ادمية حوراء لم تحض ولم تطمث **অর্থাৎ নি:সন্দেহে আমার মেয়ে ফাতিমা নিষ্পাপ। হুরগণের মত হায়িয-নিফাস হতে পবিত্র।” (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ, ১২ খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, কিতাব- শাত্তা) ইবনুল জাওযী ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যার উক্ত হাদীসকে মওযু বলেছেন। (আল মাওদুআত খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪২১)**

আব্দুল করিম সিরাজনগরী ইবনুল জাওযীর এ মন্তব্যকে কি মেনে নিবেন?

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.)ও এ হাদীসকে মাওযূ বলেছেন (আল্-লাআলিল মাসনুআহ, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৬৫)। এছাড়া আরো অনেক ইমামও একে মাওযূ (বানোয়াট) বলেছেন।

উল্লেখ্য যে, কোনো কিতাবে মাওযু হাদীস পাওয়া গেলে সে কিতাব পড়া জায়িয নয় বলেও রেজাখানীরা ফতওয়া দিয়ে থাকেন। যেহেতু সিরাজনগরীর ‘ইমাম’ ও ‘রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু’ খেতাবপ্রাপ্ত ইবনুল জাওযীর দৃষ্টিতে ফতওয়ায়ে রেজভীয়াতে মাওযু হাদীস রয়েছে সেহেতু ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যা পাঠ করাও তাদের দৃষ্টিতে হারাম হবে।

শহীদগণের প্রতি নিহত শব্দ ব্যবহার

আব্দুল করিম গং রেজাখানীরা শহীদগণের ব্যাপারে ‘নিহত’ শব্দ প্রয়োগকে জঘন্য অপরাধ মনে করে থাকেন। অথচ তাদেরই ইমাম আহমদ রেজা খান সাহেব লিখেছেন مارا جا (মারা যায়) এবং এর বঙ্গানুবাদে রেজাখানীরা লিখেছেন **‘নিহত হয়’**।

দেখুন মূল কানযুল ঈমান এর একটি অনুবাদ–

اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جا (کنزالایمان-سورۃ النساء-۷۴)

অর্থ: এবং যে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অত:পর **নিহত** হয় (সূরা. নিছা, আয়াত: ৭৪, বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমান)

এ আলোচনা দ্বারা বুঝা যায়, রেজাখানীরা নিজের পছন্দনীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য শহীদগণের শানে নিহত শব্দ প্রয়োগ বৈধ মনে করেন। কিন্তু অন্য কারো জন্য তা বৈধ মনে করেন না। বরং এটাকে বেয়াদবি মনে করেন।

যদি সত্য সত্যই তাদের দৃষ্টিতে শহীদগণের ব্যাপারে ‘নিহত’ শব্দ ব্যবহার করা বেয়াদবি হয় তাহলে আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংরা অযথা পাণ্ডিত্য দেখাতে গিয়ে তাদের ইমামকেও বেয়াদব প্রমাণ করে ছাড়লেন। নির্বুদ্ধিতা আর কাকে বলে?

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের আহলে বায়ত প্রীতির নমুনা

আহলে বায়তের মহব্বতের ঠিকাদার (?) আব্দুল করিম সিরাজনগরী আহলে বায়তের শহীদগণের ব্যাপারে ‘হত্যা’ ‘নিহত’ এসব শব্দ ব্যবহার অত্যন্ত বেয়াদবি সাব্যস্ত করে মহাসম্মেলন করেছিলেন **অথচ তাদের ইমাম আহমদ রেজা খান সাহেব স্বীয় কানযুল ঈমানে নবী, রাসূল ও শহীদগণের ব্যাপারে ‘হত্যা’ ‘নিহত হওয়া’ বা এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করেছেন।**

এমনকি আহমদ রেজা খান সাহেব ইয়াযীদকে আহলে বায়তের হত্যার

নিদের্শদাতা মনে করাকে হারাম বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ- আহমদ রেজা খান বেরলভী তার লিখিত ‘রাদিউত তাআসসুফ’ পুস্তিকায় লিখেছেন- সুবহানাল্লাহ, অপবিত্র ইয়াযীদকে এই বিষয়ের প্রতি সম্পৃক্ত করা নাজায়িয ও হারাম যে, সে ইমামে মযলূম সায়্যিদুনা হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে শহীদ করিয়েছে। এজন্য যে, এই খবীস কর্তৃক উক্ত কাজের নির্দেশ দেওয়ার পক্ষে মুতাওয়াতির বর্ণনা নেই। (রাদিউত তাআসসুফ)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দুটি বিষয় বুঝা যায় ঃ

১. ইয়াযীদ কর্তৃক ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে শহীদ করানোর দাবি করা নাজায়িয ও হারাম।
২. ইয়াযীদ এর উপর লা’নত করা নাজায়িয ও হারাম।
৩. মুতাওয়াতির বর্ণনা ছাড়া কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া নাজায়িয ও হারাম।

পক্ষান্তরে শত শত বছর থেকে সরকারি-বেসরকারি মাদ্‌রাসার সিলেবাসে যে আকীদার কিতাব পড়ানো হচ্ছে সে কিতাব ‘আকীদায়ে নসফী’তে আল্লামা সা’দ উদ্দিন মাসঊদ ইবন উমর তাফতাজানী ইয়াযীদের উপর লা’নত প্রদানের ব্যাপারে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত উল্লেখ করার পর লিখেছেন- ‘‘হযরত হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে যে হত্যা করেছে অথবা হত্যার নির্দেশ দিয়েছে, অথবা অনুমতি দিয়েছে বা এর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে তার উপর লা’নত প্রদান জায়িয হওয়ার ব্যাপারে সকলেই একমত। আর প্রকৃত কথা হলো- **হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর হত্যার প্রতি ইয়াযিদের সন্তুষ্টি এবং এর কারণে খুশি হওয়া এবং আহলে বায়তকে অপমানিত করার প্রতি তার সন্তুষ্টি মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে, যদিও আলাদাভাবে তা খবরে ওয়াহিদ। আমরা এ ব্যাপারে কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করি না বরং তার ঈমানের ব্যাপারে দ্বিধা রয়েছে। তার উপর ও তার সাহায্যকারী সকলের উপর আল্লাহর লা’নত।**’’ (শরহে আকাঈদে নাসাফী, পৃষ্ঠা ৩৫২)

এ প্রসঙ্গে আমরা সায়্যিদ মুফতী আমীমুল ইহসান মুজাদ্দিদী আল বারাকাতী (র.) এর মতামত তুলে ধরছি। মুফতী আমীমুল ইহসান বৃটিশ আমলে কলকাতা ‘নাখোদা মসজিদ’ এর খতীব, কলিকাতা আলিয়া মাদরাসার হেড মাওলানা ও প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতীব, মাদরাসা-ই আলিয়া ঢাকা এর হেড মাওলানা এবং পাক ভারতের শ্রেষ্ঠ আলিম ছিলেন। তার

লিখিত অনেক কিতাব সরকারি মাদরাসার টাইটেল ক্লাসসহ অন্যান্য ক্লাসে পাড়ানো হচ্ছে। তিনি তার লিখিত ‘তারিখে ইসলাম’ কিতাবে বায়হাকীয়ে যামান কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) (ওফাত : ১২২৫ হি.)-এর ‘কালিমাতুত তায়্যিবাত’ কিতাব থেকে যা উদ্ধৃত করেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

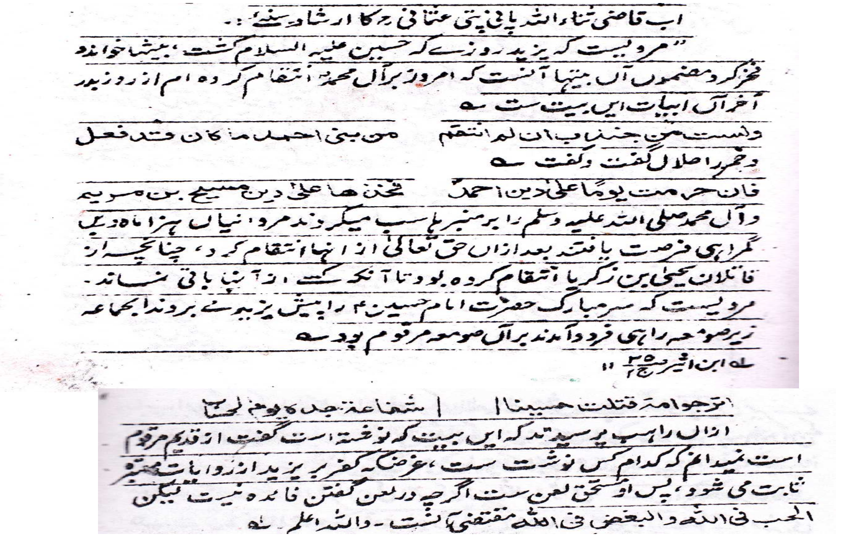

اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی عثمانی رح کا ارشاد سنئے :-

"مرویست کہ یزید روزے کہ حسین علیہ السلام کشت، بیتہا خواندہ فخر کرد مضمون آں بیتہا آنست کہ امروز بر آل محمد انتقام کردہ ام از روز بدر آخر آں ابیات ایں بیت ست ؎

ولست من جندب ان لم انتقم   من بنی احمد ما کان قد فعل

و خمر را حلال گفت و گفت ؎

فان حرمت یوما علی دین احمد   فخذها علی دین المسیح بن مریم

و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم را بر منبرہا سب میکردند مروانیاں ہزار ماہ دریں گمراہی فرصت یافتند بعد ازاں حق تعالی از انہا انتقام کرد، چنانچہ از قاتلان یحیی بن زکریا انتقام کردہ بود تا آنکہ کسے از آنہا باقی نماند۔ مرویست کہ سر مبارک حضرت امام حسین را پیش یزید مے بردند بجماعہ زیر صومعہ راہبی فرود آمدند بر آں صومعہ مرقوم بود ؎

لہ ابن اثیر ص ۳۵ ج ۱ "

اترجو امۃ قتلت حسینا | شفاعۃ جدہ یوم الحساب

ازاں راہب پرسیدند کہ ایں بیت کہ نوشتہ است گفت از قدیم مرقوم است نمیدانم کہ کدام کس نوشتہ ست، غرضکہ کفر یزید از روایات معتبرہ ثابت می شود، پس او مستحق لعن ست اگرچہ در لعن گفتن فائدہ نیست لیکن الحب فی اللہ والبغض فی اللہ مقتضی آں ست۔ واللہ اعلم لہ

অর্থ্যাৎ “বর্ণিত আছে, যেদিন ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু শাহাদত বরণ করেন সেদিন ইয়াযিদ কবিতা পাঠ করে গর্ববোধ করেছিল। কবিতার বিষয়বস্তু হলো- ‘আজ আমি মুহাম্মদের পরিবার থেকে বদরের দিনের প্রতিশোধ নিয়েছি।’ কবিতার শেষ পংক্তি হলো- ‘বনী আহমদের লোকেরা যা করেছে তার প্রতিশোধ যদি আমি না নিতাম তাহলে আমি জুনদুবের লোক হতাম না।’ ইয়াযিদ মদকে হালাল মনে করে কবিতা পাঠ করে : ‘যদি মুহাম্মদের ধর্মমতে তা হারামই হয় তবে ঈসা (আ.) এর ধর্মমতে তা গ্রহণ কর।’ **আহলে বায়তকে সে মিম্বরে দাঁড়িয়ে গালি গালাজ করত। মোটকথা ইয়াজিদের কুফরীর ব্যাপার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত আছে। সূতরাং সে লা’নতের উপযুক্ত। যদিও তার উপর লা’নত করে কোনো উপকার নেই। তবে তবে লা’নত করাই আলাহর ওয়াস্তে ভালবাসা, আলাহর ওয়াস্তে শত্রুতা পোষণ করার চাহিদার অন্তর্ভূক্ত।**” (কালিমাতুত তায়্যিবাত, পৃষ্ঠা ১৩৫)।

পাঠক লক্ষ্য করেছেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্যতম আকীদাগ্রন্থ 'আকাইদে নসফী' এর মধ্যে বলা হয়েছে যে, হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর হত্যার প্রতি ইয়াযিদের সন্তুষ্টি ও এর কারণে খুশি হওয়া এবং আহলে বায়তকে অপমানিত করার প্রতি তার সন্তুষ্টির বর্ণনা মুতাওয়াতির পর্যায়ে পৌঁছেছে, এমনকি ইয়াযীদের ঈমান নিয়ে দ্বিধা রয়েছে, তাকে লা'নত করা ঈমানের দাবি। এমনিভাবে কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (র.) এর 'কালিমাতুত তায়্যিবাত' কিতাবে এসেছে যে, ইয়াযীদের কুফরীর ব্যাপার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। সূতরাং সে লা'নতের উপযুক্ত। অথচ আহমদ রেজা খান সাহেব লিখেছেন ইয়াযীদ কর্তৃক ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-কে শহীদ করানোর দাবি করা এবং তার উপর লা'নত করা নাজায়িয ও হারাম। কেননা এ বিষয়ে কোনো মুতাওয়াতির বর্ণনা নেই।

আশ্চর্যের ব্যাপার, একদিকে রেজাখানীরা শহীদগণের ক্ষেত্রে হত্যা, নিহত ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগকেও বেয়াদবি মনে করে, অন্যদিকে তাদের ইমাম ইয়াযিদ কর্তৃক হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কে শহীদ করার নির্দেশ প্রদানের বিষয়ে মুতাওয়াতির বর্ণনা নেই বলে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করে। এমনকি এ বিষয়ের সম্পর্ক তার দিকে করাকে হারাম পর্যন্ত সাব্যস্ত করে। তাদের আহলে বায়ত প্রীতি কেমন তা পাঠকবৃন্দই বিবেচনা করবেন।

খুতবায়ে ইবনে নাবাতা ও আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়া

বিশিষ্ট বুযুর্গ হযরত ইবনে নাবাতা (র.) এর খুতবায়ে ইবনে নাবাতা একটি প্রসিদ্ধ খুতবাহ। রেজাখানীদের নিকটও এটি গ্রহণযোগ্য। আব্দুল করিম সিরাজনগরীর গুরু অধ্যক্ষ আব্দুল জলীল সাহেবের উক্তি অনুযায়ী **খুতবায়ে ইবনে নাবাতা পঠিত খুতবাসমূহের মধ্যে বিশুদ্ধতম।**

অধ্যক্ষ আব্দুল জলিলের বক্তব্য নিম্নরূপ- ''ইবনে নাবাতা ৬৭১ হিজরীর পূর্বের লোক ছিলেন এবং তিনি উঁচু স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। তাই তাঁর খুতবাহ এখনো মসজিদে মসজিদে পাঠ করা হয়। ইহা লিখিত খুতবাহসমুহের মধ্যে বিশুদ্ধতম।'' (হায়াত মউত কবর হাশর, পৃষ্ঠা ২১)

রেজাখানীদের দৃষ্টিতে 'বিশুদ্ধতম' মূল খুতবায়ে ইবনে নাবাতার এবারতের সাথে আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়ার এবারতের মিল রয়েছে। প্রমান স্বরূপ, খুতবায়ে ইবনে নাবাতার কপি স্ক্যান করে নিম্নে প্রদান করা হলো।

খুতবাতে ইবনে নাবাতার উর্দু অনুবাদসহ মূলকপি :

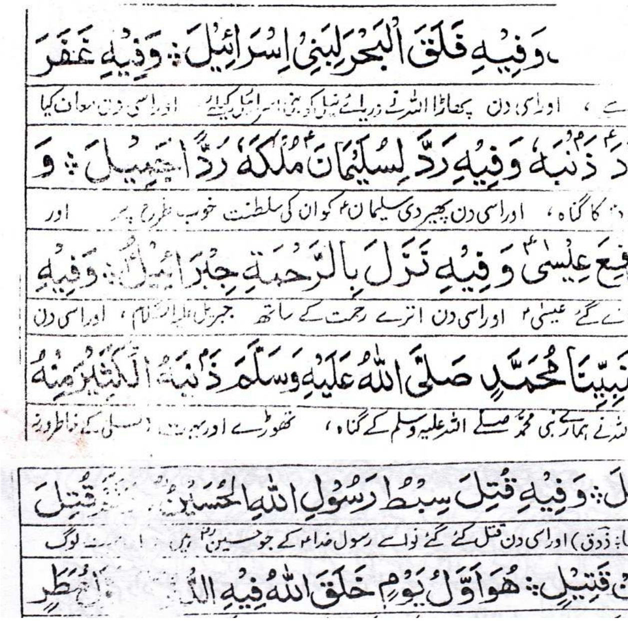

وَفِيْهِ فَلَقَ الْبَحْرَ لِبَنِيْ اِسْرَائِيْلَ ؛ وَفِيْهِ غَفَرَ

ہے ، اور اسی دن پھاڑا اللہ نے دریا کو بنی اسرائیل کیلئے اور اسی دن معاف کیا

لِدَاوٗدَ ذَنْبَهٗ وَفِيْهِ رَدَّ لِسُلَيْمَانَ مُلْكَهٗ رَدًّا جَمِيْلًا ؛ وَ

داود کا گناہ ، اور اسی دن پھیر دی سلیمان ع کو ان کی سلطنت خوب طرح پھر اور

فِيْهِ رُفِعَ عِيْسٰى وَفِيْهِ نَزَلَ بِالرَّحْمَةِ جِبْرَائِيْلُ ؛ وَفِيْهِ

اٹھائے گئے عیسیٰ ع اور اسی دن اترے رحمت کے ساتھ جبرئیل علیہ السلام ، اور اسی دن

غَفَرَ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَنْبَهُ الْكَثِيْرَ مِنْهُ

اللہ نے ہمارے نبی محمد صلے اللہ علیہ وسلم کے گناہ ، تھوڑے اور بہت [illegible]

وَالْقَلِيْلَ ؛ وَفِيْهِ قُتِلَ سِبْطُ رَسُوْلِ اللّٰهِ الْحُسَيْنُ [illegible] قَتِيْلَ

گناہ نہ تھا ؛ ذرق) اور اسی دن قتل کئے گئے نواسے رسول خدا ع کے جو حسین رض ہیں [illegible] لوگ

مَعَهٗ مِنْ قَتِيْلٍ ؛ هُوَ اَوَّلُ يَوْمٍ خَلَقَ اللّٰهُ فِيْهِ الدُّ [illegible] اَنْ يُّطِر

পাঠক মিলিয়ে দেখুন, আব্দুল করিম সিরাজনগরী খুতবায়ে ইয়াকুবিয়ার আশুরার দ্বিতীয় খুতবার যে সব বিষয়ের উপর অভিযোগ করেছেন অনুরূপ বিষয় উপরে উল্লেখিত খুতবায়ে ইবনে নাবাতার মধ্যে রয়েছে।

পাঠক মিলিয়ে দেখুন পুরনো উর্দু খুতবায়ে ইবনে নাবাতার মধ্যে রয়েছে-

وفيه غفر لداود ذنبه ، وفيه رد لسليمان ملكه ردا جميلا ، وفيه رفع عيسي ، وفيه نزل بالرحمة جبرائيل ،وفيه غفر لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم ذنبه الكثير منه والقليل ، وفيه قتل سبط رسول الله الحسين ،

অথচ আল খুতবাতুল ইয়াকুবিয়ার মধ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও হযরত দাউদ (আ.) এর ক্ষেত্রে **ذنب** (গুনাহ) শব্দ নেই, তবে খুতবাতে ইবনে নাবাতার মধ্যে রয়েছে। অথচ এটি রেজাখানীদের দৃষ্টিতে বিশুদ্ধতম খুতবা। রেজাখানীদের পরিবর্তন করা ইবনে নাবাতার মধ্যেও দাউদ (আ.) এর ক্ষেত্রে **ذنب** (গুনাহ) শব্দ রয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে পাঠকবৃন্দ দেখে নিতে পারেন।

রেজাখানীদের কিতাব জালিয়াতির দৃষ্টান্ত

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে রেজাখানীরা তাহরীফে সিদ্ধহস্ত। তারা বিভিন্ন কিতাবের এবারত পরিবর্তন করে। রেজাখানীরা উক্ত খুতবায়ে ইবনে নাবাতার মধ্যে غفر لنبينا (গুফিরা লি নাবিয়্যিনা) এর স্থলে তাহরীফ করে غفر لامة نبينا (গুফিরা লি উম্মাতি নাবিয়্যিনা) লিখে নিয়েছে। অর্থাৎ লি উম্মাতি শব্দ এখানে বাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আর কিতাবের মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন জঘন্য অপরাধ।

রেজাখানীদের তাহরীফের নমুনা দেখতে চাইলে পূর্বে প্রদত্ত মূল খুতবায়ে ইবনে নাবাতার সাথে রেজাখানীদের ছাপানো খুতবাতে ইবনে নাবাতা মাআ খুতবায়ে রেজভীয়্যাহ (পরিবর্তিত খুতবাতে ইবনে নাবাতা) মিলিয়ে দেখুন।

রেজাখানীদের তাহরীফকৃত খুতবাতে ইবনে নাবাতা

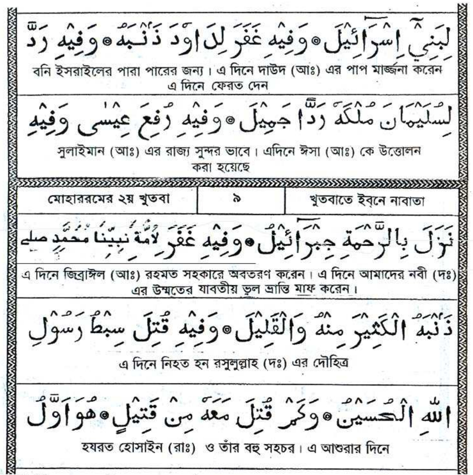

لبني اسرائيل ◎ وفيه غفر لداود ذنبه ◎ وفيه رد

বনি ইসরাইলের পারা পারের জন্য। এ দিনে দাউদ (আঃ) এর পাপ মার্জ্জনা করেন এ দিনে ফেরত দেন

لسليمان ملكه ردا جميلا ◎ وفيه رفع عيسى وفيه

সুলাইমান (আঃ) এর রাজ্য সুন্দর ভাবে। এদিনে ঈসা (আঃ) কে উত্তোলন করা হয়েছে

মোহাররমের ২য় খুতবা	৯	খুতবাতে ইবনে নাবাতা

نزل بالرحمة جبرائيل ◎ وفيه غفر لامة نبينا محمد صلى

এ দিনে জিব্রাঈল (আঃ) রহমত সহকারে অবতরণ করেন। এ দিনে আমাদের নবী (দঃ) এর উম্মতের যাবতীয় ভুল ভ্রান্তি মাফ করেন।

ذنبه الكثير منه والقليل ◎ وفيه قتل سبط رسول

এ দিনে নিহত হন রসুলুল্লাহ (দঃ) এর দৌহিত্র

الله الحسين ◎ وكم قتل معه من قتيل ◎ هو اول

হযরত হোসাইন (রাঃ) ও তাঁর বহু সহচর। এ আশুরার দিনে

পরিবর্তিত খুতবায়ে ইবনে নাবাতা, পৃষ্ঠা : ৮-৯

মূল খুতবার মধ্যে রয়েছে-

وفيه غفر لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم ذنبه الكثير منه والقليل

রেজাখানীরা পরিবর্তন করে লিখেছে-

وفيه غفر لامة نبينا محمد صلي الله عليه وسلم ذنبه الكثير منه والقليل

দেখুন কী জলজ্যান্ত জালিয়াতি !

পঞ্চম অধ্যায়

রেজাখানীদের বাতিল আকীদা

রেজাখানীরা সব সময় সুন্নীয়তের দাবি করে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের শ্লোগান দেয়। অথচ তাদের মধ্যে এমন অনেক আকীদা রয়েছে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের দৃষ্টিতে বাতিল আকীদা। যেমন–

রাসূল (সা.) এর আসন গ্রহণের জন্য চেয়ার রাখা

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী শর্ষিনায় অধ্যয়নরত অবস্থায় আবূ জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.) এর মুরীদ ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আবিদ শাহ এর কাছে মুরীদ হন। আবিদ শাহ আপন জীবনে প্রচুর ফিত্না-ফাসাদের সাথে জড়িত ছিলেন। তন্মধ্যে অন্যতম হল তিনি সভা সমিতিতে নিজে **সহ-সভাপতি** হয়ে সেই মাহফিলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–কে **সভাপতি** বানিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য একটি চেয়ার সাজিয়ে রাখতেন। সে রকম একটি মাহফিলের লিফলেটের অনুলিপি নিম্নে দেওয়া হলো।

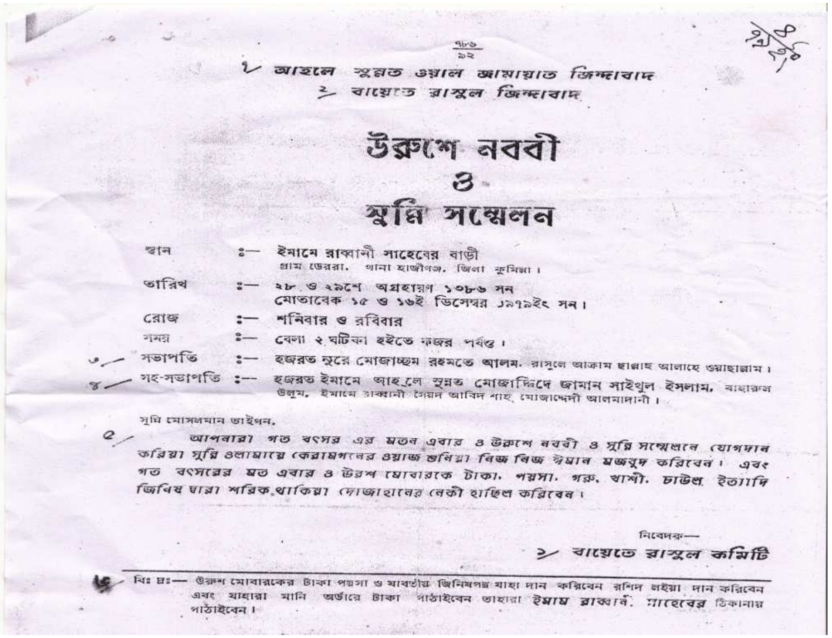

[illegible]

৭৮৬
৯২

১/ আহলে সুন্নত ওয়াল জামায়াত জিন্দাবাদ
২/ বায়েতে রাসুল জিন্দাবাদ

উরুশে নববী
ও
সুন্নি সম্মেলন

স্থান :— ইমামে রাব্বানী সাহেবের বাড়ী
গ্রাম ভেররা, থানা হাজীগঞ্জ, জিলা কুমিল্লা।
তারিখ :— ২৮ ও ২৯শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৬ সন
মোতাবেক ১৫ ও ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৯ইং সন।
রোজ :— শনিবার ও রবিবার
সময় :— বেলা ২ ঘটিকা হইতে ফজর পর্যন্ত।
৩/ সভাপতি :— হজরত নুরে মোজাচ্ছম রহমতে আলম, রাসুলে আকরাম ছাল্লাহু আলাহে ওয়াছাল্লাম।
৪/ সহ-সভাপতি :— হজরত ইমামে আহলে সুন্নত মোজাদ্দিদে জামান সাইফুল ইসলাম, বাহারুল উলুম, ইমামে রাব্বানী সৈয়দ আবিদ শাহ মোজাদ্দেদী আলমাদানী।

সুন্নি মোসলমান ভাইগন,

৫/ আপনারা গত বৎসর এর মতন এবার ও উরুশে নববী ও সুন্নি সম্মেলনে যোগদান করিয়া সুন্নি ওলামায়ে কেরামগনের ওয়াজ শুনিয়া নিজ নিজ ঈমান মজবুদ করিবেন। এবং গত বৎসরের মত এবার ও উরশ মোবারকে টাকা, পয়সা, গরু, খাশী, চাউল ইত্যাদি জিনিষ দ্বারা শরিক থাকিয়া দোজাহানের নেকী হাছিল করিবেন।

নিবেদক—
২/ বায়েতে রাসুল কমিটি

৬/ বিঃ দ্রঃ— উরুশ মোবারকের টাকা পয়সা ও যাবতীয় জিনিষপত্র যাহা দান করিবেন রশিদ লইয়া দান করিবেন এবং যাহারা মানি অর্ডারে টাকা পাঠাইবেন তাহারা ইমাম রাব্বানী সাহেবের ঠিকানায় পাঠাইবেন।

উপরোক্ত লিফলেটে দেখা যাচ্ছে যে **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সভাপতি বানিয়ে আবিদ শাহ নিজে উক্ত মাহফিলের সহ-সভাপতি হয়েছেন**। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বশরীরে উপস্থিত রেখে নিজে ওয়াজ করা, মুরিদানের ভক্তি-শ্রদ্ধা গ্রহণ করা কতটুকু বেয়াদবি তা রেজাখানী মসলকের আলিমদের নিকট প্রশ্ন রইল।

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত লিফলেটখানা সংগ্রহ করা হয়েছে পীরে তরীকত মাওলানা আব্দুল মতিন আল-কাদেরী হবিগঞ্জী এর নিকট হতে। লিফলেটের মূল কপিও সংরক্ষিত আছে।

পথভ্রষ্ট মুখতার ছকফীর সাথে আব্দুল করিম সিরাজনগরীর পীরের কাজের সাদৃশ্য

মুখতার ছকফী একজন পথভ্রষ্ট লোক ছিল। এ ব্যাপারে উম্মতে মোহাম্মদীর ঐকমত্য রয়েছে। ইয়াযিদের মৃতুর ছয় মাস পর মুখতার ছক্বফী কুফায় এসে শিয়াদেরকে একত্রিত করে তাদের নেতৃত্বে নিজেকে আসীন করে। শেষ পর্যন্ত ৬৬ হিজরির ১৪ রবিউল আউয়াল কুফার শাসনকর্তা ইবনে জুবায়েরকে ক্ষমতাচ্যুত করে ক্ষমতা দখল করে। (এই বিষয়ে আগ্রহী পাঠকগণ আল্লামা আবূ জাফর জারীর তাবারী (ওফাত : ৩১০ হি) এর তারিখে তাবারী দেখতে পারেন)।

এই মুখতার ছক্বফী যে সব অপকর্ম চালিয়েছিল তার বর্ণনা দিতে গিয়ে সায়্যিদ আমীমুল ইহসান (র.) তার 'তারিখে ইসলাম' কিতাবে লিখেছেন, **"সে (মুখতার ছক্বকী) একটি কাঠের কুরসী (আসন) রাখার বিদ'আত প্রচলন করেছিল**। এ আসন সম্পর্কে সে বলত, এটি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু-এর আসন, এ আসনের মর্যাদা বনী ঈসরাঈলের সিন্দুকের মর্যাদার ন্যায়। শেষ পর্যন্ত সে তার কাছে ওহী আসার দাবী করে।" (তারিখে ইসলাম, পৃষ্ঠা ১৯৩)

আবিদ শাহ'র চেয়ার রাখার এ বিদআত পথভ্রস্ট মুখতার ছকফীর কাজের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় কি?

রাসূল পাক (সা.) এর স্বশরীরে হাযির-নাযির থাকা

আব্দুল করিম গং রেজাখানিদের আকীদা হলো রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদা-সর্বদা সর্বস্থানে স্বশরীরে হাযির ও নাযির। এ আকীদার মধ্যে কিরূপ বিভ্রান্তি রয়েছে তা রেজাখানীদের উদ্ধৃতি থেকেই পাঠকবৃন্দ অনুধাবন করতে পারবেন।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হলো– রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দয়াপরবশ হয়ে যেখানে ইচ্ছা ভ্রমন করেন, যেখানে ইচ্ছা নয়, সেখানে তাঁকে জোরপূর্বক উপস্থিত করানো কোনো মাখলুকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী (র.) এর ফতওয়া উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তদীয় 'আলহাভী লিল ফাতাওয়া' এর মধ্যে বিভিন্ন বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন : "এ সমস্ত হাদিস ও বর্ণনার সারমর্ম এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেহ ও রূহসহ জীবিত আছেন। **তিনি পৃথিবীর যে অংশে এবং ফেরেশতা জগতে যেতে চান, যেতে পারেন এবং তাসাররুফ করতে পারেন, যেমন জীবদ্দশায় করতে পারতেন**। তিনি সেই আকৃতিতেই জীবিত আছেন, যে আকৃতিতে ওফাতের পূর্বে ছিলেন। এতে পরিবর্তন আসেনি। তিনি জীবিত ফিরিশতাগণের মতই লোকচক্ষুর অন্তরালে আছেন। আল্লাহ তা'আয়ালা কোনো ব্যক্তিকে তাঁর যিয়ারত দ্বারা সম্মানিত করার ইচ্ছা করলে তার জন্য পর্দা তুলে দেন এবং তাকে ধন্য করেন। সেই ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সে আকৃতিতেই দেখে। এতে কোনো বাঁধা নেই এবং আলমে মিছালের সাথে এর কোনো বিশেষত্ব নেই। (আলহাভী লিল ফাতাওয়া)

রেজাখানীরা বক্তব্য বিবৃতিতে হাযির-নাযিরের ভ্রান্ত আকীদা প্রচার করলেও তাদের জীবনের বাস্তবতা এর বিপরীত। যেমন : আহমদ রেজাখান সাহেবের জীবনী গ্রন্থ 'জীবন ও কারামত' পুস্তকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সরাসরি দর্শন লাভের আলোচনা করতে গিয়ে লেখক যা লিখেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো– আলা হযরত রাওদ্বা পাকের সামনে দাঁড়িয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দরবারে সালাম পেশ করত: নাত পাঠ করে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বশরীরে দেখার দরখাস্ত পেশ করেন। একাধারে দুই দিন দরখাস্ত পেশ করেও রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দর্শন লাভে ব্যর্থ হন। তৃতীয় দিন তার আশা পূরণ হয়। তিনি সরাসরি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত লাভ করেন। (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ২২৭)

জীবন ও কারামত পুস্তকের এ ভাষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সদা-সর্বদা সর্বস্থানে হাযির-নাযির নন। কেননা আহমদ রেজা খান সাহেব মদীনায় রওদ্বা শরীফে উপস্থিত হয়ে তিনদিন অপেক্ষা করত সাক্ষাত লাভের সুযোগ লাভ করেছিলেন। যদি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম সর্বত্র সবসময় হাযির-নাযির থাকেন তাহলে রেজাখান সাহেবকে কেন তিনদিন অপেক্ষা করতে হলো?

অবশ্য অনেক অলী-আল্লাহ এমন ছিলেন যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি ধ্যানমগ্ন হলেই তার দীদার তাদের নসীব হতো। উদাহরণস্বরূপ ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী (র.) লিখিত আলহাভী লিলফাতাওয়া কিতাব থেকে একটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো। ঘটনাটি হলো এই– "এক ব্যক্তি শায়খ আবূল আব্বাস মারসীকে বলল: হুযূর! আমার সাথে আপনার এ হস্ত দ্বারা মুছাফাহা করুন। কারণ আপনি অনেক মর্দে খোদার সাথে সাক্ষাত করেছেন, দেশ বিদেশে ঘুরেছেন এবং তাদের সাথে মুসাফাহা করেছেন। শায়খ মারসী বললেন, আল্লাহর কসম, আমি এই হাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া কারও সাথে মুসাফাহা করিনি। তিনি আরও বললেন, যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক নিমিষের জন্যেও আমা থেকে উধাও হয়ে যান, তবে আমি নিজেকে মুসলমান মনে করি না (আলহাভী লিলফাতাওয়া)।" এ ধরনের ঘটনা খুবই বিরল এবং এটি উচ্চ স্তরের ওলী-আল্লাহদের মাকাম।

যাই হোক, আব্দুল করিম গং রেজাখানীরা যেহেতু রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সদা-সর্বদা সর্বস্থানে স্বশরীরে হাযির ও নাযির বিশ্বাস করেন সেহেতু তাদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হলো, তারা যখন আউলিয়ায়ে কিরামের ব্যাপারে মিথ্যা অপপ্রচার চালান, উচ্চ স্বরে কথা বলেন, বিড়ি-সিগারেট পান করেন, এ সব অবস্থায়ও কি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তাদের মধ্যে হাযির নাযির দাবি করার দুঃসাহস দেখাতে চান? আর যদি তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সর্বত্র হাযির নাযির দাবি করেন তবে কেন চেয়ার সাজিয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নির্ধারিত স্থানে সীমাবদ্ধ করেন ? যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

জেনে রাখা উচিত এ বিষয়ে ইমাম জালালুদ্দীন সূয়ুতী (র.) এর ফতওয়া : **তিনি পৃথিবীর যে অংশে এবং ফেরেশতা জগতে যেতে চান, যেতে পারেন এবং তাসাররুফ করতে পারেন, যেমন জীবদ্দশায় করতে পারতেন-** এটিই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদা। একে পাশ কাটিয়ে বানোয়াট আকীদা প্রচার করতে গেলে ঈমান রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

হাযির-নাযির প্রসঙ্গে রেজাখানীদের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং রেজাখানীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বশরীরে সর্বত্র হাযির-নাযির বিশ্বাস করা এবং এ বিশ্বাস প্রচার করাকে ঈমানী দায়িত্ব মনে করেন। অথচ এ ব্যাপারে তাদের শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কিরামের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য রয়েছে। যেমন–

মৌলভী মোঃ উমর আচরয়ী রেজভী এর বক্তব্য- ''যদি তোমরা মুমিন হও তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হাযির-নাযির বিশ্বাস করা তোমাদের জন্য আবশ্যক।'' (মিকইয়াছে হানাফিয়্যাত, পৃষ্ঠা ২৭৫)

অন্যত্র তিনি লিখেছেন- "সকল আহলে ঈমানের জন্য রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে হাযির-নাযির জানা ঈমানের পূর্ণাঙ্গতা।" (মিকইয়াছে হানাফিয়্যাত, পৃষ্ঠা ২৭৭)

এ প্রসঙ্গে আহমদ রেজাখান সাহেবের ছাহেবজাদা মোস্তফা রেজা খান লিখেছেন- "হাযির ও নাযির রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। তিনি নিশ্চিতভাবে সব স্থানেই হাযির ও নাযির। তাঁর এ গুণে আর কোনো অংশীদার নেই।'' (আল মালফুজ মোস্তফা রেজাখান, ১ম খণ্ড)

অপরদিকে আহমদ ইয়ার খান নঈমী লিখেছেন- "হাযির-নাযির এর অর্থ এই নয় যে, অনেকগুলো দেহ নিয়ে অনেক স্থানে উপস্থিত হন অথবা এও নয় যে, একই দেহ নিয়ে সব কিছু বেষ্টন করে আছেন। বরং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাযির-নাযির হওয়া এভাবে যেমন সূর্য আসমানের এক স্থানে থেকে সমস্ত যমীনে আলো বিকিরণ করে।'' (মাওয়াইজে নঈমিয়্যাহ, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৫৬)

আহমদ ইয়ার খান নঈমীর উপরোক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা গেলো- রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বশরীরে উপস্থিত নন।

আহমদ ইয়ার খান নঈমী জা'আল হক কিতাবে লিখেছেন- "এমনিভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৎ কর্মশীলদের জানাযার নামাযে স্বশরীরে তাশরীফ আনেন (আগমন করেন)।

উক্ত বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানাযার স্থানে প্রথম থেকে উপস্থিত থাকেন না। জানাযার সময় এখানে তাশরীফ আনেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বত্র সব সময় স্বশরীরে হাযির নাযির নন।

অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল 'হায়াত মউত কবর হাশর' গ্রন্থে মৃত্যুকালীন অবস্থার বর্ণনায় একটি পংক্তি এনেছেন-

"আমার মউতের নিদান কালে আসিবেন নবীগো আমারি শিয়রে
দেখিব আপনাকে আপন নয়নে ইয়া রাসূলাল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ।"
(হায়াত মউত কবর হাশর, পৃষ্ঠা ১৩৭)

উক্ত পংক্তি দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামসর্বাবস্থায় হাযির নন। কেননা, নবী হাযির হলে আসার দরখাস্ত করার কোনো প্রয়োজন নেই।

উল্লেখ্য, রেজাখানীদের বিশিষ্ট আলিম আহমদ সাঈদ কাজিমীর উস্তাদ দিদার আলী শাহ উল ওয়ারা লিখেছেন-

لفظ حاضر وناظر سے اگر حضور ونظور بالذات مثل حضور باری تعالی ہر وقت اور ہر لحظہ مراد ہے تو یہ عقیدہ محض غلط مفضی الی الشرک ہے۔ (رسول الکلام۔ مولوی دیدار علی شاہ الوری۔ صفحہ ۱۰۵)

অনুবাদ : যদি হাযির নাযির এর অর্থ আল্লাহ তায়ালা যেমন সব সময় এবং সর্ব মূহুর্তে হাযির নাযির এ উদ্দেশ্যে বলা হয় তবে এটি ভ্রান্ত আকীদা এবং শিরকে লিপ্ত হওয়ার কারণ হবে। (রাসূলুল কালাম, মৌলভী দিদার আলী শাহ উল ওয়ারা, পৃষ্ঠা ১০৫)

এবক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, **দিদার আলী শাহ উল ওয়ারা আল্লাহ তাআলাকে সবসময় ও সর্ব মুহূর্তে হাযির নাযির বলেছেন। অপরদিকে মৌলভী আহমদ সাঈদ কাজিমী লিখেছেন- "আল্লাহ তায়ালাকে হাযির-নাযির বলা কুফরী।" (তাসকীনে খাওয়াতীর, পৃষ্ঠা ৭) আর আহমদ রেজাখান সাহেবের খলীফা আহমদ ইয়ার খান নঈমী লিখেছেন, "আল্লাহকে সর্বত্র উপস্থিত মেনে নেয়া ধর্মহীনতা।' (জা'আল হক, পৃষ্ঠা ১২১)**

আহমদ রেজাখান সাহেবের দৃষ্টিতে নবী হাযির নন

আহমদ রেজা খান সাহেব তার মৃত্যুর পর কবরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কিভাবে সালাম দিবেন 'জীবন ও কারামত' বই-এ এর বর্ণনা এসেছে। আহমদ রেজা খান বলেছেন– ''তোমরা আমার কবরকে এতো গভীর করে খনন করবে যাতে আমি দাঁড়াতে পারি। অর্থাৎ যখন প্রিয় নবী আমার কবরে তাশরীফ আনবেন তখন আমি আহমদ রেজা বসে না থেকে যেন দাঁড়িয়ে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে স্বাগত জানাতে পারি

সেজন্য তোমরা আমার কবরকে গভীর করে তৈয়ার করবে।'' (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ৭৪)

আহমদ রেজা খান সাহেবের বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হচ্ছে- তার কবরে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরীফ আনবেন। এমন নয় যে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগ থেকেই উপস্থিত থাকবেন। অর্থাৎ তার দৃষ্টিতে নবী হাযির নাযির নন।

রেজাখানীদের দৃষ্টিতে তা'যীমী সেজদা জায়িয

'জীবন ও কারামত' পুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে- ''আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু আনহু ঐ সব মানুষের জন্য সেজদা করাকে হারাম বলেছেন যাদের হুশ ঠিক আছে। তবে হ্যাঁ, যদি কোনো আশেক প্রিয় নবীর দরবারে গিয়ে অথবা অন্য কোনো ওলী বুযূর্গদের মাজারে গিয়ে ছাহেবে মাজারের দীদার লাভ করে হুশ হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ দুনিয়াবী কোনো খেয়াল না থাকে এমতাবস্থায় যদি সে সিজদা করে তাহলে তার জন্য ঐ সময় সিজদা করা শুধু জায়েয নয়, বরং খুব উত্তম।'' (জীবন ও কারামত, পৃ-১৪৩)

উল্লেখিত বক্তব্যের মাধ্যমে রেজাখানীরা অতি কৌশলে কবরে সিজদা দেওয়াকে জায়িয সাব্যস্ত করত উৎসাহ প্রদান করেছেন, যার প্রতিফলন তাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

আল্লাহ তাআলা কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষী হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা হল আল্লাহ তাআলা স্বয়ং সম্পূর্ণ, তিনি কারো পরামর্শের মুখাপেক্ষী নন। এ কারণে কোনো নবী বা রাসূলকে তার পরামর্শদাতা (মন্ত্রী, ওযীর) বলা ইসলামী আকীদার পরিপন্থি। এ ব্যাপারে রেজাখানীদের হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমীর পরস্পরবিরোধী বক্তব্য তুলে ধরা হল। তিনি তার লিখিত 'শানে হাবিবুর রহমান' কিতাবে সুরা আহযাবের ৪০নং আয়াতের ব্যাখ্যায় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শব্দের বিশ্লেষণে লিখেছেন- মুহাম্মদ শব্দের মধ্যে চার অক্ষর আর আল্লাহ শব্দের মধ্যেও চার হরফ। মুহাম্মদ এর মধ্যে একটি তাশদীদ আর আল্লাহর মধ্যেও একটি তাশদীদ। হ্যাঁ আল্লাহ শব্দের তাশদীদের মধ্যে আলিফ আছে কিন্তু মুহাম্মদ এর মধ্যে নেই। যা দ্বারা একথা বুঝা গেল যে আল্লাহ হচ্ছেন সুলতান

আর মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ তাঁর প্রধান উজির। (শানে হাবীবুর রহমান (দঃ), পৃষ্ঠা ২১২)

পক্ষান্তরে আবার তিনিই (আহমদ ইয়ার খান নঈমী) তার লিখিত ‘তাফসীরে নুরুল ইরফান’ গ্রন্থে বাতিল আকীদার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন-

‘কোনো নবী খোদা তাআলার ওযীর (পরামর্শদাতা) হতে পারেন না। কেননা ওযীর ঐ ব্যক্তিই হন যিনি বাদশার প্রয়োজনীয় বিষয়ে সহযোগিতা করে থাকেন এবং রাষ্ট্রীয় গুরু দায়িত্ব পালন করেন। আল্লাহ তাআলা প্রয়োজনের অমুখাপেক্ষী। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৫৫৭)

দেখুন, তাদের বক্তব্য কিরূপ পরস্পরবিরোধী। তাদের নিজেদের বক্তব্যেই তারা বাতিল আকীদায় বিশ্বাসী।

রেজাখানী ফতওয়ার নমুনা

ফতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু রেজাখানীরা এক্ষেত্রে উদাসীন। তাদের ফতওয়া পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তারা তাদের প্রবৃত্তির চাহিদামতো ফতওয়া প্রদান করে এবং উসূলে ইফতা তথা ফতওয়ার নীতিমালার কোনো ধার ধারে না।

যুগ যুগ থেকে আলিম-উলামার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ইখতিলাফ হয়ে আসছে। এমনকি ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে ফরয-ওয়াজিব নিয়েও ইখতিলাফ আছে। যেমন কিরাআত খালফাল ইমাম, সালাতুল বিতর ইত্যাদি। কিন্তু মাসআলাগত মতবিরোধের কারণে রেজাখানীদের মতো এত নোংরা, কদর্য ও অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ ও নীচু মানসিকতার নজীর ইসলামের বুদ্ধিভিত্তিক ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। রেজাখানীরা মুসলমানদের ঈমান-আকীদা বিনষ্ট করার হীন প্রয়াসের পাশাপাশি ইসলামের মতভিন্নতার অনুপম নীতি-আদর্শ ও এর মহান উদ্দেশ্যকে কলঙ্কিত করছে। রেজাখানীদের ফতওয়া পাঠ করলেই পাঠকবৃন্দ এটি অনুধাবন করতে পারবেন। রেজাখানীরা প্রবৃত্তির তাড়নায় বিদ্বেষপ্রসূত ফতওয়া প্রদানের ফলে তাদের ফতওয়ার গ্রহণযোগ্যতা যেমন শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে তেমনি সামগ্রিকভাবে ফতওয়াকেও মানুষের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। রেজাখানীরা এমন সব ফতওয়া প্রদান করেছে যার উপর তারা নিজেরাও আমল করতে পারেনি। এমনকি নিজেরাই নিজেদের ফতওয়ার শিকার হয়েছে। তাদের ফতওয়া তাদের উপরই পতিত হয়েছে। নিম্নে রেজাখানী ফতওয়ার কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

দেওবন্দী আকীদাওয়ালারা মুসলমান নয়

দেওবন্দী, সাহারানপুরী, নানুতুবী ও এলাহাবাদী বক্তাগণের ব্যাপারে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তরে আহমদ রেজা খান বেরলভী সাহেব যে ফতওয়া প্রদান করেছেন তা নিম্নে পেশ করা হল-

الجواب: واعظ کے لئے شرط ہے کہ مسلمان ہوں۔ دیوبندی عقیدہ
والے مسلمان ہی نہیں۔ انکا وعظ سننا حرام ہے اور دانستہ انہیں واعظ بنانا کفر
ہے۔ علماء حرمین شریفین نے فرمایا ہی کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔
(فتاوی رضویۃ: ج۔۱۲، ص۔۳۱۱)

উত্তর : ওয়ায়েজের (বক্তা) জন্য প্রথমত শর্ত হল, মুসলমান হওয়া। দেওবন্দী আকীদা ওয়ালারা তো মুসলমানই নয়। তাদের ওয়াজ শুনা হারাম। জেনে শুনে তাদেরকে ওয়ায়েজ (বক্তা) নিযুক্ত করা কুফুরী। হারামাইন শরীফাইনের উলামাগণ বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কুফুরীর ব্যাপারে এবং শাস্তি পাওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করল, সেও কাফের হয়ে গেল। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ, খণ্ড ১২, পৃষ্ঠা ৩১১)

নিজেদের ফতওয়ায় নিজেরাই হারাম ও কুফরীতে লিপ্ত!

উপরোক্ত ফতওয়ায় তাদের ওয়াজ শুনা হারাম বলা হয়েছে এবং জেনে শুনে তাদেরকে ওয়ায়েজ নিযুক্ত করাকে কুফরী বলা হয়েছে। অথচ বাংলা কানযুল ঈমানের ভূমিকায় আহমদ রেজাখানের ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে রেজাখানীরা আশরাফ আলী থানভী সাহেবের অভিমত তুলে ধরেছে এভাবে যে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী বলেছেন- “আমার যদি সুযোগ হত, তবে আমি মৌলভী আহমদ রেজা খান বেরলভীর পেছনে নামাজ পড়ে নিতাম”।

মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র.) এর পুত্র মাওলানা খলিলুর রহমান এর বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে এভাবে ‘‘যদি এ মুহূর্তে আমার সম্মানিত পিতা থাকতেন তবে তিনি আপনার জ্ঞান সমুদ্রের প্রশংসা মুক্ত মনে করতেন।’’ (আব্দুল মান্নান অনূদিত কানযুল ঈমানের ভূমিকা, পৃষ্ঠা ২৭)

এ দু’টি উদ্ধৃতি এবং এরকম আরো অন্যান্য উদ্ধৃতি প্রমাণ করে যে, রেজাখানীরা দেওবন্দীদের কিতাব পড়েন, তাদের ওয়াজ শুনেন এবং নিজেদের লেখায়ও তা উদ্ধৃত করেন। অর্থাৎ নিজেদের ফতওয়া অনুযায়ী তারা হারাম ও কুফরীতে লিপ্ত।

হারাম ও কুফরী থেকে বিরত থাকুন

রেজাখানীদের উচিৎ ছিল দেওবন্দীদের কিতাব তাদের অনুসারীদের পড়তে নিষেধ করা। অথচ তারা তাদের বক্তব্য শুনেছেন এবং তাদের অনুসারীদের জন্য উদ্ধৃত করেছেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, তাদের এ উক্তিগুলো পড়ে আহমদ রেজা খানের প্রতি সাধারণ মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাবে। উল্লেখ্য যে, তাদের (দেওবন্দীদের) সব ধরণের বক্তব্য শুনা আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া অনুযায়ী হারাম। আর হারাম কাজ জায়িয মনে করে করা কুফরী।
অতএব রেজাখানীদের প্রতি আহ্বান, হারাম ও কুফরী থেকে বিরত থাকুন এবং নিজেদের রচনা ও ওয়াজ-নসীহত থেকে দেওবন্দীদের উদ্ধৃতি বাদ দিন।

দেওবন্দীদের সাথে মেলামেশা হারাম!

দেওবন্দীদের সাথে মেলামেশা বিষয়ে আহমদ রেজা খান সাহেবের একটি ফতওয়া নিম্নরূপ :

ان سے میل جول قطعی حرام ان سے سلام وکلام حرام انہیں پاس بیٹھانا حرام ان کے پاس بیٹھنا حرام۔ (فتوی رضویۃ۔ ج٦، ص٩٠)

অনুবাদ : দেওবন্দীদের সাথে মেলামেশা করা অকাট্যভাবে হারাম। তাদের সালাম করা এবং কথা বলা হারাম। তাদের পাশে বসানো এবং তাদের পাশ বসাও হারাম। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৯০)
এ ফতওয়ার আলোকে যেহেতু দেওবন্দীদের সাথে কথা বলা ও তাদের সাথে বসা হারাম সেহেতু তাদের সাথে বহছ-মুবাহাছায় মিলিত হওয়া, এ সময় তাদের কাছে বসা কিংবা তাদেরকে কাছে বসানো কি রেজাখানীদের জন্য উচিত হবে? রেজাখানীরা বলে থাকেন তারা বিভিন্ন স্থানে দেওবন্দীদের সাথে বহছ করেছেন। এসময় কি তারা তাদের সাথে কথা বলেছেন? যদি বলে থাকেন তাহলে এটা কি তারা জায়েয মনে করে করেছেন? যদি জায়েয মনে না করেন তাহলে কেন হারাম কাজের মধ্যে লিপ্ত হলেন?

দেওবন্দী আকীদা পোষণকারীদের কিতাবগুলো হিন্দুদের পুঁথি গ্রন্থ থেকেও নিম্নমানের

দেওবন্দীদের কিতাব সম্পর্কে আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া–

دیوبندی عقیدہ والوں کی کتابیں ھندؤں کی پوتھیوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان کتابوں کو دیکھنا حرام، البتہ ان کتابوں کی ورقوں سے استنجا نہ کیا جائے حروف کی تعظیم کی وجہ سے نہ کہ ان کتابوں کی۔ نیز اشرف علی کے عذاب میں شک کرنا بھی کفر ہے۔ (فتوی رضویہ، جلد:٢، صفحہ:١٣٦)

অর্থাৎ দেওবন্দী আকীদা পোষনকারীদের কিতাবগুলো হিন্দুদের পুঁথি গ্রন্থ থেকেও নিম্নমানের। এ কিতাবগুলো দেখা হারাম। এ কিতাবগুলোর পাতা দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা যাবে না; তাদের কিতাবের সম্মানার্থে নয়, বরং কিতাবে লিখিত হরফগুলোর কারণে। আশরাফ আলী (থানভী)'র শাস্তির ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করাও কুফরী। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৬)
উক্ত ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেওবন্দীদের কিতাব দেখা হারাম অর্থাৎ বেগানা মহিলার প্রতি কুদৃষ্টিতে তাকানো যেরূপ হারাম তেমনি দেওবন্দীদের কিতাবের প্রতি তাকানো ও হারাম।
এখন প্রশ্ন হলো– **দেওবন্দীদের ভুল-ক্রটি অন্বেষণ কিংবা নিজেদের পক্ষে বক্তব্য সংগ্রহের জন্য রেজাখানীরা ঐ কিতাবগুলো পাঠ করেন এবং তা থেকে উদ্ধৃতি আনেন তখন কি এটা জায়িয মনে করে করে থাকেন? যদি জায়িয মনে করে করে থাকেন তাহলে প্রশ্ন হলো হারামকে হালাল মনে করা কি কুফুরী নয়?** আর যদি হারাম মনে করে থাকেন তাহলে রেজাখানীরা এত হারাম কাজে কেন প্রবৃত্ত হন? দেওবন্দীদের কিতাব দেখা যেহেতু হারাম সেহেতু রেজাখানীদের উচিত হলো কোনো বহছ মুবাহাছায় দেওবন্দীদের কিতাব নেয়া প্রয়োজন হলে দেওবন্দী কোনো আলিমও সাথে নেয়া এবং তাদের মাধ্যমে তা পাঠ করানো।

নিজেদের ফতওয়ার শিকার রেজাখানীরা

প্রকাশ থাকে যে, পাক ভারত উপমহাদেশের আলিমগণের সম্মানসূচক উপাধি হলো 'মাওলানা'। এটি কারো নামের অংশ নয়। এ উপাধিটি অত্যন্ত সম্মানিত। ওহাবীরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামের সাথে এটি ব্যবহার করা নাজায়িয বলে ফতওয়া দিয়ে থাকে। কোনো অমুসলমানের সাথে এটি ব্যবহারের নজীরও

কোথাও নেই। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলিমগণ নবী, রাসূল ও তাঁদের ওয়ারিস উলামায়ে কিরামের সাথে এটি ব্যবহার করে থাকেন।
আহমদ রেজা খান সাহেবের জীবনী গ্রন্থ 'জীবন ও কারামত' এর মধ্যে আলা হযরত ইমাম আহমদ রেজা সম্পর্কে কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তিদের অভিমত শীর্ষক অনুচ্ছেদের ১৭১ পৃষ্ঠায়, অনুরূপভাবে বঙ্গানুবাদ কানযুল ঈমানে দেওবন্দী বুযুর্গ মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর মূল্যায়ন আনতে গিয়ে তার নামে সাথে 'মাওলানা' শব্দ যোগ করে লিখেছেন 'মাওলানা আশরাফ আলী থানভী'। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, রেজাখানীরা তাকে মুসলমান ও আলিম হিসেবে বিশ্বাস করেন। অথচ উপরোল্লিখিত আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, তার কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করাও কুফরী। সুতরাং তাদের নিজেদের ফতওয়া অনুযায়ীই রেজাখানীরা কুফরীতে লিপ্ত। রেজাখানীরা অন্যদের উপর কুফরীর ফতওয়া প্রদান করে থাকে। অথচ তাদের নিজেদের ফতওয়াতেই তাদের কুফরী প্রমাণিত হয়। অন্য কারো ফতওয়া এক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই।

আহমদ রেজা খান সাহেবের জীবনী গ্রন্থ 'জীবন ও কারামত' বইয়ে আহমদ রেজা খান সাহেবের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা আলোচনা করতে গিয়ে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এর কয়েকটি ঘটনাও উল্লেখ করা হয়েছে। পাকিস্থান থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'আখবারে চ্যাটান' ম্যাগাজিনের উদ্ধৃতি দিয়ে গ্রন্থকার লিখেছেন : "যেদিন আলা হযরত কেবলা ইন্তেকাল ফরমায়েছেন, সেদিন ওহাবীদের হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশ্রফ আলী থানভী সাহেব একটি বড় জলসায় তক্বরীর করতেছিল। সে যখন তক্বরীর শুরু করল তখন খবর পেল আলা হযরত মাওলানা আহমদ রেজা খান সাহেব ইন্তেকাল ফরমায়েছেন, এ সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে আশ্রফ আলী থানবী সাহেব তার তক্বরীর বন্ধ করে দিল এবং চিন্তিত হয়ে বলল, মৌলভী আহমদ রেজা খান সাহেবের সাথে সারা জীবন আমাদের সাথে বিতর্ক হয়েছে। কিন্তু আমরা তার মাগফেরাতের জন্য দোয়া করতেছি। সে এবং তার সাথে জলসায় সমবেত সকলেই আলা হযরতের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করল।" (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ৭৫)
উপরোক্ত বক্তব্য থেকে যে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয় তা হলো-
১। আহমদ রেজা খান ও তার অনুসারীরা সারা জীবন আশরাফ আলী থানভী সাহেবের সাথে বিতর্ক করেছেন।

২। রেজাখানিদের এত শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও আশরাফ আলী থানভী সাহেব আহমদ রেজা খানের মৃত্যুর পর তার মাগফিরাতের দুআ করেছেন।
৩। আহমদ রেজা খান সাহেবের দৃষ্টিতে যে আশরাফ আলী থানভীর কুফরীর ব্যাপারে সন্দেহ করলেও কুফরী হবে (নাউযুবিল্লাহ) আহমদ রেজা খান সাহেবকে বুযুর্গ প্রমাণ করতে গিয়ে সেই আশরাফ আলী থানভী সাহেবের স্বীকৃতি নেয়াও জরুরি। তাদের বর্ণনা থেকেই এটি প্রমাণ হয়।
৪। দেওবন্দীদের বক্তব্য শোনা হারাম হলেও আহমদ রেজা খান সাহেবের ফযীলত প্রমাণে আশরাফ আলী থানভী সাহেবের বক্তব্য শোনা, লেখা এবং পাঠ করা এমনকি প্রচার করাও ওয়াজিব।
৫। রেজাখানীরা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা হলেও মাওলানা আশরাফ আলী থানভী অত্যন্ত উদার ছিলেন।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী'র সাথে দীর্ঘ বিরোধ থাকার কারণে আহমদ রেজাখান সাহেবের অনুসরনে আব্দুল করিম গং রেজাখানীরাও হয়তো তাকে কাফির আখ্যা দেন। কিন্তু যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় আব্দুল করিম সিরাজনগরীর লেখা-পড়া, যাদের সাথে তার ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক তাদেরকে কাফির আখ্যা দিতেও তিনি (সিরাজনগরী) দ্বিধা বোধ করেন না। এমনকি এ বিষয়ে অহরহ আবোল-তাবোল লিখে যাচ্ছেন। আমাদের উলামায়ে কিরাম এ ধরনের লেখার বিরোধিতা না করা কিংবা জবাব না দেয়ার কারণে যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। শেখ সাদী (র.) বলেছেন,

چوباسفلہ گوئ بلطف وخوشی
فزوں گرددش کبرو گردن کشی

অনুবাদ : তুমি যদি মূর্খের সাথে খুশী হয়ে দয়া করে কথা বল তাহলে সে বিদ্রোহী ও অহংকারী হবে। (গুলিস্তা)
শেখ সাদী (র.) এর এ পংক্তির হিকমত হলো, জ্ঞানীর পক্ষে মূর্খ ব্যক্তির অজ্ঞতার প্রশ্রয় দেয়া উচিত হবে না। কারণ, এতে দু'ধরণের ক্ষতি হবে, প্রথমত: তার ভয় ভয় কমে যাবে, দ্বিতীয়ত: সে জেহালতির উপর মজবুত হবে।

আহমদ রেজা খান সাহেবের চিন্তাধারার সাথে সলফে সালেহীনের চিন্তাধারার পার্থক্য

খাতিমাতুল মুহাক্কিকীন, উমদাতুল মুদাক্কিকীন, মুফতীয়ে বাগদাদ হযরত আল্লামা আবূল ফযল শিহাবুদ্দীন আস সায়্যিদ মাহমুদ আল আলুসী আল বাগদাদী (র.) ছিলেন হানাফী মাযহাবের গৌরব। তার লিখিত তাফসীর “তাফসীরে রূহুল মাআনী” হানাফী মাযহাবের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য তাফসীরগ্রন্থ। হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত ও আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা সংক্রান্ত অনেক বিষয়ে হাফিয ইবনুল কায়্যিম আল জাওযীর মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আল্লামা আলুসী (র.) তার লিখিত “তাফসীরে রুহুল মাআনী” এর মধ্যে ইবনুল কায়্যিম আল জাওযীর অনেক উদ্ধৃতি এনেছেন এবং এ সময় অত্যন্ত সম্মানের সাথে তার নাম লিখেছেন। আর এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আদর্শ।

ইমাম আলুসী (র.) সূরা বুরুজ এর ৬ নং আয়াত **خلق من ماء دافق** এর তাফসীরে ইবনুল কায়্যিম আল জাওযীর কিতাব থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণের সময় তার নাম লিখেছেন এভাবে-

فی کتاب الروح للعلامة إبن القيم عليه الرحمة (روح المعاني ، ج ١٥، ص ١٨٦)

অর্থ- আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আলাইহির রাহমাহ (তার উপর রহমত বর্ষিত হোক) এর ‘কিতাবুর রূহ’ এর মধ্যে রয়েছে। (রুহুল মাআনী, খণ্ড ১৫, পৃষ্ঠা ১৮৬)

অথচ আহমদ রেজা খান সাহেব চিরাচরিত স্বভাব অনুযায়ী ইবনুল কায়্যিম আল জাওযীকে ‘ধর্মদ্রোহী’ বলে ফতওয়া প্রদান করেছেন। তার ফতওয়াটি নিম্নরূপ-

ابن القیم ملحد تھا۔ (فتوی رضویۃ۔ ج۴، ص۱۹۹)

অনুবাদ ঃ ইবনুল কায়্যিম মুলহিদ (ধর্মদ্রোহী) ছিলেন। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৯৯)

প্রকাশ থাকে যে, মুলহিদ তাদেরকে বলা হয় যারা ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেছে।

সম্মানিত পাঠক লক্ষ্য করুন, আকীদাগত ও ফিকহী অনেক ইখতিলাফ থাকা সত্ত্বেও আল্লামা আলুসী বাগদাদী (র.) হাফিয ইবনুল কায়্যিম আল জওযীর প্রতি

সম্মান প্রদর্শন করেছেন। এটা থেকে শিক্ষা নিয়ে রেজাখানীদের বেয়াদবি থেকে বিরত থাকা উচিত।

দেওবন্দীদের কিতাব পেশাবের উপযুক্ত

অন্য এক ফতওয়ায় আহমদ রেজা খান বলেন-

دیوبندی کی کتابیں اس قابل ہیں کہ ان پر پیشاب کیا جائے۔ ان پر پیشاب کرنا پیشاب کو مزید ناپاک کرنا ہے۔ اے اللہ! ہمیں دیوبندیوں یعنی شیطان کے بندوں سے پناہ میں رکھ۔ (سبحان السبوح، حاشیہ۔ احمد رضا خان بریلوی، صفحہ: ۷۵)

অনুবাদ : দেওবন্দীদের কিতাবগুলোতে পেশাব করার উপযুক্ত। এগুলোতে পেশাব করা মানে পেশাবকে আরো বেশী নাপাক করা। হে আল্লাহ! আমাদেরকে দেওবন্দীদের অর্থাৎ শয়তানের বান্দাদের থেকে হেফাযত করুন। (হাশিয়ায়ে সুবহানাস সুবুহ, আহমদ রেজা খান, পৃষ্ঠা ৭৫)

এ ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, দেওবন্দীদের কিতাবাদিতে কুরআন হাদীসের আলোচনা থাকলেও তাতে পেশাব করা জায়িয। (নাউযুবিল্লাহ)

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং রেজাখানীরা এ ধরণের কোনো কাজ জীবনে করেছেন কি না তা জানতে ইচ্ছে করে।

আরেকটি প্রশ্ন, বুখারী শরীফের হাশিয়াহ লিখেছেন মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী দেওবন্দী (র.)। রেজাখানী আলিম আব্দুল করিম সিরাজনগরী শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করেছেন। আর শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসাসহ অন্যান্য সকল মাদরাসায় বুখারী শরীফ পাঠদানের সময় গুরুত্ব সহকারে হাশিয়াও পড়ানো হয়। আব্দুল করিম সিরাজনগরী দেওবন্দী আলিমের কিতাব পড়ে নিজের ঈমান কতটুকু ঠিক রাখতে পেরেছেন?

দেওবন্দী আলিমগণের ইল্‌মকে শূকর, কুকুর ও গাধার সাথে তুলনা

আহমদ রেজাখান সাহেব তার ‘ফতওয়ায়ে আফ্রিকিয়্যা’-এর মধ্যে আশরাফ আলী থানভীকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন-

تجھے اتنا علم ہے جتنا سور کو ہے۔ تیرے استاد کو ایسا علم تھا جیسے کتے کو ہے۔ تیرے پیر کو اس قدر علم تھا جس قدر گدھے کو ہے۔ یا مختصر طور پر اتنا ہی ہو کہ او علم میں الو گدھے کتے سور کے ہمسر (فتاوی افریقیہ۔ صفحہ ۱۰۳)

অর্থাৎ তোমার জ্ঞান এতটুকু যতটুকু শূকরের রয়েছে। তোমার উস্তাদের এতটুকু জ্ঞান ছিল যতটুকু কুত্তার রয়েছে। তোমার পীরের এ পরিমাণ জ্ঞান ছিল যতটুকু গাধার রয়েছে। সংক্ষেপে তাদের জ্ঞান এমন যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা উঁইপোকা, গাধা, কুত্তা, শুয়োরের সমান। (ফতওয়ায়ে আফ্রিকিয়্যা, পৃষ্ঠা ১০৩)

পাঠক লক্ষ্য করুন, আহমদ রেজাখান সাহেব এখানে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, তার উস্তাদ এবং তার পীরকে জ্ঞানের ক্ষেত্রে উইপোকা, গাধা, কুত্তা ও শূকরের সমান বলেছেন। (নাউযুবিল্লাহ)

আমাদের জানামতে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী এর পীর হলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র.), যার লেখাকে রেজাখানীরা মীলাদ ও কিয়ামের পক্ষে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেন। সেই মুহাজিরে মক্কী (র.) এর জ্ঞানকে তারা আবার গাধার জ্ঞানের সাথে তুলনা করলেন! (নাউযুবিল্লাহ)

ওহাবীদের জানাযার নামায পড়া কুফরী

শর্ষিনা দরবার হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর অনুসারী। আর আব্দুল করিম সিরাজনগরীর চিন্তাধারা অনুযায়ী সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর অনুসারীরা ওহাবী। অথচ দেখা যায়, আব্দুল করিম সিরাজনগরী শর্ষিনা মাদরাসায় ফাযিল ও কামিল অধ্যয়ন করেছেন। অর্থাৎ তিনি যেখানে প্রায় চার বছর ছিলেন। এ সময় শর্ষিনার পীর ছাহেবের অনেক মুরীদীন-মুহিব্বীনের জানাযার নামায সেখানে পড়া হয়েছে। এসব নামাযে আব্দুল করিম সিরাজনগরীও শামিল থাকার কথা। যদি তিনি এতে শামিল হয়ে থাকেন তাহলে আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া অনুযায়ী তিনি কুফরীতে লিপ্ত হয়েছিলেন। আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া হলো–

وہابی کی نماز جنازہ پڑھنا کفر ہے۔ (ملفوظات احمد رضا خان بریلوی۔ ج۱، ص۷۶)

অর্থাৎ ওহাবীদের জানাযার নামায পড়া কুফরী। (মালফুযাতে আহমদ রেজা খান বেরলভী, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৭৬)

রেজাখানীরা কি আদায়কৃত নামাযের কাযা আদায় করেন?

আহমদ রেজাখান সাহেবের ফতওয়া অনুযায়ী ওহাবীদের পিছনে নামায পড়লে নামায হবে না। আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া হলো- **“তাদের (ওহাবীদের) নামায নয়। তাদের পিছনে নামায পড়লে তা আদায় হবে না।** ঘটনাক্রমে যদি ওহাবীরা জুম'আ ও ঈদের নামাযের ইমামতি করেন এবং

কোনো মুসলমানকে ইমামতির জন্য না পাওয়া যায় তবে জুমা ও ঈদের নামায ছেড়ে দেয়া ফরয।” (আহকামে শরীয়ত, আহমদ রেজা খান বেরলভী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১২৯)

এ উপমহাদেশে ইমামুত তরীকত, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সিলসিলার বুযুর্গানে কিরাম ও তাদের অনুসারীগণ সুন্নিয়াতের প্রচার-প্রতিষ্ঠা ও এর প্রতিনিধিত্ব করে আসছেন। ওহাবী মতবাদসহ সকল বাতিল মতবাদ দমনে এ সিলসিলার অনুসারীদের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। পক্ষান্তরে রেজাখানীরা স্বাধীনতা সংগ্রামী আলিম-উলামার বিরুদ্ধাচরণ, তাদের সমালোচনা ও তাদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করার মাধ্যমে ব্রিটিশদের দালালি করছে, যে ব্রিটিশরাই হলো ওহাবী মতবাদ প্রতিষ্ঠার নেপথ্য নায়ক। অথচ সুন্নী-ওহাবী ফতওয়া প্রদানের ঠিকাদার আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং ও তাদের পূর্বসূরীরা লেখা-লেখির মাধ্যমে ইমামুত তরীকত, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-কে ‘ওহাবী’ আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জৌনপুরী, ফুরফুরা, শর্ষীনা, ফুলতলী সিলসিলা সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর উত্তরসূরী। সূতরাং রেজাখানীদের দৃষ্টিতে এরা সকলেই ওহাবী। আর আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া অনুযায়ী ওহাবীদের পিছনে নামায পড়লে নামায হবে না। উল্লেখ্য, রাজধানী ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী ‘মসজিদে গাউছুল আযম’ এ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নামাযের ইমামতি করেন সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর অনুসারী আলিমগণ। বর্তমানেও উক্ত মসজিদের ইমাম, খতীব সকলেই সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সিলসিলার অনুসারী। **আমরা দেখেছি আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং রেজাখানীরা মসজিদে গাউছুল আযমে বহু নামায আদায় করেছেন। তাদের ফতওয়া অনুযায়ী সেখানে আদায়কৃত নামাযের কাযা আদায় করতে হবে। তারা কি এসব নামাযের কাযা আদায় করেন?** যদি কাযা আদায় করতেই হয় তবে তারা সেখানে নামায পড়েন কেন?

আমাদের কাছে আরো অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, আব্দুল করিম সিরাজনগরী গং রেজাখানীরা এই সিলসিলার ইমামদের পিছনে নামায আদায় করেন। স্বয়ং আব্দুল করিম সিরাজনগরীও আদায় করেছেন। আমাদের প্রশ্ন হলো, তিনি কি সেসব নামাযের কাযা আদায় করেছিলেন? এসব ভণ্ডামীর কী জবাব দিবেন আব্দুল করিম সিরাজনগরী?

রেজাখানীরা সাবধান !

আমাদের দেশে খুব কম মসজিদ রয়েছে যার ইমাম রেজাখানী মতাদর্শী। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মসজিদে দেওবন্দী ইমাম রয়েছেন। আহমদ রেজা খানের ফতওয়া অনুযায়ী তাদের পেছনে নামায পড়লে কেউ মুসলমান থাকবে না। তাই রেজাখানীরা মসজিদে নামায পড়তে হলে সাবধান হতে হবে।

আহমদ রেজাখানের ফতওয়া হলো নিম্নরূপ-

دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھنے والا مسلمان نہیں۔ (فتاوی رضویۃ۔ جلد ٦، ص ٨٢)

অর্থ্যাৎ দেওবন্দীদের পেছনে নামায আদায়কারী মুসলমান নয়। (ফতওয়ায়ে রেজভীয়্যাহ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮২)

উম্মতের প্রতি রাসূলে পাক (সা.) এর নির্দেশনা

রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ

অনুবাদঃ তোমাদের উপর সকল **নেককার ও বদকার** আমিরের সাথে জিহাদে অংশ নেয়া ওয়াজিব, আর সকল নেককার ও বদকার মুসলমানের পেছনে নামায আদায় করা ওয়াজিব, এমনকি তিনি কবীরাহ গুনাহগার হলেও। (আবূ দাঊদ)

এরই আলোকে হানাফী মাযহাবের আকীদার কিতাব ‘আকীদাতুত তাহাভী’তে বলা হয়েছে–

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ونصلي على من مات منهم ،

অর্থাৎ আমরা কিবলাহর অনুসারী সকল নেককার ও পাপী মুসলমানের পিছনে নামায পড়া এবং তাদের প্রত্যেকের জানাযার নামায আদায় করা জায়িয বলে মনে করি। (আল আকীদাদাতুত তাহাভীয়্যাহ, পৃষ্ঠা ২৩)

নিজের ফতওয়া অনুযায়ী ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত আব্দুল করিম সিরাজনগরী ভ্রান্ত ছিলেন

আব্দুল করিম সিরাজনগরীর নীতি হল, তিনি যখন যাকে ইচ্ছা তাকে সাহাবীগণের বা ওলীআল্লাহগণের মর্যাদা দিয়ে বসেন। তাদের নামের শেষে রাদিয়াল্লাহু আনহু যুক্ত করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। আবার যাকে ইচ্ছা

তাকেই ওহাবী/খারিজী বলে ফেলেন, তাতেও কোনো প্রকার দ্বিধা বোধ করেন না। উদাহরণ স্বরূপ, ‘খারেজীদের ইতিকথা’ নামে তিনি একটি পুস্তক লিখেছেন, যা ১৯৭৮ ইং সনে প্রকাশিত হয়। পুস্তিকায় তিনি আল্লামা হরমুজ উল্লাহ শায়দা (র.) এর অভিমত এনেছেন। উক্ত পুস্তিকার ৩১নং পৃষ্ঠায় সুন্নী তরীকত পন্থীদের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেন, উদাহরণ স্বরূপ ফুরফুরা শরীফ, শর্ষিণা শরীফ, কচুয়া, সুনাকান্দা, আড়াইবাড়ী, **জৌনপুর**, ঢাকার কায়েত টুলী, বাজুকা, নারায়নগঞ্জের খানকায়ে মুজাদ্দিদীয়া, **বদরপুরের ছাহেব কেবলার খানকা** ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দরবারসমূহ রহিয়াছে। (খারেজীদের ইতিকথা)

উক্ত পুস্তিকায় তিনি ইসমাঈল দেহলভী ও তার লেখনীর সমালোচনা করলেও মাওলানা আব্দুর রহীম সাহেবের জবাব দিতে গিয়ে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরেলভী (র.) সম্পর্কে লিখেছেন, “উপরন্ত (মাওলানা আব্দুর রহীম) শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) এর খলিফা সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) এর মত একজন ছুন্নী আকীদায় বিশ্বাসী পীর ছাহেবকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব নজদীর সঙ্গে সংযুক্তভাবে বয়ান করিয়া বাংলার ছুন্নী মুসলমানদের মধ্যে এক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) ছুন্নী ছিলেন এবং মৌলভী ইছমাইল দেহলভী ওহাবী ছিলেন, উহার সম্বন্ধে বিশদ ভাবে জানিতে চাহিলে আমার লিখিত “মাহবুবে খোদাকে ভাই বলিল কাহারা” নামীয় পুস্তকখানা পাঠ করুন।” (খারেজীদের ইতিকথা, পৃষ্ঠা ২৬)

কিন্তু বর্তমান সময়ে তিনি উপরোল্লেখিত সিলসিলার বুযুর্গগণকে ওহাবী আখ্যায়িত করে যাচ্ছেন। আর তার মাযহাব হল ওহাবীদেরকে ভ্রান্ত না বললে নিজেরাই ভ্রান্ত হয়ে যাবে। তার বর্তমান চিন্তাধারা অনুযায়ী ১৯৭৮ ইং পর্যন্ত তিনি কি ভ্রান্ত ছিলেন? উলামায়ে কিরাম ও বিজ্ঞ পাঠকগণই তা বিবেচনা করবেন। উল্লেখ্য যে, “খারেজীদের ইতিকথা” বইটি প্রথম প্রকাশ হয় ১৯৭৮ সালে।

শেখ সিরাজনগরী শাহ সূফী আবূ জাফর মুহাম্মদ সালেহ (র.) এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত দেশের শীর্ষস্থানীয় সুন্নী মাদ্রাসায় অধ্যয়নের পরও তাদের তরীকার উর্ধ্বতন বুযুর্গদের সমালোচনা করার কারণ অনুসন্ধানে নিম্লোক্ত কবিতা পাঠ করা উচিৎ-

ہر دو یک گل خورد زنبور و نحل
لیک زیں شد نیش وزاں دیگر عسل

হার দো এক গুল খোরদ যম্বুর ও নহল
লেকে যীঁ শুদ নেশো যাঁ দিগার আসল।

অর্থ: বোলতা ও মৌমাছি উভয়ে একই ফুলের রস আহরণ করে থাকে। কিন্তু একটিতে উৎপন্ন হয় মধু ও অন্যটিতে উৎপন্ন হয় হুল।

ھر دوگوں آھو گیا خورندو آب
زیں یکے سرگیں شدوزاں مشکناب

হারদো গোঁ আহু গিয়া খোরদন্দো ও আব
যীঁ একে সরগীঁ শোদো যাঁ মুশকেনাব।

অর্থ: উভয় প্রকারের হরিণই ঘাস খায়। একটির মধ্যে শুধু গোবর তৈরী হয়, আর অন্যটির নাভি থেকে খাটি মিশক্ তৈরী হয়।

আব্দুল করিম গং রেজাখানীদের বংশধারার অবস্থা কী হবে?

আহমদ রেজা খান সাহেব ফতওয়ায়ে রেজবিয়ার বিবাহের ক্ষেত্রে গায়র মুকাল্লিদ অথবা ওহাবীদেরকে বিবাহের উকীল অথবা সাক্ষী বানানোর ব্যাপারে একটি প্রশ্নের উত্তরে দীর্ঘ আলোচনারপর যা লিখেছেন তা নিম্নরূপ :

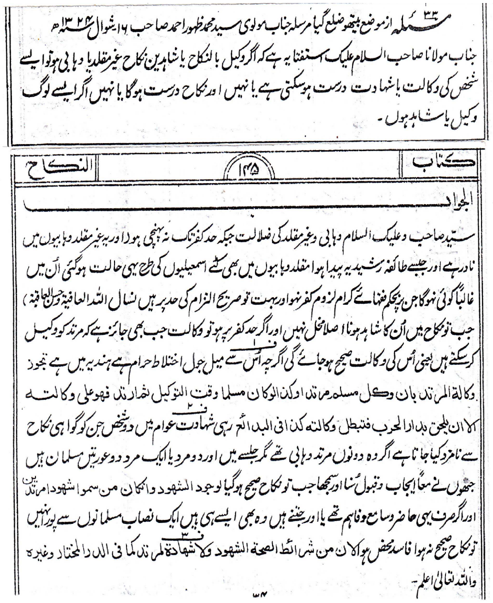

مسئلہ ۳۳ ازموضع بیتھو ضلع گیا مرسلہ جناب مولوی سید محمد ظہور احمد صاحب ۱۶ شوال ۱۳۲۴ھ
جناب مولانا صاحب السلام علیک استفتا یہ ہے کہ اگر وکیل بالنکاح یا شاہدین نکاح غیر مقلد یا وہابی ہو تو ایسے
شخص کی وکالت یا شہادت درست ہوسکتی ہے یا نہیں اور نکاح درست ہوگا یا نہیں اگر ایسے لوگ
وکیل یا شاہد ہوں۔

کتاب ۱۴۵ النکاح

الجواب
سید صاحب وعلیک السلام وہابی وغیر مقلد کی ضلالت جبکہ حد کفر تک نہ پہنچی ہو (اور یہ غیر مقلد وہابیوں میں
نادر ہے اور جیسے طائفہ رشیدیہ پیدا ہوا مقلد وہابیوں میں بھی کٹے اسمٰعیلیوں کی طرح یہی حالت ہوگئی اُن میں
غالباً کوئی نہ ہوگا جن پر بحکم فقہائے کرام لزوم کفر نہ ہو اور بہت تو صریح التزام کی حد پر ہیں نسأل اللہ العافیۃ وحسن العاقبۃ)
جب تو نکاح میں اُن کا شاہد ہونا اصلاً مخل نہیں اور اگر حد کفر پر ہو تو وکالت جب بھی جائز ہے کہ مرتد کو وکیل
کرسکتے ہیں یعنی اُس کی وکالت صحیح ہوجائے گی اگرچہ اُس سے میل جول اختلاط حرام ہے ہندیہ میں ہے تجوز
وکالۃ المرتد بان وکل مسلم مرتدا وکذا لو کان مسلما وقت التوکیل ثم ارتد فھو علی وکالتہ
الا ان یلحق بدار الحرب فتبطل وکالتہ کذا فی البدائع رہی شہادت عوام میں دو شخص جن کو گواہی نکاح
سے نامزد کیا جاتا ہے اگر وہ دونوں مرتد وہابی تھے مگر جلسے میں اور دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں مسلمان ہیں
جنھوں نے معاً ایجاب وقبول سُنا اور سمجھا جب تو نکاح صحیح ہوگیا لوجود الشھود وان کان من سموا شھودا مرتدین
اور اگر صرف یہی حاضر وسامع وفاہم تھے یا اور جتنے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں ایک نصاب مسلمانوں سے پورا نہیں
تو نکاح صحیح نہ ہوا فاسد محض ہوا لان من شرائط الصحۃ الشھود ولا شھادۃ لمرتد کما فی الدر المختار وغیرہ
واللہ تعالیٰ اعلم۔

দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি লিখেছেন :

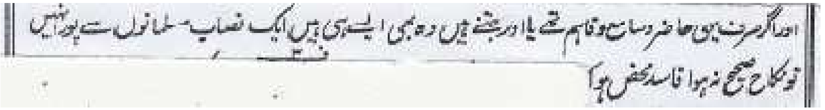

اور اگر صرف یہی حاضر وسامع وفاہم تھے یا اور جتنے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں ایک نصاب مسلمانوں سے پورا نہیں
تو نکاح صحیح نہ ہوا فاسد محض ہوا

অর্থ : আর যদি তারা (ওহাবী অথবা গায়র মুকাল্লিদ, বিবাহের মজলিসে) উপস্থিত, শ্রোতা ও উপলব্ধিকারী হন অথবা উপস্থিত সকলেই যদি এ ধরনের (ওহাবী অথবা গায়র মুকাল্লিদ) হন, আর সাক্ষীর সংখ্যা যদি মুসলমান (রেজাখানী মুসলমান) দ্বারা পরিপূর্ণ না হয় তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না বরং বিবাহ ফাসিদ হবে। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যা, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৪৫)

প্রকাশ থাকে যে, রেজাখানীদের মতবাদ সিলেটে এসেছে সত্তর দশকের পর। অথচ এতদ্‌ঞ্চলের লোকজন পূর্ব থেকেই সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর সময় সিলসিলার অনুসারী। তৎকালীন বিবাহের মজলিসে তারাই উপস্থিত ছিলেন, ইজাব-কবূলের শ্রোতা ও উপলব্ধিকারী, স্বাক্ষী তারাই ছিলেন। আর রেজাখানীদের দৃষ্টিতে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর সিলসিলার অনুসারী হিসেবে তারা ওহাবী। ফলে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, আব্দুল করিম সিরাজনগরীর পিতা-মাতাসহ তার এলাকা শ্রীমঙ্গলের প্রায় সকল বিবাহ বাতিল হয়ে যায়। তাদের বংশধারা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। কেননা রেজাখানীদের মতবাদ কিংবা সে ধারার মানুষ তখন সিলেটে ছিলেন না। এখনও তাদের সংখ্যা হাতেগোণা।

যে চট্টগ্রামে রেজাখানীদের সংখ্যা বেশি মনে করা হয় সেখানেও আহমদ রেজা খান সাহেবের সিলসিলা এসেছে ১৯৫০ ইং সনের পরে। সে সময়ে বা এর আগে চট্টগ্রামের বেশির ভাগ মানুষ সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর খলীফা সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরীর সিলসিলার অনুসারী ছিলেন। সেখানকার বিবাহের মজলিসে তারাই উপস্থিত ছিলেন, ইজাব-কবূলের শ্রোতা ও উপলব্ধিকারী, স্বাক্ষী তারাই ছিলেন। ফলে আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া মতে চট্টগ্রামের সে সময়কার সকল বিবাহও বাতিল হয়ে যায়।

বাহাছ করতে গিয়ে হারাম ও কুফরীতে লিপ্ত হলেন সিরাজনগরী

আহমদ রেজা খান সাহেব তার এক ফতওয়ায় লিখেছেন :

دیوبندی وہابیوں کی اخبث شاخ ہے اوس کو وعظ سننا حرام اوس سے فتوی لینا حرام اوس سے میل
جول سخت حرام اوسے مسلمان جان کرتو کفر۔ (فتوی رضویۃ۔ جلد ۹، صفحہ ۲۶۹)

অর্থ : দেওবন্দী ওহাবীদের একটি নিকৃষ্ট শাখা। তাদের ওয়ায শুনা হারাম, তাদের থেকে ফতওয়া গ্রহণ হারাম, তাদের সাথে মেলামেশা করা চূড়ান্তভাবে হারাম আর তাদের মুসলমান মনে করা কুফরী। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ২৬৯)

উপরোক্ত ফতওয়া থেকে প্রমাণিত হয় যে, দেওবন্দী ওহাবীদের বক্তব্য শুনা ও তাদের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত বা মন্তব্য নেয়া কিংবা তাদের কাছে ফতওয়া জিজ্ঞাসা করা রেজাখানী সুন্নীদের জন্য হারাম। আবার অন্য ফতওয়া থেকে প্রমাণ হয় যে, ওহাবীদের সাথে কথা বলাও হারাম। অথচ 'ইজহারে হক্ব' বইয়ে আব্দুল করিম সিরাজনগরী 'কর্মধার বাহাছ' নামে শিরোনামে যে নাটক উপস্থাপন করেছেন তাতে দেখা যায় তিনি প্রতিপক্ষ দেওবন্দীদের কাছে ১৪টি বিষয়ের জবাব তথা ফতওয়া চেয়েছেন। তাদের প্রদত্ত জবাব আবার উক্ত বইয়েও তুলে ধরেছেন। (পাঠকগণ 'ইজহারে হক্ব' এর ২১৭ পৃষ্ঠা দেখতে পারেন) সুতরাং পূর্বোক্ত আহমদ রেজা খান সাহেবের ফতওয়া অনুযায়ী আব্দুল করিম সিরাজনগরী উক্ত বাহাছের মধ্যে কমপক্ষে ১৪ টি হারাম কাজ করেছেন এমনকি হারাম কাজকে জায়িয মনে করে কুফফরীতে লিপ্ত হয়েছেন।

রেজাখানীদের বাড়াবাড়ি

রেজাখানীরা ওলীআল্লাহগণ সম্পর্কে এমন কথাবার্তা বলে যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদার পরীপন্থী। কিছু কিছু বিষয় আছে যা শর্ত সাপেক্ষে জায়িয; কিন্তু তারা এগুলোকে নিঃশর্ত জায়িয বলে থাকে। যেমন-

১. বুযুর্গগণের কবর তওয়াফ করা জায়িয। তাদের পূজা করা জায়িয। এটা আসলে আল্লাহর পূজা। (শরহুল ইস্তেমদাদ, মোস্তফা রেজা খান, পৃষ্ঠা ৩৭-৩৮)।
২. আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার থেকে সাহায্য চাওয়া অস্বীকারকারীগণ মুলহিদ ও ধর্মহীন। (আল-আমনু ওয়াল উলা, আহমদ রেজা খান, পৃষ্ঠা ৪১)
৩. ওলীআল্লাহগণ সংকটকালে উপস্থিত হয়ে সাহায্য করেন। (হাশিয়াতুল ইস্তেমদাদ, আহমদ রেজা খান, পৃষ্ঠা ৬-৭)
৪. ওলীআল্লাহগণের একটি স্তর হল তারা হচ্ছেন আসহাবে তাকভীন (অর্থাৎ তারা কোনো কিছুকে 'হও' বললেই তা হয়ে যায়। (শরহুল ইস্তেমদাদ, মোস্তফা রেজা খান)।

বর্তমানে বিভিন্ন ওলী আল্লাহর মাযারে যেসকল অপসংস্কৃতি দেখা যায়, এজন্য রেজাখানীদের ঐ সকল ভ্রান্ত ফতওয়াই দায়ী। সুতরাং এ ধরনের ফতওয়া থেকে সাবধান।

মনগড়া ফযীলত বর্ণনা

রেজাখানীরা অনেক সময় তাদের পছন্দের মানুষদের ক্ষেত্রে মনগড়া ফযীলত বর্ণনা করে থাকেন। আ'লা হযরত সম্পর্কে লিখিত 'জীবন ও কারামত' পুস্তকের ৭৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে- ''আলা হযরত শয়নের সময় মুহাম্মদ নামের নকশা বানায়ে ঘুমাতেন। উহার ফায়দা- আলা হযরত যেভাবে শয়ন করতেন ঐভাবে শয়ন করলে ৭০ হাজার ফেরেশতা ঐ নাম মুবারকের চার পাশে দুরুদ শরীফ পাঠ করেন এবং ঐ নকশায় শয়নকারীর আমলনামায় ৭০ হাজার ফেরেশতার দুরুদ শরীফের সাওয়াব লিখে দেয়া হয়।'' (জীবন ও কারামত)

প্রথমদিকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, উক্ত জীবন ও কারামত বইয়ের পূর্ণ নাম হচ্ছে 'আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা খান ফয়েলে বেরলভী (র.) এর জীবন ও কারামত'। এর লেখক শামশুল আলম নঈমী। বইটিতে অভিমত পেশ করেছেন কানযুল ঈমানের বঙ্গানুবাদক আব্দুল মান্নান, সায়্যিদ মসিহুদ দৌলা, ওবায়দুন্নাছের নঈমীসহ কতিপয় বিশিষ্ট রেজাখানী আলিম।

প্রকাশ তাকে যে, শয়ন করার সুন্নাত তরীকা হাদীসের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে। অথচ তা বাদ দিয়ে নিজস্ব মনগড়া পদ্ধতি আবিষ্কার করা সুন্নত তরীকাকে নির্বাসিত করারই নামান্তর। আশ্চর্যের বিষয়, রেজাখানীরা ঐ মনগড়া পদ্ধতির ফযীলতও বানিয়ে নিয়েছে। মিথ্যাচার আর কাকে বলে?

সুন্নত তরীকা বর্জন

রেজাখানীরা যেমন শয়নের ক্ষেত্রে সুন্নত তরীকার খেলাফ আমলের ফযীলত বর্ণনা করে তেমনি অন্যান্য ক্ষেত্রেও সুন্নত তরীকা বর্জন করে। রেজাখানী ওয়াইযদের দেখা যায় যে, তারা বক্তব্যের শুরুতে হামদ ও নাতের পরিবর্তে

الصلوة السلام عليك يا رسول الله - الصلوة السلام عليك يا حبيب الله

ইত্যাদি পড়ার মাধ্যমে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মহব্বত প্রকাশ করে থাকে। অথচ তাদেরই হাকীমুল উম্মত আহমদ ইয়ার খান নঈমী মিরআতুল মানাজীহ কিতাবের ৪র্থ খণ্ড ৩০৭ পৃষ্ঠায় বক্তব্য শুরু করার সুন্নত তরীকা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন- ওয়াযের শুরুতে হামদে এলাহী তথা

আল্লাহর প্রশংসা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সুন্নত। আর হামদ ও নাত উভয়টি পড়া সাহাবায়ে কিরামের সুন্নত। উভয়ই পড়া উচিত। (মিরআত, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৭)

হাশরের মাঠে আহমদ রেজাখান সাহেবের গজল পাঠ

আহমদ রেজা খানের বুযুর্গী বর্ণনা করতে গিয়ে শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীর গুরু অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল যা লিখেছেন তা থেকে বুঝা যায় যে হাশরের মাঠে নাকি একটি গযল অনুষ্ঠান হবে। সেখানে আহমদ রেজা খান সাহেব গযল পাঠ করবেন। রেজাখানীরা এ অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছে ‘সালামী অনুষ্ঠান’। এমনকি আহমদ রেজা খান তার ‘হাদায়েকে বখশিশ’ কাব্যগ্রন্থে এ অনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন। উক্ত অনুষ্ঠান কেমন হবে সে বিষয়ে “হায়াত মউত কবর হাশর” বইয়ে অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল লিখেছেন- “ইমামে আহলে সুন্নাত আ’লা হযরত ইমাম আহমদ রেজা (র.) তাঁর হাদায়েকে বখশীশ কাব্যগ্রন্থে ফিরিশতাদের এই সালামী অনুষ্ঠানটি এভাবে বর্ণনা করেছেন-

مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا
مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام

মিলাদ-কিয়ামের খিদমতে নিয়োজিত ফিরিশতারা হাশরের দিনে আমাকে ডেকে বলবে- হে ইমাম রেজা! তুমি তোমার সেই বিখ্যাত না’তিয়া কালাম পড়ে শুনাও- যার প্রথম লাইন হল- ‘মস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম’। (হায়াত মউত কবর হাশর, পৃষ্ঠা ২২৭)

হাদীস শরীফের বর্ণনা মতো কিয়ামতের দিন সকল মানুষ ‘ইয়া নাফসী’, ‘ইয়া নাফসী’ করবে, এমতাবস্থায় আহমদ রেজা খান সাহেব সেখানে গযল পাঠের কথা ও গযল গাওয়ার নিশ্চয়তা কুরআন হাদীসের কোথায় পেলেন ?

আহমদ রেজা খান সাহেবের প্রশংসার ব্যাপারে সীমালঙ্গন

অন্যান্য বুযূর্গানের বাস্তব বিষয়ের প্রশংসা না করে বরং সমালোচনা করলেও রেজাখানীরা আহমদ রেজা খানের প্রশংসা করতে গিয়ে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের গুণাবলীতে ভূষিত করে। উদাহরণ স্বরূপ রেজাখানীদের বিশিষ্ট কবি নূর মোহাম্মদ আজমী ও ইসমাঈল রেজভী এর কয়েকটি কবিতা নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

নুর মোহাম্মদ আজমী এর কয়েকটি পংক্তি

غوث وقطب الاولیاء احمد رضا   ہے مرا مشکل کشا احمد رضا
دونوں عالم میں ہے ترا آسرا   ہاں مدد فرما احمد رضا
تو ہے داتا اور میں مانگتا ترا   میں ترا ہوں تو مرا احمد رضا
(نغمۃ الروح، اشعار نور محمد عظمی صفحہ ۱۰ و ۱۲)

অনুবাদঃ হে ওলীগণের সম্রাট আহমদ রেজা! হে মশুকিল আছানকারী আহমদ রেজা! **দু’জাহানে তোমার রাজত্ব রয়েছে।** সাহায্য কর হে আহমদ রেজা! তুমি দাতা আর আমি তোমার কাছে প্রার্থী। আমি তোমার তুমি আমার, হে আহমদ রেজা! (নুগমাতুর রূহ)

ইসমাঈল রেজভীর কবিতা

میری کشتی پڑ گئی منجدھار میں   دے سہارا اک ذرا احمد رضا
چار جانب مشکلیں ہیں ایک میں   اے مرے مشکل کشا احمد رضا
لاج رکھ لے میرے پھیلے ہاتھ کی   اے میرے حاجت روا احمد رضا
جھولیاں بھر دے میرے داتا میری   ہوں ترے در کا گدا احمد رضا
جب زبانیں سوکھ جائیں بیاں سے   جام کوثر کا پلا احمد رضا
(نغمۃ الروح، اشعار اسماعیل رضوی صفحہ ۶، ۷ (مطبوعہ بریلی)

অনুবাদঃ আমার নৌকা সাগর তীরে আটকে গেছে। হে আহমদ রেজা! সামান্যতম সাহায্য কর। চারদিকে সংকট। হে আমার সংকট নিরসনকারী আহমদ রেজা! আমার সম্প্রসারিত হাতের লজ্জিত হওয়াকে কবূল করো, হে আমার প্রয়োজন পূরণকারী আহমদ রেজা! আমার ঝুলি পূর্ণ করে দাও হে আমার দাতা! আমি তোমারই সাহায্য প্রার্থী হে আহমদ রেজা! **যখন কথা বলতে আমার জিহ্বা শুকিয়ে যাবে, তখন কাওসারের শরবত পান করাবেন হে আহমদ রেজা!** (নুগমাতুর রূহ)

উপরোক্ত পংক্তিগুলোর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, **দু'জাহানে আহমদ রেজা খান সাহেবের রাজত্ব রয়েছে** এবং **তিনি কায়সারের শরবত পান করাবেন**। এগুলো কি অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি নয়? হাওযে কাওসার থেকে পান করানোর একমাত্র অধিকারী হলেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। এটা তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অথচ উক্ত কবিতা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আহমদ রেজা খান সাহেবও ঐ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাহলে এখানে কি তাকে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে তুলনা দেয়া হলো না ?

আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের মিথ্যাচার ও বেয়াদবি

আব্দুল করিম সিরাজনগরী গংদের বক্তব্য ও লেখনী মিথ্যাচার ও বেয়াদবিতে পরিপূর্ণ। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে তুলে ধরা হলো।

সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)-কে নিয়ে অপপ্রচার

রেজাখানীদের অন্যতম জঘন্য অপপ্রচার হচ্ছে গাজীয়ে বালাকোট সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর খলীফা নন। তারা তাদের স্বভাবসুলভ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে জোরেশোরে এ প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ হলো, বাংলাদেশের প্রায় সকল সিলসিলা তথা প্রায় শতকরা নব্বই ভাগ সিলসিলা দু'জন মহান ব্যক্তির মাধ্যমে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাদের একজন হলেন হযরত কারামত আলী জৌনপুরী (র.) আর অপরজন হলেন গাজীয়ে বালাকোট সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী। এমতাবস্থায় রেজাখানীরা মহাবিপদে পড়েছে। নিজেদের মনগড়া ফতওয়ার ফলে তারা চলাফেরা ও উঠা-বসায় কারো সাথে যেতে পারছে না। বাংলাদেশে যেখানেই রুটি-রুজির ধান্ধায় তারা বিচরণ করে সেখানেই সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর তরীকার মানুষই সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে নিজেদের রুটি-রুজির ক্ষেত্র প্রশস্থ করতে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তারা বলতে শুরু করল নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর খলীফা নন।

এখন আমরা একটু পর্যালোচনা করে দেখি সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী কার মুরীদ বা খলীফা ছিলেন? এ বিষয়ে প্রথম কথা হলো, ফুরফুরা, শর্ষিনা, হালিশহর, সোনাকান্দাসহ বাংলাদেশে বা এ উপমহাদেশে যারা সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর উত্তরসূরী রয়েছেন তাদের সিলসিলার শজরা এর

মধ্যে গাজীয়ে বালাকোট নিজামপুরী (র.) এর মুরশিদ হিসেবে তারা কার নাম উল্লেখ করেছেন? এটা সুস্পষ্ট যে, সব সিলসিলার শজরায় প্রত্যেকেই নিজামপুরী (র.) এর মুরশিদ হিসেবে হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর নাম উল্লেখ করেছেন এবং এ বিষয়টি প্রতিষ্ঠিত সত্য। প্রশ্ন হলো, যারা তার উত্তরসুরী তারা নিজেদের তরীকা সম্পর্কে বেশি জানেন, না রেজাখানীরা বেশি জানেন? আরবীতে প্রবাদ আছে, صاحب البيت أدري بما فيه 'ঘরের মধ্যে কী আছে গৃহবাসীই বেশি জানেন'। সুতরাং নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর মুরশিদ কে তা তার সিলসিলার অনুসারীগণ থেকে জেনে নিন। পাঠকগণ এ বিষয়টি নিশ্চিত হতে প্রয়োজনে ফুরফুরা, শর্ষীনা, হালিশহর, সোনাকান্দা, ফরাজিকান্দি ইত্যাদি মশহুর হক দরবারগুলোর সিলসিলা দেখে নিতে পারেন।

দ্বিতীয়ত: ইতিহাসের যেখানেই হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর নাম এসেছে সেখানেই তার নামের সাথে **"গাজীয়ে বালাকোট"** বাক্যটি যুক্ত রয়েছে। এ থেকে কী প্রমাণিত হয়। এ ব্যাপারে রেজাখানীরা কী বলবে?

তৃতীয়ত : চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে হযরত নিজামপুরী (র.) এর মাযারে প্রবেশ পথের গেইটে তার নামের সাথে এখনও লিখা আছে **'গাজীয়ে বালাকোট সুফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.)'**।

রেজাখানীদের দাবি, হযরত সূফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর খলীফা নন; আজিমপুর দায়রা শরীফের শাহ সূফী সায়্যিদ লাক্বীতুল্লাহ (র.) এর খলীফা। অথচ আজিমপুর দায়রা শরীফের মোতাওয়াল্লী ও সাজ্জাদনশীন শাহ সূফী সায়্যিদ আহ্মাদুল্লাহ সাহেব এর লেখা **দায়রা শরীফের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ 'আজিমপুর দায়রা শরীফ' এর মধ্যে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সাথে জিহাদ ও তরীকতের দিক থেকে সূফী নূর মুহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর সম্পর্ক ও খেলাফত লাভের বিবরণ** রয়েছে। **শুধু তাই নয়, ১২৪৬ হিজরী মোতাবিক ১৮৩১ সালে বালাকোট যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে তার পায়ে গুলিবিদ্ধ হবার বর্ণনাও এতে রয়েছে।** (দেখুন আজিমপুর দায়রা শরীফ, পৃষ্ঠা ১৪৭) বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, দিবালোকের মত সুস্পষ্ট বিষয়ে এত জলজ্যান্ত মিথ্যা প্রচারণা চালাতে রেজাখানীরা একটুও দ্বিধাবোধ করল না। নিজেদের স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে সত্য গোপন ও মিথ্যা অপপ্রচার চালানোর ক্ষেত্রে তাদের জুড়ি মেলা ভার!

মা থেকে মাসীর দরদ বেশী

বিভিন্ন লেখালেখির মাধ্যমে রেজাখানীরা প্রমাণ করতে চান যে, শর্ষিনা সিলসিলার অনুসারীগণ তরীকতের দিক থেকে হযরত সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর অনুসারী নন, অথচ অতীতে বা বর্তমানে শর্ষিনার পীর ছাহেব (র.) এর অনুসারীগণ এমন কোনো দাবি করেছেন বলে কোনো প্রমান তিনি উপস্থাপন করতে পারেননি বা পারবেনও না। বরং শর্ষিনা দরবার শরীফ হতে প্রকাশিত ‘চারি তরীকার শজরা’ নামক পুস্তিকায় চিশতিয়া, কাদিরিয়া, নকশ্‌বন্দিয়া ও মুজাদ্দিদিয়া তরীকার উর্ধ্বতন বুযুর্গদের মধ্যে সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)ও রয়েছেন। দেখুন উইলিয়াম হান্টারের পথ ধরে কিভাবে সিরাজনগরীরা ইতিহাস বিকৃত করে যাচ্ছেন।

হযরত সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) সম্পর্কে চারি তরীকার শজরা কিতাবে লেখা হয়েছে– **‘‘হযরত মাওলানা শাহ সাইয়েদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.)-** পাঞ্জাবের রাজা রনজিৎ সিংহ মুসলমান ধর্মে হস্তক্ষেপে করতঃ অত্যাচার করায় ১২৪১ হিজরী ৭ই জমাদিউচ্ছানী তাহার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষনা করেন। ১২৪৬ হিজরীর ২৪ শে জিলকদ বালাকোট শহরের নিকটবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন।

হজরত কুতবুল আকতাব মাওলানা শাহ সুফী নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.)- চট্টগ্রামের নিজামপুরবাসী। স্বীয় পীর হযরত সৈয়দ আহমদ বেরলভী (র.) এর সহিত রণজিৎ সিংহের বিরুদ্ধে জেহাদে যোগদান করেন। প্রকাশ থাকে যে, হযরত মাওলানা শাহ কারামত আলী জৌনপুরী ছাহেব (র.) উক্ত সাইয়েদ সাহেবের মুরীদ ও খলীফা ছিলেন। তিনি বাংলায় আসিয়া ইসলাম প্রচার করেন। জনাব সূফী সাহেবের মাজার চট্টগ্রামের মিরেসরাই থানার মলিয়াইস গ্রামে। (চারি তরীকার শজরা, পৃষ্ঠাঃ ৪৪, প্রকাশকঃ শাহ আবূ নছর নেছার উদ্দিন আহমদ (হুসাইন), শাহ আবূ বকর মোঃ ছালেহ নেছারুল্লাহ)।

উল্লেখ্য যে, **নূর মোহাম্মদ নিজামপুরী (র.) এর ওফাত ১৮৫৮ সনে আর আহমদ রেজাখানের জন্ম ১৮৫৬ সনে। এতে প্রমাণিত হয় আহমদ রেজা খানের জন্মের পূর্ব থেকেই চট্টগ্রাম অঞ্চলে সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.) এর তরীকতের খিদমত চালু ছিল।**

উস্তাদগণের সাথে শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীর বেয়াদবি

শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে অনেক সময় ভিন্ন মতাবলম্বী কারও কাছে থেকেও শিক্ষা অর্জন করা যায়। তবে সর্বক্ষেত্রে শিক্ষকের সাথে আদব রক্ষা করা হল ইমাম

আয়িম্মাগণের তরীকা। উদাহরণ স্বরূপ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) ইমাম শাফিঈ (র.) এর ছাত্র ছিলেন। অথচ দু’জন দু’টি আলাদা মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। ইমাম আহমদ (র.) ইমাম শাফিঈ (র.) এর প্রতি কতটুকু সম্মান প্রদর্শন করতেন, তা হাফিয ইমাদ উদ্দীন ইবনে কাসীর (র.) এর লিখিত “আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া” কিতাবের নিম্নোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়।

“ইমাম শাফিঈ (র.) বাহনের উপর আরোহন করলে আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) তার পিছনে পিছনে পায়ে হেঁটে চলতেন এবং কোনো প্রশ্ন থাকলে তা করতেন। তিনি নিজেই বর্ণনা করেন, আমি ৩০ বছর পর্যন্ত এমন কোনো নামায পড়িনি, যার পর আমি ইমাম শাফিঈ (র.) এর জন্য দু‘আ করিনি। (বিদায়া-নিহায়া, খণ্ড : ১০, পৃষ্ঠা, ৩২৬)। এটা হাচ্ছে ইমাম আয়িম্মাগণের তরীকা।

প্রকাশ থাকে যে, বিভিন্ন বইয়ে শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীর জীবনী সম্পর্কে লেখা হয়েছে, তিনি ১৯৬৬ ও ৬৮ সনে যথাক্রমে ফাজিল ও কামিল শর্ষিনা আলিয়া মাদ্রাসা হতে পাশ করেন। তখন শর্ষিনা মাদরাসায় দেওবন্দী অনেক বুযুর্গ শিক্ষা দানরত ছিলেন। তন্মধ্যে মাওলানা নিয়াজ মাহমুদ খাত্তানী (র.) ও মাওলানা আব্দুছ ছাত্তার বিহারী (র.) উল্লেখযোগ্য। এমনকি কুতবুল আলম মুজাদ্দিদে যামান আল্লামা হযরত শাহ সূফী আবূ জাফর মোহাম্মদ ছালেহ (র.)ও এ সময় ছিলেন। তিনি সাহরানপুরে শায়খুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া সাহেব (তাবলীগী নেসাবের প্রণেতা), মাওলানা শাহ আব্দুর রহমান কামিলপুরী, মাওলানা আছাদুল্লাহ, মাওলানা ছিদ্দিক সাহেব, মাওলানা মঞ্জুর প্রমূখের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। এ হিসেবে আব্দুল করিম সিরাজনগরী দেওবন্দী উলামায়ে কিরামের শাগরিদ ও নাতি-শাগরিদ। অথচ তার লেখা-লেখনীর মাধ্যমে দেওবন্দী বুযুর্গানকে এত নোংরা ভাষায় উপস্থাপন করেছেন যে, এ ধরনের বেয়াদবি অত্যন্ত বিরল।

উল্লেখ্য যে তার তরীকার ইমাম আহমদ রেজা সাহেবের ফতওয়া হল- দেওবন্দী আলিমগণের লিখিত কিতাবে পেশাব করার উপযুক্ত। (নাউযুবিল্লাহ) এটি ‘রেজাখানীদের ফতওয়ার নমুনা’ শীর্ষক অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সিরাজনগরীও এ ফতওয়াকে নিশ্চয়ই সমর্থন করেন। এখন প্রশ্ন হল- তিনি তো শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসায় ফাযিল ও কামিল শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেছেন। শর্ষিনা আলিয়া মাদরাসায় বুখারী শরীফ হাশিয়াসহ গুরুত্বের সাথে পড়ানো হয়। আর বুখারী শরীফের হাশিয়া লিখেছেন ‘আহমদ আলী সাহরানপুরী দেওবন্দী (র.)’। তার ইমামের ফতওয়া অনুযায়ী যেহেতু দেওবন্দী আলিমগণের লিখিত কিতাবে

পেশাব করার উপযুক্ত (নাউযুবিল্লাহ) সেহেতু কিভাবে তিনি এমন একটি কিতাব থেকে শিক্ষা অর্জন করলেন?

রেজাখানীরা এক দিকে মু'তাযিলা মতাদর্শী আল্লামা যামাখশরীর লিখিত আল-কাশশাফ কিতাবখানা তাদের মাদরাসাসমূহে পড়ছেন ও পড়াচ্ছেন, তাছাড়া ইমরাউল কায়েস, যার সম্পর্কে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন- ''সে হচ্ছে দোযখীদের পতাকাবাহী'' তার মুআল্লাকাহ পড়াচ্ছেন, অপরদিকে দেওবন্দীদের কিতাবসমূহে কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতি থাকা সত্ত্বেও তাতে পেশাব করা জায়িয মনে করছেন। (নাউযুবিল্লাহ) কেমন তাদের কাণ্ডজ্ঞান!

আশা করি এ আলোচনা থেকে তাদের প্রকৃতরূপ পাঠকের কাছে প্রকাশিত হবে।

হক সিলসিলা নিয়ে বিভ্রান্তি

আব্দুল করিম গং রেজাখানিরা তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া অস্বীকার করতে গিয়ে প্রায়ই ওয়াজ-মাহফিলে বলে থাকেন হক সিলসিলা ৪টি। অথচ ইসলামী বিশ্বকোষে ১০০টি সিলসিলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাস্যকর ব্যাপার হল আহমদ রেজা খান সাহেবের জীবনী গ্রন্থ "জীবন ও কারামত" বইয়ের ৫৭ পৃষ্ঠায় আহমদ রেজা খান সাহেবের ১৭টি সিলসিলায় তরীকতের ইজাযত ও খেলাফত লাভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর তরীকার নাম 'তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া' হবার কারণে রেজাখানীরা এটাকে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের মতবাদের অনুসারী বলে অপপ্রচার চালায়। অথচ ওহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের মতবাদের নাম 'মুহাম্মদিয়া' নয় বরং ওহাবী। মূলত: ইবনে আব্দুল ওহাবের এ ঘৃণ্য মতবাদকে উলামায়ে কিরাম প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং তার ঘৃণ্য মতবাদের নাম যাতে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয় সেজন্য এর নাম দিয়েছেন 'ওহাবী মতবাদ'। তার পিতার নামেই তার মতবাদের নাম দেয়া হয়েছে। প্রকাশ থাকে যে, তার পিতা একজন সুন্নী আলিম ছিলেন কিন্তু 'মুহাম্মদ' নাম যাতে কলঙ্কিত না হয় সেজন্য উলামায়ে কিরাম এ মতবাদের নাম সুন্নী পিতার নামেই রেখেছেন। সুতরাং তরীকায়ে মুহাম্মদিয়া নিয়ে অযথা বিভ্রান্তি ছড়ানো থেকে বিরত থাকা উচিত।

আর 'মুহাম্মদিয়া হলেই যদি মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের প্রবর্তিত তরীকা হয়ে যায় তা হলে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নামের সাথে 'আহমদিয়া' থাকলে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতবাদী বলে ধরে নেয়া যেতে পারে। এ হিসেবে চট্টগ্রামের 'জামেয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া' কি কাদিয়ানী মতবাদের প্রতিষ্ঠান? ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাবের মতবাদ 'মুহাম্মদিয়া' নয়। কিন্তু গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতবাদ 'আহমদিয়া' মতবাদ। কাদিয়ানীর অনুসারীরা তাদের নাম দিয়েছে 'আহমদিয়া মুসলিম জামাত'। সুতরাং সাধু সাবধান!

স্বীয় পিতা-মাতার ব্যাপারে সিরাজনগরীর বক্তব্য কী?

শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীর পিতা-মাতা উভয়ের মুরশিদ ছিলেন হযরত মাওলানা মাহবুবুর রহমান (র.), যিনি 'ফেনীর ছাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। হযরত আবূ ইউসুফ শাহ মোহাম্মদ ইয়াকুব বদরপুরী (র.) এর একজন একনিষ্ঠ মুরিদ ও খলীফা ছিলেন তিনি। তার নিকট সিরাজনগরীর মাতা-পিতার মুরীদ হওয়ার বিষয়টি শ্রীমঙ্গল এলাকার সকলেই জানেন। শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীর পিতা-মাতা যেখানে জৌনপুরী সিলসিলা তথা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) এর সিলসিলার একজন বুযুর্গের মুরীদ ছিলেন সেখানে আপন পিতা-মাতা ও তাদের মুরশিদের বিষয়ে সিরাজনগরীর ফতওয়া কি? তারাও কি ওহাবী ছিলেন? আর তিনি কি ওহাবীগণের পিতা-মাতার ঘরের সুন্নী সন্তান? পিতা-মাতা ও তাদের মুরশিদের ব্যাপারে সিরাজনগরীর বক্তব্য কী তা দেশবাসী আজ জানতে চায়।

রাবিয়া বসরী (র.) এর সাথে বেয়াদবি

রেজাখানী ফিতনার সিপাহসালার শেখ আব্দুল করিম সিরাজনগরীর গুরু অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল তার লিখিত "হায়াত মউত কবর হাশর" বই এ হযরত রাবিয়া বসরী (র.) এর সাথে বেয়াদবি করেছেন। যা তার নিম্নবর্ণিত আলোচনা থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। তিনি লিখেছেন- "হযরত বড়পীর আব্দুল কাদির জিলানী (রা.) চেয়েছিলেন আল্লাহর দীদার। রাবেয়া বসরী (র.) চেয়েছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টি। কেননা, আল্লাহর দীদার ও নবীজীর সান্নিধ্যের চেয়ে বড় নিয়ামত আর কিছু হতে পারে না। তাই কেহ চায় মাল- আর কেহ চায় মালিক। এ দুয়ের মধ্যে আসমান যমীন ব্যবধান। এখানেই শরীয়ত ও মারিফাতের শেষ গন্তব্য। শরীয়তের শেষ গন্তব্য হলো জান্নাত, আর মারিফাতের শেষ গন্তব্য হলো জান্নাতের মালিক।" (হায়াত মউত কবর হাশর, পৃষ্ঠা ৪১৩)

হযরত রাবিয়া বসরী (র.) ছিলেন একজন উচ্চস্তরের তাবিঈ। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) মারিফত সংক্রান্ত অনেক বিষয়ের সমাধান ও জ্ঞান অর্জনের জন্য তার শরণাপন্ন হতেন।

বড়পীর দস্তগীর (র.) এর পাশাপাশি হযরত রাবিয়া বসরী (র.) এর আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল সাহেব যে বেয়াদবি করেছেন তার সারসংক্ষেপ হল-

১। রাবিয়া বসরীর (র.) নামের শেষে তিনি **রহমাতুল্লাহি আলাইহি** আর বড়পীর দস্তগীর (র.) নামের শেষে **রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু** ব্যবহার করেছেন। অথচ রাবিয়া বসরী (র.) হলেন তাবিঈ।

২। আব্দুল কাদির জিলানী (র.) আর রাবিয়া বসরী (র.) এর চাওয়ার মধ্যে আসমান-জমিন পার্থক্য ছিল।

৩। রাবিয়া বসরী (র.) **মারিফাতের শেষ গন্তব্যে পৌঁছতে পারেননি**।

উল্লেখ্য যে, অধ্যক্ষ আব্দুল জলিল আল্লাহর দিদার লাভকেই বড়পীর দস্তগীর (র.) এর বৈশিষ্ট্য মনে করে বড়পীর (র.)-কে হেয় করেছেন। কারণ আল্লাহর দীদার লাভ বড়পীর (র.) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য নয়। পরকালে সকল মু'মিনই আল্লাহর দিদার লাভ করবেন। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন : **إنكم سترون ربكم عيانا** অর্থাৎ অচিরেই তোমরা তোমাদের রবকে সরাসরি দেখবে। (বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৫)

যারা রাবিয়া বসরী (র.) এর মত ওলীআল্লাহর সাথে বেয়াদবি করে, তাদের কাছ থেকে জৌনপুরী, ফুরফুরা, শর্ষিনার পীর-মাশায়েখগণ সম্পর্কে ভদ্রজেনোচিত বক্তব্য আশা করা বাতুলতা মাত্র।

আহমদ রেজাখান সম্পর্কে রেজাখানীদের জঘন্য উক্তি

প্রকাশ থাকে যে, অন্যান্য উচ্চস্তরের ওলী-আল্লাহ ও তাদের সম্পর্কিত বক্তব্য সমূহের অপব্যাখ্যা দেয়ার ব্যাপারে রেজাখানীরা অত্যন্ত পারদর্শী অথচ তাদের ইমাম আহমদ রেজাখান বেরলভী সম্পর্কে এমন অনেক কথা-বার্তা বর্ণিত আছে যা মুখে উচ্চারণ করাও জঘন্য অপরাধ। মাসিক আল-বাইয়্যিনাত (জুন ২০০০ ইংরেজী) এর মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে–

"তাদের লিখিত কিতাব যেমন- হাদায়েক বখশিশ, নুগমাতুর রূহ, মালফুজাতে

আলা হযরত, হাফতে আকতাব, আল জুন্নাতু লি আহলিসসুন্নাহ, হায়াতে আহমদ রেজাখান, ফতওয়ায়ে রিজভীয়্যাহ ইত্যাদি কিতাবসমূহ পড়ে তাদের যে ঈমান আকিদার চিত্র পরিস্কার ভাবে ধরা পড়ে তা হচ্ছে- "রেজাখানের তাযীম কারা হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তাযীম করার মত। (নাউযুবিল্লাহ) তার পীর ভাইয়ের কবরের খুশবু হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খুশবুর সমান। (নাউযুবিল্লাহ) হাশরের ময়দানে রেজাখান আল্লাহ পাকের আরশের একমাত্র ছায়া এবং হাউজের কাওসারের অধিকারী। কবরে মুনকির-নাকির এসে যখন জিজ্ঞাসা করবে তুমি কার হও? তখন আদবের সাথে মাথা নত করে আহমদ রেজাখানের নাম নিবে। আল্লাহ পাককে হাযির নাযির মনে করা বেদ্বীনি, বদদ্বীনি। সকল জায়গায় তার উপস্থিতি বেদ্বীনি... নুগমাতুর রূহ কিতাবে তার এক শাগরিদ বলেছেন যে, 'তোমার আমার সকলের খোদা আহমদ রেজাখান।' (নাউযুবিল্লাহ) হযরত জিব্রাঈল (আ.) সমস্ত ফেরেশতাদের পীর, খোদা নবীর মনসা। হুযূর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পর যদি কেউ নবী হতো তবে কাজী মুহাম্মদ আকীল নবী হতো (নাউযুবিল্লাহ)।" (দেখুন, মাসিক আল বায়্যিনাত সফর-রবিউল আউয়াল ১৪২১ হিজরী, জুন ২০০০ ইংরেজী, বিশেষ সংখ্যা-৮২তম, পৃষ্ঠা ১০৮)।

রেজাখানীরা নিজস্ব দ্বীন প্রতিষ্ঠায় লিপ্ত

রেজাখানীরা সায়্যিদ আহমদ শহীদ বেরলভী (র.) ও তাঁর অনুসারী বুযুর্গানে কিরামের তাত্ত্বিক বক্তব্যের অপব্যাখ্যার মাধ্যমে মূলত শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) ও তার অনুসারীগণ কর্তৃক ভারত উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত শরীআতের বিশুদ্ধ রীতি-নীতির বিপরীতে একটি নতুন ধর্মমত প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। যার প্রমাণ পাওয়া যায় আহমদ রেজা খান সাহেবের একটি ওসীয়ত থেকে। আহমদ রেজা খান সাহেবের জীবনীগ্রন্থ 'জীবন ও কারামত' বইয়ে তার লিখিত যে ওসীয়তনামা উল্লেখ করা হয়েছে এর মধ্যে ১৩ তম ওসীয়তটি হলো : "রেজা হোসাইন, হাসনাইন রেজা ও আপনারা সবাই প্রীতি ও ঐক্যতার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন। **যতটুকু সম্ভব শরীয়াতের অনুসরণ পরিত্যাগ করবেন না। আর আমার দ্বীন ও মাযহাব যা আমার কিতাবাদি হতে প্রকাশিত উহার উপর দৃঢ়তার সাথে স্থির থাকা প্রত্যেক ফরজ অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরজ।**" (জীবন ও কারামত, পৃষ্ঠা ১৫৩)

এ ওসীয়তের মধ্যে আহমদ রেজা খান সাহেব শরীআতের অনুসরণের ক্ষেত্রে **‘যতটুকু সম্ভব’** শব্দ ব্যবহার করছেন এবং তার কিতাবাদি থেকে প্রকাশিত **‘তার দ্বীন ও মাযহাবের উপর স্থির থাকা’**র বিষয়ে **‘দৃঢ়তার সাথে’** শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং তার দ্বীন ও মাযহাবের উপর স্থির থাকাকে **‘প্রত্যেক ফরয** (অর্থাৎ শরঈ প্রত্যেক ফরয) **অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফরয’** বলেছেন।

এখানে বুঝা যাচ্ছে যে, শরীআতের অনুসরণ ছাড়াও আহমদ রেজা খান সাহেবের একটি নিজস্ব দ্বীন ও মাযহাব রয়েছে এবং তার সে নিজস্ব দ্বীনের ফরযিয়াতসমূহ শরীআতের প্রত্যেক ফরয অপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এবং এগুলো দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা তার অনুসারীদের একান্ত কর্তব্য।

আহমদ রেজা খান সাহেব ও তার অনুসারীগণের কিতাবাদি থেকে তাদের এ নতুন ধর্মের যে বিশেষ ফরয বা বিধানসমূহ প্রকাশিত হয় তার মধ্যে রয়েছে-

১. নিজেকে রাসূলের উম্মত মনে না করে রাসূলের বান্দা মনে করা। (হাদাইকে বখশিশ)
২. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আল্লাহর প্রধান উজীর (উপদেষ্টা) মনে করা। (শানে হাবিবুর রহমান)
৩. দুনিয়াবী কোনো খেয়াল না থাকলে ওলী-বুযুর্গের মাজারে সিজদা দেয়া জায়িয ও উত্তম মনে করা। (জীবন ও কারামত)
৪. রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে সর্বত্র নিশ্চিতভাবে হাযির নাযির মনে করা। (আল মালফুজ মোস্তফা রেজা খান)
৫. বুযুর্গগণের কবর তওয়াফ ও তাদের পূজা জায়িয মনে করা। কেননা এটা আসলে আল্লাহর পূজা। (শরহুল ইস্তেমদাদ, মোস্তফা রেজা খান)।
৬. আউলিয়ায়ে কিরামের মাযার থেকে সাহায্য চাওয়া অস্বীকারকারীগণকে মুলহিদ ও ধর্মহীন মনে করা। (আল-আমনু ওয়াল উলা, আহমদ রেজা খান)

খারিজীরা যেমন তাদের অনুসারী ছাড়া অন্য কাউকে মুসলমান মনে করে না তেমনি রেজাখানীদের বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, তারাও তাদের মনগড়া আকীদার সাথে যাদের মিল নেই তাদেরকে মুসলমান করে না। এবিষয়টি তাদের বিভিন্ন কিতাবের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন :

১. ওয়ায়েজের (বক্তা) জন্য প্রথমত শর্ত হল, মুসলমান হওয়া। দেওবন্দী আকীদা ওয়ালারা তো মুসলমানই নয়। তাদের ওয়াজ শুনা হারাম। জেনে শুনে তাদেরকে ওয়ায়েজ (বক্তা) নিযুক্ত করা কুফুরী। (ফতওয়ায়ে রেজভীয়্যাহ)

২. দেওবন্দীদের সাথে মেলামেশা করা অকাট্যভাবে হারাম। তাদের সালাম করা এবং কথা বলা হারাম। তাদের পাশে বসানো এবং তাদের পাশ বসাও হারাম। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ)
৩. ইয়াহুদীদের যবেহ করা পশু হালাল। কিন্তু দেওবন্দীদের যবেহ করা পশু হালাল নয়। (আহকামে শরীয়ত)
৪. দেওবন্দীদের পিছনে যে নামায পড়ে সে মুসলমান নয়। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ)
৫. যে দেওবন্দীদের মুসলমান মনে করে তার পিছনে নামায পড়া জায়িয নয়। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ)
৬. দেওবন্দীদের কিতাব পেশাব করার উপযুক্ত। (যদিও এতে কুরআন-হাদীস লিপিবদ্ধ রয়েছে)। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ)

বড়পীর দস্তগীর (র.) তথা সলফে সালিহীনের সাথে রেজাখানীদের আদর্শের কোনো মিল নেই

রেজাখানীরা দাবি করে শুধুমাত্র তারাই বড়পীর দস্তগীর (র.) এর প্রকৃত উত্তরসুরী এবং আহমদ রেজাখান সাহেব তাদের মাযহাবের ইমাম। অথচ বড়পীর (র.) এর আদর্শের সাথে রেজাখানীদের আদর্শের আদৌ মিল পাওয়া যায় না।

বড়পীর দস্তগীর (র.) এর আদর্শ থেকে রেজাখানীরা কতটুকু দূরে তা অনুধাবনের জন্য নিচে বড়পীর দস্তগীর (র.) এর কিছু বাণী এবং আহমদ রেজাখান সাহেবের কিছু উক্তি তুলে ধরা হলো। পাঠক সমাজ বিবেচনা করে দেখবেন বড়পীর (র.) এর আদর্শের সাথে রেজাখানীদের আদর্শের মিল আছে কি না।

আহমদ রেজা খান সাহেবের কয়েকটি ফতওয়া হলো :

১. ওহাবীরা ইয়াহুদী, খৃস্টান, হিন্দু, অগ্নিপুজক থেকেও আরো নিকৃষ্ট। এমন কি তাদের কুফুরী এসব ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে বেশি। (ফতওয়ায়ে রেজভীয়্যা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩)

২. ওহাবীরা কুকুর থেকেও নিকৃষ্ট। (ফতওয়ায়ে রেজভীয়্যা, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩৮)
৩. কাসিম নানতুবী সাহেব অভিশপ্ত এবং মুরতাদ। (ফতওয়ায়ে রেজভীয়্যা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৯)
৪. ইবনুল কায়্যিম মুলহিদ (ধর্মদ্রোহী) ছিলেন। (ফতওয়ায়ে রেজভিয়্যাহ, খণ্ড ৪ পৃষ্ঠা ১৯৯)
৫. দেওবন্দীদের কিতাবসমূহ পেশাবের উপযুক্ত। (সুবহানাস সুবুহ,পৃষ্ঠা ৭৫)
৬. দেওবন্দীদের পিছনে যারা নামায আদায় করে তারা কাফির। (ফতওয়ায়ে রেজভীয়্যা, ৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃষ্ঠা ৮২)

উপরোক্ত ফতওয়াসমূহ ছাড়াও ফতওয়ায়ে রেজভীয়্যার বিভিন্ন ফতওয়ায় ও অন্যান্য গ্রন্থে আহমদ রেজা খান সাহেব তার প্রতিপক্ষ আলিম-উলামাকে অকথ্য ভাষায় গালি গালাজ, তাদের নাম বিকৃতকরণ, তাদেরকে লা'নত প্রদান ও কুফুরী ফতওয়া প্রদানসহ পূর্ববর্তী বুযুর্গানে কিরামের উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আক্রমন করেছেন।

পক্ষান্তরে হযরত বড়পীর দস্তগীর (র.) তার 'ফতুহুল গায়ব' কিতাবের মধ্যে মা'রিফাতের সাধকদের যে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন তার সাথে রেজাখানীদের উল্লেখিত আচরণ সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক। 'ফতুহুল গায়ব' কিতাবের ৭৮ নং মাকালায় বর্ণিত মা'রিফাতের সাধকদের দশটি স্বভাবের মধ্যে রয়েছে :

"**চতুর্থ স্বভাব হলো-** আল্লাহ তাআলার কোনো মাখলুকের প্রতি লা'নত করা অথবা তাদের বিন্দুমাত্র কষ্ট দেয়া থেকে বিরত থাকা। কেননা এটি (কারো প্রতি অভিশাপ না দেয়া ও কোনো মাখলুককে কষ্ট না দেয়া) নেককার ও সিদ্দীকগণের স্বভাব। আর এ স্বভাবের অতি উত্তম পরিণাম হলো যে, দুনিয়াতে উক্ত ব্যক্তি আল্লাহর হিফাযতে থাকার পাশাপাশি আল্লাহ তাআলা তার পরকালের জন্য অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা জমা রাখেন, তাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করেন, সৃষ্টির অপকার থেকে নিরাপদ রাখেন এবং তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়া করার মনোবৃত্তি তাকে দান করেন এবং (সর্বোপরি) তাঁর নৈকট্য দান করেন।"

"**ষষ্ঠ স্বভাব হলো-** কোনো আহলে কিবলা তথা মুসলমানের প্রতি শিরক, কুফর ও নেফাকের হুকুম প্রদানের মাধ্যমে তার থেকে ঈমানের সম্পর্ককে বিচ্ছিন্ন না করা। (অর্থাৎ যারা আমাদের কিবলা মেনে চলে এমন লোকের উপর শিরক, কুফুর ও নিফাকের ফতওয়া না দেয়া তথা তাদেরকে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক না বলা)। কেননা এ স্বভাব (কোনো আহলে কিবলাকে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক না বলার স্বভাব) অবলম্বন করলে বান্দা আল্লাহর রহমতের নিকটবর্তী হয় এবং উন্নত মর্যাদা লাভ করে। এ স্বভাব হলো পূর্ণাঙ্গ সুন্নত। এটি আল্লাহর ইল্‌মের মধ্যে হস্তক্ষেপ থেকে বান্দাকে দূরে রাখে এবং তাঁর গযব হতে দূরে রাখে আর আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাঁর রহমত লাভের নিকটবর্তী করে দেয়। কারণ, এটি আল্লাহর দরবারে অত্যন্ত সম্মানিত দ্বার, যা বান্দার মধ্যে সমগ্র মাখলুকের প্রতি দয়ার স্বভাব সৃষ্টি করে।"

"**দশম স্বভাব হলো-** বিনয় ও নম্রতা। কেননা এর মাধ্যমে আবিদ ও দরবেশের প্রাসাদ মজবুত হয়। তার মর্যাদা উচ্চ শিখরে পৌঁছে, আল্লাহর নিকট তার ইয্‌যত-সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এবং মাখলুকের নিকটও সম্মান বৃদ্ধি পায়। ইহ ও পরকালের কোনো কাজ করার ইচ্ছা করলে সে কাজ করার ক্ষমতা সে লাভ করে। এ স্বভাবটি যাবতীয় বন্দেগির মূল ও শাখা, এর দ্বারাই বন্দেগি পূর্ণতায় পৌঁছে। এ স্বভাবের দ্বারা বান্দা ঐ সকল নেক বান্দাদের মর্যাদা লাভ করে যারা সুখে-দুঃখে আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর এটি তাকওয়া বা পরহেজগারির পূর্ণতা। বিনয়ের অর্থ হলো, যে কোনো মানুষের সাথে সাক্ষাত করলে তাকে নিজের চেয়ে ভাল মনে করবে। (সাথে সাথে) এরূপ মনে করবে যে, হতে পারে এ লোকটি আল্লাহর নিকট আমার চেয়ে অনেক ভালো এবং আমার চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। যদি সে লোকটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হয় তাহলে মনে করবে যে, সে তো আল্লাহর নাফরমানি করেনি, গুনাহ করেনি, অথচ আমি আল্লাহর নাফরমানী ও গুনাহ করেছি। কাজেই সে আমার চেয়ে ভালো। ... আর যদি লোকটি মুর্খ হয় তাহলে মনে করবে, এ লোকটি তো না জেনে আল্লাহর নাফরমানি করেছে আর আমি জেনেশুনে নাফরমানি করেছি। আমি জানি না আমার খাতিমা ও মৃত্যু কিভাবে হবে। আর কিভাবে তার খাতিমা হবে তাও আমার জানা নেই। আর যদি লোকটি কাফির হয় তাহলে মনে করবে, হতে পারে এ লোকটি মৃত্যুর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করে ঈমান ও নেক আমলের সাথে তার খাতিমা হবে এবং সম্ভব আছে যে আমি মৃত্যুর পূর্বে কুফরী করত বদ আমলের উপর আমার খাতিমা হবে। ..." (ফুতুহুল গায়ব, মাকালা ৭৮)

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর এ আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,

১. মা’রিফাতের সাধকগণ কোনো মানুষ এমনকি কোনো সৃষ্টির প্রতি কখনও লা’নত বা অভিসম্পাত করেন না।
২. তারা কোনো মুসলমানকে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক বলেন না।
৩. তারা সবসময় বিনয় অবলম্বন করেন। কখনো নিজেদেরকে অজ্ঞ, মুর্খ এমনকি কাফিরদের চেয়েও উত্তম মনে করেন না।

অথচ রেজাখানীরা তাদের বাতিল মতাদর্শের সাথে যাদের মিল নেই তাদের প্রতি লা’নত তথা অভিসম্পাত করে এবং তাদের উপর শিরক, কুফরী ও নিফাকের ফতওয়া প্রদান করত তাদের কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক বলে থাকে। এটি প্রমাণ করে যে, হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) তথা সলফে সালিহীনের আদর্শের সাথে তাদের কোনো মিল নেই।

উপসংহার

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.), সায়্যিদ আহমদ বেরলভী (র.), হযরত মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (র.) প্রমুখ এবং তাদের সিলসিলার বুযুর্গানে কিরাম এ উপমহাদেশের আলিম-উলামা ও সর্বসাধারণের নিকট মকবূল ওলী হিসেবে স্বীকৃত। তাই তাদের বিরোধিতা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা আল্লাহর ওলীদের সাথে কেউ শত্রুতায় লিপ্ত হলে আল্লাহ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করেন। হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) আল্লাহর ওলীদের স্বরূপ তুলে ধরে তাদের বিরোধিতা না করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- “হে খাহিশাতের গোলামগণ! তোমরা কখনও সাহিবে হাল লোকদের অর্থাৎ আউলিয়ায়ে কিরামের মুকাবিলা ও বিরোধিতা করবে না। কেননা তারা তো আল্লাহর গোলাম। তোমরা সম্পূর্ণভাবে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়েছ। তোমাদের অন্তরের প্রধান ঝুঁকির কেন্দ্র হচ্ছে দুনিয়া আর তারা (আউলিয়াগণ) হলেন আখিরাতমুখী। তোমাদের দৃষ্টি দুনিয়ার প্রতি সীমাবদ্ধ আর তারা আকাশ ও যমীনের মালিকের সঙ্গে সম্পর্কে স্থাপন করেছেন। **তোমাদের মহব্বতের কেন্দ্র হচ্ছে মাখলুক ও মানুষ। আর তাদের প্রেম ও মহব্বত হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে। তোমাদের অন্তর দুনিয়ার সাথে জড়িত আর তাদের অন্তর মালিকের সঙ্গে জড়িত। তোমরা যে বস্তুকেই দেখ তার শিকার হয়ে যাও। কিন্তু তারা ঐসব বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। যে সকল বস্তু বা মাখলুক তাদের প্রতি দৃষ্টি দেয় তারা সে সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তার প্রতি দৃষ্টি দেন, যাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায় না।** তারা উদ্দেশ্যে সফলকাম হয়ে মুক্তি লাভ করেছেন আর তোমরা দুনিয়ার লোভ-লিপ্সায় বন্দি হয়ে আছ। তারা খাহেশাত, মাখলুকাত, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ তাআলার নিকটে পৌঁছে গেছে। তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ঐসব বিষয় অবগত করিয়েছেন যা সৃষ্টির মূল রহস্য ও কারণ ছিল। ... এ সকল আউলিয়ায়ে কিরামের বরকতেই আকাশ যমীনের স্থায়িত্ব এবং জিন্দা মুর্দার স্থিতি বিরাজ করে। কেননা তাদেরকে পৃথিবীর মধ্যে খুটি ও পেরাগ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, যার কারণে তাদের প্রত্যেকেই এক একটি ভারি পাহাড় হয়ে নিজ নিজ স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব **তোমরা তাদের সঙ্গে কোনো প্রকার বিবাদ করো না। তাদের পথে অন্তরায় হয়োনা। তাদের পথ থেকে সরে দাঁড়াও। কেননা তাদের মাতা-পিতা এবং আওলাদ পর্যন্তও তাদের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনি**। তারা এমন সকল লোক যারা সকলের উর্ধ্বে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন, যাদেরকে আমার পরওয়ারদিগার সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। যতদিন আসমান যমীন কায়েম থাকবে ততদিন তাদের উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি (সালাম) বর্ষিত হতে থাকবে।” (ফুতুহুল গায়ব, মাকালা ১৪)

হযরত আব্দুল কাদির জিলানী (র.) এর উপরোক্ত নসীহত স্মরণ করিয়ে দিয়ে রেজাখানীদের প্রতি আহবান- আউলিয়ায়ে কিরামের বিরোধিতা পরিত্যাগ করুন এবং নিজেকে আল্লাহর গযবের লক্ষ্য বস্তু বানানো থেকে সতর্ক হোন। আল্লাহ তাআলাই সর্বোত্তম তাওফীকদাতা।

وصلي الله علي النبي الحبيب الكريم –